তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সম্পাদক ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ষোড়শকল্প ।

তৃতীয় ভাগ ।

১৮২১ শক ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড ।

সম্বৎ ১৯৬২ । কলিগতাব্দ ৫০০৬ । ৩ চৈত্র মঙ্গলবার ।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষোড়শ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র ./০

বৈশাখ ৭৪১ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৭৪২ সংখ্যা।

আষাঢ় ৭৪৩ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৭৪৪ সংখ্যা।

ভাদ্র ৭৪৫ সংখ্যা।

আশ্বিন ৭৪৬ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৭৪৭ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৭৪৮ সংখ্যা।

পৌষ ৭৪৯ সংখ্যা।

মাঘ ৭৫০ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৭৫১ সংখ্যা।

চৈত্র ৭৫২ সংখ্যা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৪১ সংখ্যা

৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৬ শক, ১১ মাঘ, বুধবার।

করুণা।

যাঁহার উপাসনার জন্য আমরা এই পবিত্র স্থানে সমাগত হইয়াছি, তাঁহার সহিত আমাদের অতি পবিত্র ঘনিষ্ঠ নিকটতম সম্বন্ধ। তিনি আমাদের মাতার মাতা, পরম মাতা। যখন মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে জরায়ু মধ্যে শয়ান ছিলাম, যখন পার্থিব মাতার করুণাদৃষ্টিও আমাদের উপর পতিত হয় নাই, তখন কাহার কৃপায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইত? তখন কাহার করুণায় মাতার রসরক্তে আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধন হইত? সেই অখিল মাতা—পরম মাতার করুণা দ্বারাই হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাহার করুণা মাতৃহৃদয়ে অবতীর্ণ হইল? সেই পরম মাতার করুণাই মাতৃ-হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের রক্ষার হেতু হইল তাঁহার সমান কেহ চক্ষে দেখে নাই, কর্ণে শ্রবণ করে নাই। যখন এখানকার মাতার স্নেহ বলিতে গিয়া রসনা পরাস্ত হয়, তখন সেই পরমমাতার স্নেহ আমি কি প্রকারে বর্ণনা করিব? তিনি কেবল আমারি পরমমাতা নহেন, দেব মনুষ্য, জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেরই পরমমাতা। তাঁহার পালনী শক্তি অদ্ভুত। তাঁহার দয়া অসীম। তিনি অগ্রে মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ দিয়া আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে জীবিকা রাখিয়া জীবসৃষ্টি করিয়াছেন। কঠোর শৈল-শিখরোপরি যে সকল জীব রহিয়াছে, তিনি তাহাদেরও আহারদাতা। মাতৃ-হৃদয়ে যে স্নেহ বিরাজ করে, সে তাঁহারি অসীম স্নেহের ছায়ামাত্র। মাতৃস্নেহ যে কি পদার্থ তাহা সকলেই জানেন। তথাপি দুই একটি প্রকৃত দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদা এক মাতা দ্বিতল গৃহের ছাদের ধারে ধারে পাদচারণা করিতেছিলেন। সহসা পদস্খলন হইবামাত্র ভূতলে পড়িবার সময় তিনি তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে এমন করিয়া বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, যে ভূতলে পতিত হইয়া আপনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেন তথাপি শিশুর গাত্রে একটি রেখামাত্র পড়িল না। গভীর নিশীথে সন্তান নিজ কক্ষে শুইয়া রহিয়াছে, মাতা অপর কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কোন

বিষধর জন্তু তাঁহাকে দংশন করিল। তিনি সহসা "উঃ" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সন্তান তাহা শুনিতে পাইয়া নিঃশব্দে মাতার কক্ষে যাইয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা! তুমি কি শব্দ করিলে? মাতা বলিলেন, "হাঁ আমি শব্দ করিয়াছি।" কেন করিলে? "আমায় কি কামড়াইল। তখন সন্তান আলোক আনিয়া দেখেন দষ্ট অঙ্গুলির ক্ষতস্থান নীলবর্ণ হইয়াছে। সন্তান জিজ্ঞাসা করিলেন, দংশনজ্বালা অনুভব মাত্রেই আমাকে ডাক নাই কেন? মাতা উত্তর করিলেন, "তোমার যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" সন্তান শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এত স্নেহ যে তখনই প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি সন্তানের নিদ্রাভঙ্গ করা হইবে না। দেখ এই বচনাতীত স্নেহের ভিতরকার স্নেহ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এ সেই পরমমাতার স্নেহই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মাতা যেমন সন্তানের নিদ্রার জন্য রাত্রিতে দীপ নির্ব্বাণ করেন, সেই পরমমাতাও তেমনি আমাদের নিদ্রার জন্য সূর্য্যরূপ মহাপ্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেন। "কোথা দিব আমি তোমার স্নেহের উপমা, হে অখিলমাতা! না হয় বিশ্রাম আতপ কোলাহলে, তুমি তাই নিবাইলে রবি, থামাইলে বিহঙ্গমকুলে।" সকলে যখন নিদ্রিত, তখনও তাঁহার নিদ্রা নাই। তখনও তিনি জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। তিনি হৃদয়ে সতত জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে সুপথে-ধর্ম্মের পথে-মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন। কুপথে যাইলে দণ্ড বিধান করিতেছেন। সুপথে যাইলে আত্মপ্রসাদ ও স্বীয় প্রসাদে পুরস্কৃত করিতেছেন। এবং আপনার আনন্দজনক প্রফুল্ল আনন, হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্মানন্দে আপ্লাবিত করিতেছেন। তিনি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নীলাকাশ, নীল সমুদ্র, পর্ব্বত পাথার, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বৃক্ষ লতা পুষ্পে আপনার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া রাখিয়া দিয়াছেন, যে আমরা তদ্দর্শনে নিরানন্দের হস্ত হইতে মুক্ত হইব। তিনি বিবিধ ফলে সুরস ও ফুলে সুগন্ধ দিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। তিনি হৃদয়ে স্নেহ প্রেম, দয়া ভক্তি দিয়া আমাদিগকে উন্নততর আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। এমন করুণাময়ী মাতাকে আমরা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? সংকট যেমনই কঠিন হউক, পাপ যেমনই গুরুতর হউক, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করিলে, সে সকলি বিদূরিত হইয়া থাকে। এ কথা মুখের কথা নহে, যিনি কখন "কাতর আমার প্রাণ সংসারে ও গো মাতা দাও তব চরণে স্থান" বলিয়া তাহার শরণ লইয়াছেন, তিনিই জানেন, সেই অখিলমাতা কেমন বিপদবারণ ও ভক্তবৎসল!

অনন্যমনে ভক্তিসহকারে তাঁহাতে নিমগ্ন হও, দেখিবে আত্মার কি দেবভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার শান্ত স্বরূপ ধ্যান কর, হৃদয়ে নিশ্চয় স্বর্গীয় শান্তি উপস্থিত হইবে। তাঁহার অভয় মূর্ত্তি ধ্যান কর, দেখিবে হৃদয় ভয়শূন্য হইবে। তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি ধ্যান কর, দেখিবে হৃদয় স্বর্গীয় প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সত্য স্বরূপ ধ্যান কর, দেখিবে, হৃদয় সত্যের সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত শক্তি ও দয়াস্বরূপ ধ্যান কর দেখিবে হৃদয়ে দুর্জ্জয় শক্তি ও দয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকারে তাঁহার স্বরূপ প্রতিদিন অনন্যমনে ধ্যান

কর, দেখিবে তাঁহার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিয়ত তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত রহিয়াছে। দেখিবে সেই স্নেহময়ী মাতা সকল সময়েই তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। এত আনন্দ এত সুখ এত আশা এত ভরসা তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তবে কেন আমরা নিরাশ হই? ভগ্নোৎসাহ হই? কোথায় করুণাময়ী মাতঃ, সংসারের মোহ অন্ধকারে আমরা তোমার করুণাপূর্ণ আনন দেখিতে পাই না। তুমি কৃপা করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ আনন আমাদিগকে দেখিতে দাও। তবে সকল দুঃখ সকল শোক, সকল পাপ, সকল তাপ, সকল ভয় দূর হইবে। এই তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা।

"কি আমি বলিব তোমারে;
ক্ষুদ্র কীট আমি; তুমি পুরাণ অনাদি,
অবিনাশী সারাৎসার।
আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা
চখে মলিন মানবে।
বর্ম্ম দুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে,
ভব-জলধি তুমি, থেক না থেক না হে
দূর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

সার সত্যের আলোচনা একপ্রকার সাগর-মন্থন। তাহার সংক্ষোভে একদিক্ হইতে অমৃত এবং আর একদিক হইতে হলাহল, দুই দিক্ হইতে দুই মহাতেজস্বী বস্তু বাহির হইয়া পড়ে। দেবতারা হলাহলকে অমৃতের গুণে অমৃত করিয়া তোলেন; অসুরেরা অমৃতকে হলাহলের গুণে হলাহল করিয়া তোলে। অমৃতও যেমন, বিষও তেমনি, দুইই ভাল, দুইই মন্দ। সদ্ব্যবহারের হস্তে দুইই ভাল; অসদ্ব্যবহারের হস্তে দুইই মন্দ। বিষকে সোপান করিয়া অমৃতে উত্থান করা হইলে বিষের সদ্ব্যবহার করা হয়; এরূপ স্থলে বিষ খুবই ভাল। পক্ষান্তরে, অমৃতকে সোপান করিয়া বিষে অবতরণ করা হইলে অমৃতের অসদ্ব্যবহার করা হয়; এরূপ স্থলে অমৃত বিষেরই সহোদর। বিষ কি? না, দ্বন্দ্ব কলহ—বিচ্ছেদ—এবং দুঃখ তাপ। অমৃত কি? না শান্তি, ঐক্য এবং আনন্দ! এ তো গেল ভাবের কথা; কাজের কথা হ'চ্চে এই যে, বিষকে জয় করিয়া অমৃতকে লাভ করিতে হইবে, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া শান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়া আনন্দময় কোষে উত্থান করিতে হইবে।

বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্মশরীরের চরম সীমা-প্রদেশ। তাহার পরেই আনন্দময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষের অধীশ্বরী হ'চ্চেন বুদ্ধি।

বিগত প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, বুদ্ধির প্রধান অঙ্গ দুইটি—সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান। আর, সেই সঙ্গে এটাও দেখানো হইয়াছে যে, সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায় এবং বিশেষ-জ্ঞানে বস্তুসত্তা প্রকাশ পায়। সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞানের মধ্যে খুবই যুদ্ধ চলিতেছে—মান্ধাতার আমল হইতে যুদ্ধ চলিতেছে। আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যেও তথৈবচ। দর্শন-রাজ্যে যতপ্রকার বিবাদ-কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে—যেমন সামান্য-বিশেষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কার্য্য এবং কারণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কর্ত্তা এবং কর্ম্মের মধ্যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবংবিধ সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র গোড়া'র সূত্র হ'চ্চে বিজ্ঞানের ভেদবুদ্ধি। সেই ভেদবুদ্ধিকে জয় করিয়া আনন্দময় কোষের সামঞ্জস্য, শান্তি এবং আনন্দে সমুত্থান করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষকে জয় করিয়া অমৃতে উত্থান করা।

ভেদবুদ্ধিটি সামান্যা নারী নহেন—তিনি বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সন্ধি-স্থানে নির্নিদ্র-নয়নে পাহারা দিতেছেন। যাত্রী দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলেন—"দাঁড়াও! কে তুমি—অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী? সাকারবাদী না নিরাকার-বাদী?" যাত্রী যদি বলে—"আমি অদ্বৈত-বাদী," তবে তাহাকে তিনি অতলস্পর্শ সমুদ্র দেখাইয়া বলেন—"গলায় পাথর বাঁধিয়া ঐ ঠাঁই ঝাঁপ দেও!" যাত্রী যদি বলে—"আমি দ্বৈতবাদী," তবে দুই দিকের দুই প্রবল স্রোতের মধ্যবর্ত্তী ঘুর্ণাচক্র দেখাইয়া তাহাকে বলেন—"ঐখানে যাও!" যাত্রী যদি বলে—"আমি সাকারবাদী," তবে তাহাকে তিনি কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণ দেখাইয়া বলেন—"ঐখানে গিয়া মাথা খোঁড়ো!" যাত্রী যদি বলে—"আমি নিরা-কারবাদী," তবে তাহাকে তিনি প্রজ্বলিত হুতাশন দেখাইয়া বলেন—"উহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ধোঁয়া হইয়া আকাশে মিশিয়া যাও!" এ-বাদীই হউন্, ও-বাদীই হউন্, আর যে বাদীই হউন্—ভেদবুদ্ধির বক্রকটাক্ষে পড়িলে বাদি-প্রতিবাদী উভ-য়েরই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। ভেদ-বুদ্ধির হস্তে সত্যবাদী ব্যতীত আর কোনো বাদীরই পরিত্রাণ নাই। যাত্রী যদি সত্য-সত্যই অমৃত-নিকেতনের প্রয়াসী হ'ন, তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—"অদ্বৈতবাদ কাহাকে বলিতেছ, তাহাও আমি জানি না; দ্বৈতবাদ কাহাকে বলি-তেছ, তাহাও আমি জানি না—জানিতে চাহি-ও না; আমি এখানে বাদাবাদ করিতে আসি নাই—পথ ছাড়ো!" এই বলিয়া তিনি ভেদবুদ্ধিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হ'ন, আর, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য অমৃত নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মহলে সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞানের মধ্যে যুঝাযুঝি আরম্ভ হইয়াছে কখন্ হইতে? বিজ্ঞান-সূর্য্যো-দয়ের বহুপূর্ব্বে সারা-ইউরোপ যে সময়ে মধ্যমাব্দের তামসী রজনীতে নিমগ্ন ছিল, সেই সময় হইতে। তখনকার কাল ছিল মঠধারী সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব-কাল। সেই সময়ে, সামান্যজ্ঞান বিশেষ-জ্ঞানকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া-দিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসনে চড়িয়া বসিল।

সামান্য জ্ঞানের বিষয়গুলা আবছায়া-রকমের পদার্থ। দেখিলে মনে হয়, এক-প্রকার ভূতের নাচ। সেগুলা নির্ব্বিশেষ-শ্রেণীর বস্তু—ফাঁকা বস্তু—বা ফক্কিকা। যেমন—সাধারণ বৃক্ষ। বটবৃক্ষ নহে, অশ্বত্থ-বৃক্ষ নহে, ওষধি নহে, বনস্পতি নহে, কোনোপ্রকার বিশেষ বৃক্ষ নহে; অথচ বৃক্ষ! সাধারণ বৃক্ষ! নির্ব্বিশেষ বৃক্ষ! পাশ্চাত্য মধ্যমাব্দের একদল পণ্ডিত বলি-তেন যে, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ যেমন বাস্ত-বিক পদার্থ, নির্বিশেষ বৃক্ষও ঠিক্ তেম্নি-তরো একটা বাস্তবিক পদার্থ; ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল—বস্তুবাদী Realist। আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্বিশেষ বৃক্ষ একটা মানসিক ভাবমাত্র, তা বই তাহা দৃশ্যমান বৃক্ষের ন্যায় বাস্তবিক পদার্থ নহে; ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল ভাববাদী 'conceptualist। তৃতীয় আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্ব্বিশেষ বৃক্ষ

দৃশ্যমান বৃক্ষের ন্যায় বাস্তবিক পদার্থও নহে, মনঃকল্পিত আম্রবৃক্ষের ন্যায় মানসিক ভাবও নহে। নির্বিশেষ বৃক্ষ শুধুই-কেবল একটা নাম। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল নামবাদী। তিনদল পণ্ডিত পরস্পরের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে দাঁড়াইলেন—

(১) বস্তুবাদীর দল,

(২) ভাববাদীর দল,

(৩) নামবাদীর দল।

সামান্য-জ্ঞানের রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বিশেষ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞানের সহোদর ভ্রাতা। সামান্যজ্ঞান আপনার সেই ভ্রাতাটিকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে! এ পাপের ফল হাতেহাতে ফলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সামান্য-জ্ঞানের রাজ্য যখন রসাতলে যাইবার উপক্রম হইতেছে, সেই মুখ্য সময়টিতে বেকন্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বেকন্ বিশেষ-জ্ঞানকে জিতাইয়া দিলেন। বেকনের লেখনীর চোটে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সামান্য-জ্ঞান বেকনের শরণ যাচ্ঞা করিলেন। বেকন্ দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া আপনাদের মধ্যে রাজ্য আধাআধি ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিলেন। বিশেষ-জ্ঞানের ভাগে পড়িল ব্যাবহারিক সত্য; সামান্য-জ্ঞানের ভাগে পড়িল পারমার্থিক সত্য। দুই ভ্রাতার দুই পৃথক্ রাজ্য হইল বটে, কিন্তু দুই রাজ্যের সীমা-নির্দেশ লইয়া দোঁহার মধ্যে বিবাদ বাড়িল বই কমিল না। সজ্জনশ্রেষ্ঠ কাণ্ট্ দুই রণোদ্যত ভ্রাতার মাঝখানে পড়িয়া বিবাদ মিটাইতে গেলেন; লাভের মধ্যে হইল কেবল—দুই দিক্ হইতে খোঁচা-খুঁচি পাইয়া বিবাদানলের চতুর্গুণ প্রজ্বলন। একা-বীর কাণ্ট্ কি করিবেন! তাঁহার দোষ নাই! তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে সত্যপ্রিয়—বিবাদপ্রিয় আদবেই না। তিনি দেখিলেন যে, আসলে দুই দলের মধ্যে বিবাদের কোনো কারণ নাই। দেখিলেন যে, একই সত্যের একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন এ-পৃষ্ঠ, আর-একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন ও-পৃষ্ঠ। ভারতবাসী হিমালয়ের দক্ষিণ-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয়; তিব্বতবাসী হিমালয়ের উত্তর-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয়। কিন্তু হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ কিছু-আর দুই হিমালয় নহে। হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ একই হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ। হইলে হইবে কি—সারা ইউরোপ ভেদবুদ্ধির প্রধান জটল্লা-স্থান। একা রথী কাণ্ট্ ক-দিক্ সামলাইবেন? দেবানুগ্রহে কাণ্টের মনোমধ্যে অভেদ-জ্ঞানের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা বাড়িতে পাইল না। চারিদিকের ভেদবুদ্ধির কাঁটা-বনের পাল্লায় পড়িয়া তাহা মাথা তুলিতে-না-তুলিতেই কণ্টকাঘাতে মুস্ড়িয়া পড়িল। কাণ্টের আসল ভিতরের কথাটি যে কি, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ-জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্য-জ্ঞান ফাঁকা, তথৈব, সামান্য-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ জ্ঞান অন্ধ। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে প্রজ্ঞার একটা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ঋতম্ভরা। সত্য-ভরা জ্ঞানই জ্ঞান; তা বই, ফাঁকা-জ্ঞানও যেমন, অন্ধ-জ্ঞানও তেমনি, দুইই অজ্ঞানেরই নামান্তর। তবেই হইতেছে যে, বিশেষ জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্য জ্ঞান জ্ঞানই নহে; তথৈব, সামান্য-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ-জ্ঞান জ্ঞানই

নহে। কাণ্ট এটা বেশ্ বুঝিয়াছিলেন যে, কাগচের যেমন দুই পৃষ্ঠ—জ্ঞানেরও তেমনি দুই পৃষ্ঠ। একপিট-ওয়ালা কাগচও অসম্ভব, একপিট-ওয়ালা জ্ঞানও অসম্ভব। কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্টের মনোমধ্যে যখনি অভেদজ্ঞান মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই ভেদবুদ্ধির শিলাবৃষ্টিতে তাহা ধরাবলুণ্ঠিত হইয়াছে। তার সাক্ষী—

অভেদ-জ্ঞানের উন্মেষ।

"The understanding cannot see, the senses cannot think; by their union only can knowledge be produced.—বুদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় চিন্তা করিতে পারে না; দুয়ের ঐক্যসূত্রেই জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবে।

ভেদবুদ্ধির আক্রমণ।

But this is no reason for confounding the share which belongs to each in the production of knowledge. On the contrary, they should always be carefully separated and distinguished—জ্ঞান যদিচ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দুয়ের সংযোগাত্মক ঐক্যের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া দোঁহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির) দুই পৃথক্ শ্রেণীর কার্য্যকারিতা'কে একসঙ্গে জড়াইয়া খিচুড়ি পাকাইবার কোনো কারণ নাই, পরন্তু জ্ঞানের উৎপাদনে কাহার কিরূপ কার্য্যকারিতা, তাহা পৃথক্ করিয়া অবধারণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

বলা বাহুল্য যে, কাণ্ট্ শেষোক্তপ্রকার অসাধ্যসাধনে অর্থাৎ দুয়ের দুইতরো কার্য্যকারিতার পার্থক্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবেন? তিনি তো আর সিদ্ধপুরুষ নহেন। এ কথা খুবই ঠিক্ যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না; কিন্তু সেই তালির উৎপাদনে দুই হাতের কাহার কিরূপ কার্য্যকারিতা, তাহা তালিধ্বনির মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। কাণ্ট্ বলিয়াছেন—জ্ঞানের মূল উপাদান দুইভাগে বিভক্ত—দেশকালের বৈচিত্র্য এবং সংবিতের যোগপ্রধান একত্ব Synthetic unity of apperception। তাহার মধ্যে দেশকালের বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়ের দেওয়া, আর, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে এক নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিতত হইয়া সংবিতের একত্ব প্রতিপাদন করে, সেই যোগসূত্রটা বুদ্ধির দেওয়া। কাণ্ট্ দেশকালের বৈচিত্র্যকে ইন্দ্রিয়ের ফাটকে আটক করিয়া রাখিবার মানসে সেই প্রবল অশ্বটাকে বুদ্ধিক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া রাখিতে কত-না চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত অশ্বটা কিছুতেই বাগ মানিল না। কাণ্টের অভিপ্রায়-মতে দেশকাল গোড়ায় ছিল form of the senses ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-ক্ষেত্র, চরমে হইল pure intuition বুদ্ধিবৃত্তির অধ্যবসায়-ক্ষেত্র। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কাণ্ট্ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যথেষ্ট—কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই এই স্থলে কাণ্ট্ ভেদবুদ্ধির পক্ষ গ্রহণ করিয়া অভেদজ্ঞানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; আর, সেই দোষেই অন্যান্য স্থলে তিনি ভেদবুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভীষ্টফলে বঞ্চিত হইয়াছেন।

ভেদবুদ্ধি ভাল বই মন্দ নহে; কেন না, গোড়ায় তাহা আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে-ক্ষেত্রে যে-পরিমাণে আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে ভাল, তাহার অধিক পরিমাণে ভাল নহে। তা ছাড়া, তাহা গোড়ায় ভাল, কিন্তু চরমে ভাল নহে।

ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া অভেদ জ্ঞানে উত্থান করিতে হইবে—এটা যখন স্থির, তখন কাজেই সোপানের ব্যবস্থা-পারিপাট্যের জন্য ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করা ভাল, কিন্তু গম্যস্থান করা ভাল নহে। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বা কলকারখানার যুগ বা কলীয় যুগ বা কলিযুগ এ-যাবৎ-কাল উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে; এক্ষণে, ভেদবুদ্ধিকে গম্যস্থান করিয়া দুর্গতির দিকে পদনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনাতন সুসভ্যম্মন্য সমাজে উচ্চ-নীচের প্রভেদ, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ, পণ্ডিত মূর্খের প্রভেদ, আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিকের প্রভেদ, মাত্রা ছাড়াইয়া সপ্তমে উঠিয়াছে। এ প্রভেদ মিথ্যা এবং কৃত্রিমতার বালির বাঁধের উপরে নির্লজ্জভাবে মাথা উঁচা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ-সভ্যতা গিয়াছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতা (chivalric সভ্যতা) গিয়াছে, এক্ষণে আসিয়াছে বৈশ্য-সভ্যতা (Mercantile সভ্যতা)। ইহার পরে হয় তো আসিবে শূদ্র-সভ্যতা—সেই পামরিণী সভ্যতা, যাহার মূল মন্ত্র হ'চ্চে শক্তের দাসত্ব এবং অশক্তের উপরে প্রভুত্ব। তাহার পরে পূর্ব্বদিকে যখন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অরুণ-জ্যোতি দেখা দিবে, তখন কলির রাত্রি পোহাইবে—ইহা বিধির লিখন। বলিলাম "ব্রাহ্মণ-সভ্যতা"। পাঠক হয় তো মনে করিবেন যে, মনুর আমলের সভ্যতা'র প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই বলা হইতেছে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা। পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন—মূলেই না! মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা অব্রাহ্মণোচিত বিধানব্যবস্থাতেই স্বপ্রকাশ। শূদ্রের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ নহে। শূদ্রের কর্ণে বেদমন্ত্র প্রবেশ করিলে দ্রবীভূত তপ্ত শীষা দিয়া কর্ণে ছিপি আঁটিয়া দেওয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজার বিধান হইতে পারে—কিন্তু তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান হইতে পারে না। যখন সরস্বতীনদীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না—যখন জাতিভেদ রাজশাসনের আজ্ঞাধীন ছিল না—যখন পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতবাদ-দ্বৈতবাদ, সাকারবাদ নিরাকারবাদ প্রভৃতি বাদাবাদ এবং মতামতের সংগ্রামক্ষেত্র ছিল না, পরন্তু সর্ব্বলোকের মঙ্গল-কামনার উৎস ছিল—সেই সময়ে যে এক দেবস্পৃহণীয় সভ্যতা ব্রহ্মাবর্ত্তের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, রাত্রি পোহাইবার সময় পূর্ব্বে যাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, রাত্রি পোহাইলে আবার তাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিবে।

এখনকার কালের রাক্ষসী সভ্যতা ভেদবুদ্ধির বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সভ্যতা কল-কারখানার সভ্যতা; দয়া-ধর্ম্মের সভ্যতা নহে, মনুষ্যত্বের সভ্যতা নহে। ভেদবুদ্ধি সোপানমাত্র; তা বই, তাহা গম্যস্থান নহে। অভেদ-জ্ঞানই গম্যস্থান। কিন্তু ভেদবুদ্ধি এক্ষণে সোপান হইয়াই সন্তোষ মানিতেছে না; ভেদবুদ্ধি এক্ষণে আপনাকে গম্যস্থান এবং আদর্শ করিয়া দাঁড় করাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; মরিবার পূর্ব্বে মরণ-কামড় দিবার জন্য বিকট দশন বাহির করিতেছে। সর্ব্বনাশকের দলবল (Nihilistএর দলবল) গোকুলে বাড়িতেছে। এ সভ্যতা মারীচ-রাক্ষসের মাতা মরীচিকা; বৈদ্যুতী তন্ত্রী মায়ামৃগ; রেলগাড়ি পুষ্পক-বিমান। প্রকৃত সভ্যতা হ'চ্চেন মনুষ্যত্বরূপিণী সীতাদেবী। সে সীতাদেবী এক্ষণে কোথায়? তাঁহার

পরিত্যক্ত অলঙ্কার ভারতের পর্ব্বতে-প্রান্তরে, অরণ্যে-নগরে, গ্রামে-পল্লীতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। রেলগাড়িতে চড়িয়া দ্রুতগমনের জন্য অথবা বৈদ্যুত আলোকে রাত্রিকে দিন করিবার জন্য কিছু-আর মনুষ্য সৃষ্ট হয় নাই! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব যদি গেল; দয়াধর্ম্ম গেল—সত্য গেল—ন্যায় গেল—ক্ষমা গেল; অর্থলোলুপত্ব এবং নীচত্ব যদি সভ্যতার আদর্শ-পদবীতে নিশান তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত না হইল; তবে বৈদ্যুতা তন্ত্রীতেই বা কি হইবে, রেলগাড়িতেই বা কি হইবে। সংবাদপত্র-সহস্রের মিথ্যা-গর্ব্বোক্তি রাক্ষসী সভ্যতাকে দৈবী সভ্যতা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে—Devilzationকে Civilization করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে; কিন্তু তাহা করিয়া লাভ কি? সত্য কি এতই লঘু-সামগ্রী যে, তাহা সংবাদপত্রের উদ্গীরিত মিথ্যার ঝঞ্ঝা-বায়ুতে উড়িয়া যাইবে!

প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য, তাহা এই—ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল যদি তাহা সোপান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু যদি তাহা গম্য-স্থানের উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া আপনাকে আদর্শরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহা ভয়ানক কালকূট।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত।

আচ্ছা, বৈশেষিক পক্ষ টেঁকিল না কিন্তু বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধ দাঁড়াইতে পারে। তাহারা কহে, এই একমাত্র অদ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ সতের অভাবই ছিল। এস্থলে সতের অভাব বলিতে সৎপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বস্তু নয়। যেমন নৈয়ায়িকেরা সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব এইরূপ বিপরীত তত্ত্ব স্বীকার করে এরূপ নহে, সতের অভাব এই অর্থেই অসৎ।

শিষ্য কহিলেন, বৌদ্ধেরা উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎকে অসৎ ছিল এইরূপ কহিতেছেন কিন্তু যে বস্তুটার সত্ত্বাই নাই তৎসম্বন্ধে 'ছিল' এই কাল-সম্বন্ধ এবং 'এক অদ্বিতীয়' এই সংখ্যাসম্বন্ধ কিরূপে ঘটান।

গুরু। তাহা তো ঠিক্‌ই, বস্তুসত্বা স্বীকার নাই অথচ তৎপক্ষে কালসম্বন্ধ এবং সংখ্যাসম্বন্ধ কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। আরও দেখ এই অভাব যদি সর্ব্বাভাব হয় তবে সর্ব্বাভাবের উপলব্ধিই বা কিরূপে হয়। যদি বল ইদানীং এই অভাবের উপলব্ধি হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বে হইতে পারে না, একথা সঙ্গত নয়, কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে সদভাবের প্রমাণাভাব। দেখ, জ্ঞাতৃসত্তাতেই কালসত্তা। তুমি যখন এই কালের একটা পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতেছ, তখন কালসত্তাতেই সৎ নিত্য জ্ঞাতারও সত্তা স্বীকার করা হইতেছে। কাল থাকিলেই তাহার জ্ঞাতা থাকা চাই। ইদানীং জ্ঞাতার উপলব্ধি হইতেছে আর তদানী অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে জ্ঞাতার অসত্তা হেতু উপলব্ধি হইতে পারে না কালের পৌর্ব্বাপর্য্য ধরিলে এ তর্ক টেকে না। কালসত্তাতেই জ্ঞাতৃসত্তা। এই জন্যই বলা হইয়াছে উৎপত্তির পূর্ব্বে সদভাবের প্রমাণাভাব। এখন বুঝ উৎপত্তির পূর্ব্বে সতের অভাব ছিল না। এরূপ কল্পনাই উপপন্ন হইতে পারে না।

আরও যে বস্তুর অপোহ বা বাধ হয় তাহার শব্দার্থতা থাকা চাই। এস্থলে যাহার বাধ হইতেছে তাহা অসৎ। তুমি

এই অসৎশব্দের অর্থসিদ্ধি কিরূপে করিবে। আর আকৃতির ও শব্দার্থতা থাকা চাই নহিলে তাহার বাধ কিরূপে হইবে। কিন্তু এস্থলে এক ও অদ্বিতীয় এই দুই পদ আকৃতিবাচক হইতে পারিতেছে না। বলিতেছ অসৎ অথচ আকৃতিবাচক এক অদ্বিতীয় এই দুই পদ দ্বারা সেই অসৎকে নির্দ্দেশ করিতেছ। অসতের পক্ষে এই আকৃতিবাচক দুইটী পদের সার্থকতা কিরূপে হয়। সুতরাং বাক্যার্থের অনুপপত্তিতে তোমার কথা-টাই নির্বিষয় ও অপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল।

উত্তর পক্ষ। ইহা দোষের নয়। যেহেতু বাক্যটী সৎ-গ্রহণ-নিবৃত্তি-পর। সৎ এই শব্দটি সৎ-আকৃতি-বাচক। 'এক অদ্বিতীয়' এই দুই শব্দের সহিত সতের সামানাধি-করণ্য আছে, অর্থাৎ এই দুই শব্দও আকৃতিবাচক। এখন এই সৎবাক্যে নঞ্ প্রযুক্ত হইয়া সৎবাক্য অবলম্বনে সৎ-বাক্যার্থ বিষয়ক যে জ্ঞান হইয়াছিল অর্থাৎ এই জগৎ সৎ একই অদ্বিতীয় ছিল ইত্যা-কার যে জ্ঞান হইয়াছিল, নঞ্ সেই সৎ-বাক্যার্থ হইতে তাহা নিবৃত্ত করিতেছে। যেমন অশ্বারূঢ় পুরুষ অশ্বকে ধরিয়া তা-হাকে তদভিমুখ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে ইহা সেইরূপই বুঝিও। ফলত এই বাক্যে সতের অভাব অসৎ অর্থাৎ শূন্য একথা বলা হইতেছে না, তবে কি না, পুরুষের বিপরীত-গ্রহণ অর্থাৎ এই জগৎ সৎ ছিল এইরূপ বিপরাত-গ্রহণ তৎনিবর্ত্তকরূপে অর্থপর এইভাবে এই অসদেব ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এখন বুঝ বিপরীত গ্রহণ প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করা সহজ এই অর্থবত্তা থাকায় অসদাদি বাক্যের শ্রৌতত্ব ও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব অসৎ অর্থাৎ সর্ব্বাভাব হইতে এই সৎ কিনা বিদ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে এই মহাবৈনাশিক পক্ষখণ্ডিত হইতেছে।

কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।

হে সৌম্য! কোন্ প্রমাণের বলে অসৎ হইতে সৎ জন্মিবে? ইহার কোনই প্রমাণ নাই। যদি বল বীজকে নষ্ট করিয়া অঙ্কুর জন্মে, এস্থলে বীজের ঐকান্তিক অভাব হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তোমার একথা ঠিক নয়। বল দেখি অঙ্কুরোৎপত্তিতে বীজের অবয়ব সকল উপমর্দ্দিত বা নষ্ট হয়, না অবয়বী? আমি বলি, অবয়বীসমেত বীজের অবয়বগুলি ঐ অঙ্কুরোৎপত্তিতেও অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, অঙ্কুরোৎপত্তিতে তাহাদের উপমর্দ্দন বা নাশ হয় না। আর যাহা বীজের অবয়বী তাহা যে বীজের অবয়ব ব্যতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র বস্তু ইহা তোমরাও স্বীকার কর না, যাহার অঙ্কু-রোৎপত্তিতে উপমর্দ্দন বা নাশ হইতে পারে। যদি ইহার বীজাকার হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার কর তাহা বৈনাশিকদিগের সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। ইঁহারা পরমাবয়বীই স্বীকার করেন না। যদি সংবৃত্তি অর্থাৎ লৌকিকী বুদ্ধিতে অবয়বীর উপমর্দ্দন বা নাশ মানিয়া লও তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে এই সংবৃত্তি বা লৌকিকী বুদ্ধিটা কি? ইহা অভাব না ভাব? যদি বল অভাব, তাহা হইলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় ইহার দৃষ্টান্তাভাব। যদি বল ভাব তাহা হইলে তদ্দ্বারা বীজের অবয়বের অঙ্কু-রাকারে পরিণতি যে হয় ইহারও দৃষ্টান্তা-ভাব। ভাল তোমারই কথায় মানিয়া লইলাম বীজাকারকে উপমর্দ্দিত করিয়া অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। কিন্তু বল দেখি তুমি যখন অবয়বীই স্বীকার কর না তখন তো-মার অবয়ব কোথায়? তাহার আবার

উপমর্দ্দনই বা কিরূপে সম্ভব। আচ্ছা স্বীকার করিলাম তোমাদের মতে অবয়বী ব্যতীত অবয়ব আছে, বীজোৎপত্তিতে তাহার উপমর্দ্দন হইবে। কিন্তু দেখ, বীজের অবয়বেরও একটা সূক্ষ্ম অবয়ব আছে, আবার সেই অবয়বেরও অন্য একটা সূক্ষ্ম অবয়ব আছে, এইরূপ প্রসঙ্গের নিবৃত্তি অর্থাৎ অবয়ব-পরম্পরার বিশ্রান্তি-ভূমি কোথায়? সুতরাং সর্ব্বত্র উপমর্দ্দনের উপপত্তি তুমি কিরূপে কর। কিন্তু সৎকারণবাদিদিগের সত্তা স্বীকারে একটী বিশ্রান্তি-ভূমি পাওয়া যায় সুতরাং তাহাদিগের সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অসদ্বাদিদিগের অসৎ হইতে সতের উৎপত্তির দৃষ্টান্তই নাই। কিন্তু সৎকারণবাদিদিগের তাহা আছে। তাঁহারা বলেন মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট হয়। মৃত্তিকার সত্তায় ঘটের সত্তা, মৃত্তিকার অসত্তায় ঘটেরও অসত্তা। যদি অভাব হইতেই ঘটের উৎপত্তি হইত তাহা হইলে ঘটার্থীর মৃৎপিণ্ডে কোনই প্রয়োজন হইত না।

এখন তুমি বলিতে পার যে, যে বস্তুটী যাহার উপাদান তাহার শব্দ ও তদ্বুদ্ধি বা প্রত্যয় তাহাতে অনুবৃত্তি করিয়া থাকে, এ যেমন সেইরূপ ঘটাদির উৎপত্তি বিষয়ে অভাব শব্দ ও তৎবুদ্ধির (প্রত্যয়ের) ঘটাদিতে অনুবৃত্তি হইবে। কিন্তু তাহা তো হয় না। কাজেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসিদ্ধ হইল।

পূর্ব্বপক্ষ। তুমি মৃত্তিকা থাকিলে ঘট হয়, না থাকিলে হয় না, এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা মৃত্তিকাকে ঘটের কারণ বলিতেছ কিন্তু আমি ইহার অন্যথাসিদ্ধি করিব। আমি বলিব মৃৎবুদ্ধি ঘটবুদ্ধির নিমিত্ত, মৃৎবুদ্ধি ঘটবুদ্ধির কারণ, বাস্তবপক্ষে মাটির ঘট নাই।

উত্তর পক্ষ। বুঝিলাম, কিন্তু ইহা দ্বারাও আমার পক্ষে কোন ক্ষতি হইতেছে না। কারণ তোমার কথাতে ইহাই দাঁড়াইল বিদ্যমান মৃৎবুদ্ধি অবিদ্যমান ঘটবুদ্ধির কারণ। তবেই হইল অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি তোমার মতেই অসিদ্ধ। এখন তুমি বলিতে পার মৃৎবুদ্ধিটি ঘটবুদ্ধির নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক ভাবে আনন্তর্য্য মাত্র থাকে, উভয়ের কার্য্য কারণ ভাব নাই। কিন্তু তোমার এ কথাও টেঁকিতেছে না। সত্ত্বসিদ্ধি পক্ষে কারণের পূর্ব্বভাবিতা ও কার্য্যের উত্তরভাবিতা হওয়াই সঙ্গত; কিন্তু তুমি বুদ্ধির অসত্তা হেতু আনন্তর্য্য মাত্রে নিমিত্ত নৈমিত্তিকত্ব ব্যবহার করিতেছ। এই অসতী অর্থাৎ অবিদ্যমানা বুদ্ধির আনন্তর্য্য মাত্রে নিমিত্ত নৈমিত্তিকতা কোথায় দেখিয়াছ বাহিরে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার কি? এখন বল দেখি কি প্রকারে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে বস্তুতঃ অসৎ হইতে সদুৎপত্তির কোনই দৃষ্টান্ত নাই।

এইরূপে অসদ্বাদি পক্ষকে নিরস্ত করিয়া স্বমত স্থাপন করিতেছেন।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।

হে সৌম্য! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎই ছিল।

---

* সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

প্রথম উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অপরিহার্য্য মূলতত্ত্বের সত্তা।

শুধু আজ বলিয়া নহে, সর্ব্বকালেই

* প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর-কুজাঁ (Victor Cousin)-প্রণীত "দ্য ভ্রে, দ্য বো, দ্য বিঁ"।

মনুষ্যগণ দুইটি তত্ত্বের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আসিতেছে।

এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটি অধিকতর প্রবল ও দুরতিক্রমণীয়। সেটি কি?—না, কতকগুলি ধ্রুব অপরিবর্ত্তণীয় মূলতত্ত্ব, যাহা কালের উপর নির্ভর করে না, স্থানের উপর নির্ভর করে না, অবস্থার উপর নির্ভর করে না, এবং যাহা মানব-চিত্তের অসীম বিশ্বাস ও বিশ্রামের স্থল। যে-কোন বিষয়েরই গবেষণা হউক, যতক্ষণ শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যতক্ষণ সেই তথ্যগুলিকে কোন-একটা মূলতত্ত্বে উপনীত করা না যায়, ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞানের সামিল হয় না—তাহা বিজ্ঞানের উপকরণ মাত্র।

এমন কি, ভৌতিক বিজ্ঞান তখনি আরম্ভ হয়, যখন আমরা প্রকৃতির রাজ্যে নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সকল তথ্যকে কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে বাঁধিয়া দিই। প্লেটো বলিয়াছেন:—"শুধু ঘটনা লইয়া বিজ্ঞান হয় না"।

এই-ত গেল আমাদের প্রথম আবশ্যকতা। আর একটি তত্ত্বেরও আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়া থাকি;—উহাও প্রথমটির ন্যায় বৈধ। যাহাতে আমরা মনঃকল্পিত কতকগুলি খেয়ালের দ্বারা,—নিপুণ অথচ কৃত্রিম যোগাযোগের দ্বারা প্রবঞ্চিত না হই, যাহাতে বাস্তবের উপর—প্রত্যক্ষ অনুভব ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করিতে পারি এরূপ কোন তত্ত্বেরও আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ভৌতিক বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও বিজয়-কীর্ত্তি সন্দর্শনে অজ্ঞ জনের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; তাহারা জানে না, এই উন্নতি পরীক্ষা-প্রয়োগ-পদ্ধতিরই ফল। অধুনা, এই পদ্ধতিটি এতটা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাকে এতটা অতিরিক্ত সীমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই পদ্ধতিটি অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র মনোযোগ করা হয় না।

পর্য্যবেক্ষণ ও প্রজ্ঞাকে একত্র মিলিত করা,—কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে অভিলাষী হইলে, সেই বিজ্ঞানের আদর্শকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে না দেওয়া, এবং পরীক্ষার পথে উহাকে অনুসন্ধান ও লাভ করা—ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা।

গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তাহা এক্ষণে স্মরণ কর:—কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে ইহা কি সিদ্ধ হয় নাই যে, জ্ঞানী-অজ্ঞান-নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে এরূপ কতকগুলি জ্ঞান, ধারণা, প্রতীতি, মূলতত্ত্ব আছে যাহা—ঘোর সংশয়বাদী মুখে অস্বীকার করিলেও, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ও ব্যবহারকে নিয়মিত করে? একটু আত্ম-জিজ্ঞাসা করিলেই এইগুলি প্রত্যেকেরই অন্তরে অনুভূত হইবে। এমন কি, অতীব গ্রাম্য ইতরজনেরাও নিজ নিজ পরীক্ষায় এইগুলি উপলব্ধি করিয়া থাকে। এইগুলি শুধু যে পরীক্ষার সীমার মধ্যেই বদ্ধ তাহা নহে—ইহা পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে—পরীক্ষার উপর কর্তৃত্ব করে। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার-সমূহের মধ্যে থাকিয়াও এই-গুলি সার্ব্বভৌমিক,—ইহা বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; আগন্তুক ব্যাপারের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও, এগুলি নিত্য ও অপরিহার্য্য; আমরা স্বয়ং আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ হইলেও, আমাদের সমক্ষে এগুলি অসীম ও নিরপেক্ষ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি তোমাদের সম্মুখে পরস্পর-বিরুদ্ধ কতকগুলা দুর্ব্বোধ কথা

উপস্থিত করিতেছি না, আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা আমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উপদেশেরই সিদ্ধান্ত-ফল।

সকল বিজ্ঞানেরই মূলে কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অপরিহার্য্য মূলতত্ত্ব যে আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শন করিতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ইহা-ত স্পষ্টই পড়িয়া আছে—এমন কোন গণিত শাস্ত্র নাই যাহার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র নাই—নির্দ্দিষ্ট লক্ষণা নাই—অর্থাৎ যাহার কতকগুলি নিরপেক্ষ মূলতত্ত্ব নাই।

যাহা চিন্তার গণিত সেই ন্যায়শাস্ত্রের দশা কি হয় যদি আমরা তাহা হইতে কতকগুলি মূলসূত্র সরাইয়া লই—সেই সব সূত্র যাহা সকল যুক্তি ও সকল সিদ্ধান্তের মূলীভূত।

কোন ভৌতিক বিজ্ঞান কি সম্ভব হইত, যদি তৎসংক্রান্ত তাবৎ ঘটনা ও ব্যাপারের মূলে কোন-একটা হেতু কিম্বা নিয়ম না থাকিত?

চরম হেতু-রূপ কোন মূলতত্ত্ব না থাকিলে, শারীর-বিজ্ঞান কি একপদও অগ্রসর হইতে পারিত? তাহা হইলে কি আমরা কোন-একটি দেহ-যন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম—কোন দৈহিক যন্ত্রের প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিতাম?

যে মূলতত্ত্বের উপর সমগ্র ধর্ম্মনীতি নির্ভর করে—যাহার উপর সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাও কি এই প্রকৃতির নহে?

স্থান-কাল-নির্ব্বিশেষে, নীতিবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই কি এই সকল মূলতত্ত্বের শাসনাধীন নহে? নীতিবোধ-বিশিষ্ট এমন কোন জীব কি কল্পনা করিতে পার যাহার বিবেক বুদ্ধি এই কথা বলে না যে,—অন্তরের রিপুদিগকে প্রজ্ঞার অধীনে রাখা কর্ত্তব্য, শপথবাক্য পালন করা কর্ত্তব্য, স্বার্থের প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও, যে বস্তু আমার নিকট কেহ বিশ্বাস পূর্ব্বক গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য?

এ সমস্ত দার্শনিক কুসংস্কার কিম্বা ন্যায়বাগীশদিগের কতকগুলি শাস্ত্রীয় বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। অতিসামান্য জ্ঞানেও ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে!

যদি আমি তোমাকে বলি, একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, অমনি কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর না,—কোথায় হইয়াছে, কাহা-কর্ত্তৃক হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে? তাহার তাৎপর্য্য এই;—কাল, স্থান, হেতু-ঘটিত—এমন কি, চরম হেতু-ঘটিত এমন কতকগুলি মূলতত্ত্ব তোমার অন্তরে নিহিত আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অপরিহার্য্য, এবং সেই সকল মূলতত্ত্ব দ্বারা চালিত হইয়াই তোমার মন এইরূপ জিজ্ঞাসায় তোমাকে প্রবৃত্ত করে।

যদি আমি বলি, কোন প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার কিম্বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই হত্যাকাণ্ডের হেতু,—তুমি কি তৎক্ষণাৎ, কোন প্রেমিক কিম্বা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কল্পনা কর না? তাহার তাৎপর্য্য এই;—তুমি জান, কোন কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্য নাই,—কোন বস্তু ভিন্ন কিম্বা বাস্তবিক সত্তা ভিন্ন, কোন গুণ নাই কিম্বা কোন ঘটনা নাই। যদি আমি তোমাকে বলি, ঐ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ বলিতেছে যে, তাহার অভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের কল্পনা করিয়াছিল, সঙ্কল্প করিয়াছিল, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল সে এক ব্যক্তি নহে,—সময়ান্তরে তাহার ব্যক্তিত্ব অনেকবার নবীকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে—সে যদি অকপট-ভাবে এই কথা বলিয়া থাকে

—তাহাকে কি তুমি পাগল বলিবে না ? এবং যদিও তাহার বিবিধ কার্য্য ও অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবু কি তাহাকে তুমি সেই একই ব্যক্তি বলিয়া অবধারিত করিবে না ?

মনে কর, যদি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ সাফাই করিবার জন্য এইরূপ বলে :—আমি নিজ সুখের জন্য এই হত্যা করিয়াছি ; তাছাড়া, এই নিহত ব্যক্তি এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত যে তাহার জীবন তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ হইয়াছিল ; ইহাতে দেশেরও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কেননা, একজন অকর্ম্মা নাগরিকের পরিবর্ত্তে, এমন একজন লোক পাওয়া যাইতেছে যে দেশের অধিকতর কাজে আসিতে পারে ; তাছাড়া, এক ব্যক্তির অভাবে সমস্ত মনুষ্যজাতি কিছু-আর নষ্ট হয় না, ইত্যাদি। এই সকল যুক্তির প্রত্যুত্তরে, তুমি কি সহজভাবে শুধু এই কথা বল না যে—সম্ভবতঃ সেই হত্যাকারীর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড সুবিধাজনক, কিন্তু তাহা সত্তেও ইহা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য এবং সেই হেতু কোন ব্যপদেশেই এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন করা যাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON LVI.

Man's Relation to God. (Concluded.)

God looks after us not at intervals of hours or of days or of months or of years, but He looks after us during every moment of time, for "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" "all that happens every moment proceeds from the Being who is bright as the lightning". The lightning can not but be visible to one who has eyes. When in the midst of beclouded darkness the lightning flashes, it can not remain invisible. So, dwelling in the midst of the darkness of worldly infatuation, we sometimes catch glimpses, momentary like the lightning, of the Being who is bright as the lightning, but to the souls that have been delivered from the shroud of the clouds of worldliness, God shines in full splendour like the sun, and to them that Sun never sets. Now our hearts are comforted, for we have known that all that happens every moment proceeds from that effulgent Being who is bright as the lightning. It is a perfectly demmonstrated truth.

What is the relation between man and the Being who is the cause of all that is and all that happens ? What is the relation between us and Him who is the Sovereign of the whole universe, through whose law the sun and the moon revolve in their orbits and by whose mere will the oceans can be dried up if it pleases Him so to exert his will. "সনোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" Dear is the relation that subsists between us and God from whom proceed all events. He is our Friend, He is our Father, He is the Dispenser of all that we possess and all that we may possess. What fear have we, when we are living in the dominion of the Being who is all-good ? What sweet words of hope did the old Rishis of yore utter! They said "সনোবন্ধুর্জনিতা'," "He is our Friend. He is our Father." Their realization of this dear relationship drives away all our fears, and makes our hopes run towards eternity. That Being who is beyoud time is not unmindful of our welfare ; He is so greatly our own that He is our Friend, our Father, and Arbiter of our destiny, We are the children of that immortal Spirit. When we obtain our immortal Father, we lose all fear of death, for then death loses its hideous aspect. If you be indifferent to Him, He will seem indifferent to you, but if you call unto Him with love, you will behold Him

in his loving aspect. If you, like the child, seek his lap, He will give shelter to your soul in His lap. With trust and with an unsophisticated heart offer Him the flowers of loving veneration, and He will accept them. If Him we do not love, if Him we do not revere, then how shall our feelings of love and reverence be gratified ? Now, we have got the answer to our question. This is the voice which is echoed in our souls, the voice that proclaims that He, from whom all things proceed, is our Friend, our Father and the sole Arbiter of our destiny. "ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।" He knows fully the whole universe. Dwellers of this world though we are, we know fully nothing of this world ; we have no full knowledge of a single leaf or of a blade of grass. Numberless are the suns that shine in the infinite heavens ; some of them look red in colour, others blue or yellow ; while in some solar systems there are two suns, of which the one rises while the other sets. Our imagination can not grasp the poetry of these wonders of creation. God knows fully all these worlds and systems of worlds that He has brought into being. He is all-knowing ; He knows every thing generally and particularly. Of Him is the glory on earth and in the heavens. He is so fathomless in knowledge, and who will divine how deep is He in love and in goodness ? All men in all times have asked, where is His end ? Where are the limits of His goodness and His love ? As the Father of all, He gratifies the desires of His children ; as the Friend of all He distributes love to all. "যত্রদেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।" The angels that inhabit the supernatural, divine world, exist in God, tasting of the nectareous sweetness that is in Him. The angels drink the nectar that is in Him and live in Him. Though dwelling on this earth we can also drink of the nectar of God if we be rightous and pure. When we drink of the nectar of God, then we live, but when we are shrouded by wordly infatuation, then we are dead. The hunger of the angels is for God and their food and drink are the nectar of God. As the mother's milk is what sustains the life of the child, so the nectar of God is what sustains the life of the angels. As with affection the mother feeds the hungry child with the milk of her breast, so God offers his nectar to the angels that hunger after it. Even in this life we get glimpses of Him when He reveals Himself momentarily like the lightning.. Then we obtain drops of the nectar which is in Him and of Him. As in the bright regions of the super natural, divine world, the angels worship God, nourished by the nectar in Him, so in this nether world the Brahmanas who are withont desire, who are wide awake to their spiritual interests and who are uninfatuated by the world, worship the supreme feet of that ommipaesent Being. "তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।" They only worship Him who are without desire, who keep themselves awake in order to know Him, and who by overcoming the temptations of the world, by being wideawake to the eternal well being of their souls, and by freeing themselves from desire, covet Him with all their heart. The angels drink of the nectar of God in the higher world. Though we are in this lower sphere of existence, we yearn to ascend to that higher sphere. But we can not at once pass on to that stage of life. We can however in this life drink His nectar like the angels in heaven if we place ourselves under His protection. To worship Him who is our Father and Friend and the Arbiter of our destiny we strive to the best of our might. Accompanied with friends we have come here to worship that Supreme Friend, just as the angels worship Him in heaven. Here He moveth in the breeze that is blowing, shineth in the light before us and revelleth in the soul of every one of us. May we never wander away from His feet like ungrateful sons ; may we ever hold fast His feet and may our minds be never diverted from His feet. If we can establish union with Him, that union will never come to an end. Here He is vividly present. Wake up, therefore, all ye that are the inheritors of immortality, open your eyes and behold the Being who is the Abode of mercy and our Deliverer from sin and affliction.

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৬৩১ সংখ্যা

১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০৬। ৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত।

মূল্য ২৷৴ টাকা।

এই গ্রন্থে একশত-একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-সঙ্গীত পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের রচিত ভাল ভাল সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্বরলিপি-পদ্ধতি খুব সরল ও সহজ। এমন কি যাঁহাদের একটু স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত স্বরলিপি দেখিয়াই গান-গুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন। স্বরলিপি-পুস্তক-মুদ্রাঙ্কন যেরূপ ব্যয়সাধ্য, সে হিসাবে সাধারণের সুবিধার জন্য, ইহার মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ৫৫ নং অপারচিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	(বঙ্গানুবাদ) মূল্য		১৲	মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	"	১৷৹
উত্তর-চরিত নাটক	ঐ	"	১।৹	বেণীসংহার নাটক	ঐ	"	১।৶৹
রত্নাবলী নাটক	ঐ	"	৸৹	চণ্ডকৌশিক	ঐ	"	৸৹
মালতীমাধব নাটক	ঐ	"	১।৶	প্রবোধচন্দ্রোদয়	ঐ	"	১৲
মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	"	১৷৹	বিদ্ধ শালভঞ্জিকা	ঐ	"	৷৹
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	"	১।৹	ধনঞ্জয় বিজয়	ঐ	"	।৹
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	"	৸৹	কর্পূর মঞ্জরী	ঐ	"	৷৹
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	"	৸৹	প্রিয়দর্শিকা (নবপ্রকাশিত)	ঐ	"	৷৹

নূতন পুস্তক।

১। ভারতবর্ষে (ফরাসী পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ... মূল্য ৷৹

২। ঝাঁশীর রাণী (জীবন-বৃত্তান্ত) ... মূল্য ৷৹

২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের— পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

একটী বসন্ত-প্রাতের সকুরা-পুষ্প।

সত্যমূলক জাপানী গল্প।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

মূল্য ৸৹ আনা। ডাঃ মাঃ ৴৹ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।
৭৪১ সংখ্যা
১৮২৭ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ষশেষ।

১৮২৬ শক, ৩১ চৈত্র।

যিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ" তাঁহার উপাসনার জন্য অদ্য এই পবিত্র-কালে আমরা সমাগত হইয়াছি। যতবারই জীবনে ব্রহ্মোপাসনা হয়, ততবারই জীবন পবিত্র হয়। যতবারই তাঁহাকে স্মরণ করি ততবারই জীবনের ভার লঘু বলিয়া বোধ হয়, জীবনে নূতন আনন্দের সঞ্চার হয়। "আখা জীবা বিসরে মর্ যাও" তাঁহার নাম উচ্চারণেই জীবন—বিস্মরণেই মৃত্যু। প্রতি ঘটনা অবলম্বন করিয়াই প্রাণ তাঁহাকে ডাকিতে চায়, তাই আজ বর্ষশেষ দিনে এই সন্ধিক্ষণে আমরা তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছি; তাঁহার পবিত্র উপাসনা করিয়া পবিত্র হইতে আসিয়াছি। নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলে শরীর পবিত্র হয়, পবিত্র পরব্রহ্মে নিমগ্ন হইলে আত্মা পবিত্র হয়; তাই আমরা সেই পবিত্র ব্রহ্মরূপ পবিত্রবারিতে স্নান করিতে আসিয়াছি। খুলে দাও হৃদয়দ্বার—এই শীতল সমুদ্রে মগ্ন হও, এখনি পাপ তাপ শোক হৃদয়-বেদনা অপসারিত হইবে।

"কেন সৃজন-লয়-কারণে ভজনা।
রবে না সংসার-অনল-দহন যাতনা।
দেখো দেখো সাবধান,
ধন জন অভিমান,
কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।
নিশ্বাস হতেছে শেষ,
বাড়িল অশেষ ক্লেশ,
এখনো চেতন হলো না।"

তাই বলিতেছি আজ আমাদের পরমায়ুর এক বৎসর শেষ হইয়া গেল; এখন কি একবার চমকিয়া উঠিয়া—গত বৎসরটা কেমন করিয়া কাটাইলাম, তাহা পর্য্যালোচনা করিব না? এ জীবন তাঁহার দান, ইহার অপব্যবহারে কতদূর অনুতপ্ত হইয়াছি, তাহা কি একবার এই উপযুক্ত সময়ে দেখিব না? "এমন মানব জীবন রৈল পোড়ে আবাদ করে ফল্‌ত সোনা" এ কথাটা এখন কি একবার স্মরণে আসিবে না? যাঁহার এক নিমেষের করুণা স্মরণ হইলে, শরীর কন্টকিত হয়—তাঁহার প্রদত্ত সম্বৎসরের করুণা স্মরণ হইলে হৃদয় কি

তাহা ধারণ করিতে পারে ? পারুক্ আর নাই পারুক্ এস আমরা সেই করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হই, এস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলি,

"কত যে তোমার করুণা,
ভুলিব না জীবনে ;
নিশিদিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয় মায়াজালে রহিব না ভুলে আর,
হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়,
ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে।"

কত শারীরিক কত মানসিক কত আধ্যাত্মিক বিপদ হইতে আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা একবার স্মরণ করিয়া ভক্তি-সহকারে আজি সেই মাতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের ফল লাভ কর। আজি আত্মানুসন্ধানের প্রকৃত অবসর। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত কেহই ঈশ্বরের পথে—ধর্ম্মের পথে—আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজি দেখ, মোহ, বৎসরের মধ্যে কতবার তোমায় অন্ধ করিয়া দিয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া বুঝিতে দিয়াছিল। আজি দেখ, বৎসরের মধ্যে কতবার তুমি ক্রোধ-ভুজঙ্গের দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া তোমার আত্মীয় বা পরের চক্ষু হইতে অশ্রু আকর্ষণ করিয়াছিলে। আজ দেখ, বৎসরের মধ্যে কতবার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরের ধনে পরের মানে পরের শ্রীতে পরের কোন কিছুতে আঘাত দিয়াছ কি না ? আজ দেখ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া সম্বৎসরের মধ্যে তুমি মনুষ্যকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় কতবার পদ-দলিত করিয়াছ কি না ? আজি দেখ ধনকুবের হইয়াও দরিদ্রের অশ্রুপাতে ভ্রুক্ষেপ করিয়াছ কি না ? আজি দেখ যথাযোগ্য পবিত্র স্নেহ ও ভক্তি প্রকৃত পাত্রে দান করিয়াছ কি না ? আজি দেখ, প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া বৎসরের মধ্যে কতবার তুমি শোভার আকর পরমেশ্বরে ডুবিতে পারিয়াছ। আজি দেখ সেই শান্তস্বরূপকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া তুমি হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছ কি না ? আজ দেখ হৃদয় তোমাকে সেই ব্রহ্মধামের আনন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অনন্ত আনন্দ ভোগের আশা দিতেছে কি না ? আজি মৃত্যুকে স্মরণ করিবার দিন। মৃত্যুকে প্রকৃতরূপে স্মরণ করিতে পারিলে আমাদের প্রকৃত সংযম শিক্ষা হইবে, বৈরাগ্য অভ্যাস হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস ভিন্ন কখনই ব্রহ্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইবে না। "স্মর পরমেশ্বরে বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।" আজ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমরা কি পবিত্রতর ও নূতনতর জীবন ভিক্ষা করিব না ? আমাদের যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু অপরাধ তাঁহার নিকট করিয়াছি আর যেন না করি, আর হৃদয়-বেদনা না আইসে তাহার জন্য এখন কি প্রাণপণে সকলে প্রার্থনা করিব না ? তাঁহার নিকটে আজি আমরা কি বলিব ? যাহা না বলিতে পারি তিনি তাহাও জানিতে পারিতেছেন। হে অন্তর্যামি ! তুমি আমাদের অদ্যকার পূজা গ্রহণ কর। হে অন্তর্যামি ! বিফলে গেল জীবন ! "নারিনু ধরিতে মণি, কেবল দংশিল ফণি" বলিয়াই জীবন গেল। কেন আর তোমার নামে সে প্রেমাশ্রু বহিয়া আমাদের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না ? কেন তোমার মধুমাখা নাম উদাস হইয়া বলিতে বলিতে এ সংসারের যাতনা ভুলিয়া যাই না ? কেন ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া তেমন করিয়া আত্মহারা হই না ? হে ত্রিভুবননাথ ! প্রাণদাতা ! প্রাণ তোমার হস্তে পুনর্ব্বার প্রদান

করিতেছি, প্রাণে বল দাও—তোমার প্রতি ভক্তি দাও, পবিত্রতা দাও, ব্রহ্মানন্দ দাও। কবে এ দুঃখ তাপ, পাপভার হৃদয়বেদনা হইতে মুক্ত হইয়া চিরদিনের জন্য তোমার আনন্দময় ক্রোড়ে নিমগ্ন হইব। হৃদয় এখন এই আশাই করিতেছে, এই ভিক্ষাই করিতেছে। আশা পূর্ণ কর। এই ভিক্ষা কাতরে দান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—

নববর্ষ।

১৮২৭ শক, ১ বৈশাখ।

আমাদের জ্ঞানলাভের দ্বার চক্ষুঃশ্রোত্রাদি লইয়া পাঁচটী মাত্র। কিন্তু আমরা তদ্দ্বারা বহির্বস্তুই দেখি, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইন্দ্রিয়ের গতি বাহিরে এই জন্য ইহা বহির্ব্বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইহাও আবার দেখিতেছি এই সমস্ত ইন্দ্রিয় পরপর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বস্তু গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ক্ষিতি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও অল্পব্যাপক, জল তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অধিক ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ সূক্ষ্ম ও আরও ব্যাপক, তেজ অপেক্ষা বায়ু আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং বায়ু অপেক্ষা আকাশ যার পর নাই সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। ইন্দ্রিয় সকল আকাশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তদূর্দ্ধে উহাদের আর প্রসার নাই। কারণ উহাদের বহির্ব্বস্তু গ্রহণের জন্যই জন্ম। কিন্তু পরমাত্মা যৎপরোনাস্তি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। এক্ষণে তাঁহাকে কে গ্রহণ করিবে? ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মন অবশ্য সচেতন। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ হয় বটে কিন্তু বস্তুর অবধারণ শক্তি উহার আদৌ নাই, সংকল্প বিকল্প মাত্রেই উহার পর্য্যবসান। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার দিকে মনেরও গতি নাই। মনসস্ত পরা বুদ্ধিঃ। মনের পরই বুদ্ধি আসিতেছে। বুদ্ধি অবশ্য সূক্ষ্মে অবগাহন করিতে পারে এজন্য অনাদ্যনন্ত মহান্‌কে ধরিতে যায় কিন্তু পারে না। বুদ্ধির এই চেষ্টা ঠিক্ যেন ক্রোড়স্থ শিশুর চাঁদ ধরিবার চেষ্টা। শিশু দেখিতেছে ঐ তো চন্দ্র, উহাকে এখনই ধরিব, এই বলিয়া সে করপ্রসারণ করে কিন্তু ঐ নির্ব্বোধ ইহা বুঝে না চন্দ্র দূরাৎ সুদূরে, চন্দ্র তাহা হইতে কল্পনাতীত বহুদূরে। সে চন্দ্রের বিমল কিরণে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে ধরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কর প্রসারণ করে। সূক্ষ্মাবগাহী বুদ্ধি ঠিক্ এইরূপই করিয়া থাকে। সে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় তাঁহার গহন গভীরতা ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে শীতল হয়, যতই যায় ততই দেখে ঐ তিনি নিকটে, ধরিবার জন্য আরও অগ্রসর হয় কিন্তু পরিশেষে কি এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও আত্মহারা হইয়া ফিরিয়া আইসে। হা নির্ব্বোধ, তুমি কি বুঝ না তিনি তোমা হইতে দূরাৎ সুদূরে। পরমাত্মা যদি পরিমিত বস্তু হইতেন তাহা হইলে মনবুদ্ধি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু তিনি অনন্ত অতলস্পর্শ মহান্; কাজেই মন বুদ্ধির অবিষয়। বুদ্ধেরাত্মা ততঃ পরঃ। বুদ্ধির পর আত্মা। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। ইহা পরমাত্মার হিরন্ময় সিংহাসন। এই খানেই তাঁহার অধিষ্ঠান। এখন বলিতে পার তবে তাঁহার অধিষ্ঠান আত্মাতে কৈ অনুভব হয়। অবশ্যই হয় কিন্তু কিছু

বাধা আছে। নানারূপ চিত্তবৃত্তি সততই এই আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মনের বৃত্তিনিরোধ হইলেই আত্মা স্বস্বরূপে দেখা দেন। যেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, সূর্য্য কিন্তু স্বপ্রকাশ, এই আত্মা সেইরূপ চিত্তবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন, এইজন্য প্রকাশ পান না, আত্মা কিন্তু স্বপ্রকাশ। মেঘাবরণ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ইহা যখন স্বরূপে দেখা দেন তখনই ইহার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ পুরুষের স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইয়া থাকে। যখন আমাদের এই আত্মদৃষ্টিই নাই তখন তো পরমাত্মদর্শন দুরপরাহত।

এখন এই বৃত্তিনিরোধ কিরূপে হয়। এখানে কঠোর সাধনের কথা আসিতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যতীত সাধন হয় না। যেমন আকাশপথে পক্ষিরা দুই পক্ষে নির্ভর করিয়া বিচরণ করে, সাধনপথে সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম। ইহার একতরের অভাবে সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এস্থলে কর্ম্ম বলিতে যাগ যজ্ঞাদি বুঝিলে চলিবে না। ঋষিরা কহিয়াছেন "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" এই যাগ যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম অদৃঢ় ভেলা। জ্ঞানের সহিত এই যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমন্বয়ই ঘটে না। অজ্ঞাননাশের জন্যই জ্ঞান। প্রকাশাত্মক জ্ঞানের অজ্ঞানতমোবিনাশে সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু যজ্ঞাদির তৎসম্বন্ধে কিছুই নাই। যজ্ঞাদি অপ্রকাশাত্মক। একটা অপ্রকাশ আর একটা অপ্রকাশকে কি দূর করিতে পারে? অন্ধকার দ্বারা কি অন্ধকার দূর হয়? ফলত জ্ঞানের সহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমন্বয়ই হয় না। এখানে কর্ম্ম বলিতে আধ্যাত্মিক চেষ্টা বুঝিতে হইবে। ফলত জ্ঞান ও কর্ম্ম ইহাদের একতরের অভাবে সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনের রূপরসাদি বিষয়বাসনাতেই বিক্ষেপ। বিক্ষেপ দূর না হইলে কখন মন স্থির হয় না। এই সম্বন্ধে কোন কবি বলিয়াছেন,

> কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গ-
> মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
> একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে
> যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

হরিণ হস্তী পতঙ্গ ভৃঙ্গ ও মৎস্য এই পাঁচটী জীব রূপরসাদি পাঁচ বিষয় দ্বারা বিনাশ পায়। হরিণ ব্যাধের বংশীরবে মুগ্ধ হইয়া ধরা পড়ে। হস্তী করিণীর স্পর্শলোভে গর্ত্তমধ্যে পতিত ও পাশবদ্ধ হয়। পতঙ্গ জ্বলন্ত অগ্নির রূপমোহে আত্মবিসর্জ্জন করে, ভৃঙ্গ মধুরসে আকৃষ্ট ও পদ্মমধ্যে বিনষ্ট হয়, আর মৎস্য বড়শীমুখে আমিষগন্ধ পাইয়া যেমন গলাধঃকরণ করে অমনি মরে। শব্দস্পর্শাদির এক একটী এক একটীর মৃত্যুর কারণ কিন্তু যে ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পঞ্চ বিষয় একাকীই ভোগ করে সেই প্রমাদীর বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। এখন বুঝ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সম্বন্ধ কি সাঙ্ঘাতিক। ইহাই চিত্তবিক্ষেপের নিদান। গীতাকার এই বিক্ষেপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কহিয়াছেন, যখনই বিষয়সংযোগ হইবে তখনই বুঝিও এই সংযোগের কর্ত্তৃত্ব তোমাতে নাই। ইন্দ্রিয় আছে তাহার বিষয়ও আছে, সে স্ববিষয়ে বিচরণ করে কিন্তু তাহার এই বিষয়প্রবণতায় তুমি লিপ্ত নও। তাৎপর্য্য এই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সম্বন্ধ দূর করা বড় কঠিন, একরূপ অসম্ভব। বিষয়ভোগ কর কিন্তু তাহাতে নিজে আসক্তিশূন্য হও। অনাসক্তের বিষয়সেবায় কোনই চাপল্য আইসে না, প্রত্যুত শান্তি। তাই গীতা বলিয়াছেন, নদনদী সকল নানাদিক হইতে আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, পড়িলেও সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ.

স্থির ধীর গম্ভীর। সেইরূপ কামনা সকল ঐ নদ নদীর ন্যায় আপনা হইতে যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তি পান কিন্তু যিনি এই কামনাকে চেষ্টা করিয়া আনেন তাঁহার শান্তি নাই। আসক্তিতেই চেষ্টা হয়, চেষ্টা তেই চিত্তের বিক্ষেপ আইসে। অতএব সর্ব্বাংশে আসক্তিশূন্য হও। আরও একটী কথা। সত্ব রজ তম এই তিনটী মনের ধর্ম্ম। সত্বগুণে স্থৈর্য্য, রজোতে চাঞ্চল্য এবং তমে মূঢ়ভাব। এই ধর্ম্মত্রয়ের তারতম্য আবার ভুক্ত দ্রব্যের গুণদোষেই ঘটিয়া থাকে। যে বস্তু স্নিগ্ধ তদ্দারা সত্বের, যে বস্তু রুক্ষ ও বিদাহী তদ্দারা রজস্তমের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং মনের স্থৈর্য্য সাধন পক্ষে স্নিগ্ধ বস্তুই উপযোগী। এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি থাকা উচিত।

এইরূপ উপায়ে চিত্তস্থির কর, কৃতাত্মা হও তবেই সেই হিরণ্ময়কোষে বিদ্যুৎ পুরুষের স্ফূর্ত্তি অনুভব হইবে। সরোবর স্থির ও নির্ম্মল হইলেই তন্মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। তিনি যেমন বাহিরে আছেন তেমনি অন্তরেও আছেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম আশ্রয় কর, কৃতাত্মা হও, অবশ্য তাঁহার দর্শন পাইবে।

অন্তর্য্যামি! আমরা তোমাকে পাইবার জন্য লালায়িত। সংসারের সমস্তই অস্থির ও চঞ্চল। আমরা তাহাদিগকে সুখের প্রত্যাশায় ধরি কিন্তু কোনটিই থাকে না।

"যত আশ্রয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় স্বামী
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত্ত লাগিয়া।

জীবনের পরীক্ষায় দেখিলাম এক তুমিই ধ্রুব আশ্রয়, তাই তোমাকে চাই। চক্ষের এই দুইখানি কপাট চিরতরে পড়িবার সময় আসিয়াছে, চারিদিকে আঁধার দেখিতেছি, এখন তোমাকে পাইলে চক্ষের আলোক ও বক্ষের বল পাই। দীন হীনের এই কাতর প্রার্থনা। প্রভো, এ দেশের মঙ্গল কর, এই পরিবারের মঙ্গল কর। আজ নববর্ষ, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে আসিয়া তোমার পূজা প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিলাম। এক্ষণে তোমার আরতি করিয়া কৃতার্থ হই।

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে
সকল-বন রাজি ফুলন্ত জ্যোতি।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।

সত্য. সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্বের সত্তা।

(প্রথম উপদেশের অনুবৃত্তি)

যে বুদ্ধির দ্বারা কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়, সেই একই বুদ্ধির দ্বারা—কোন্‌গুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী নহে, কোন্‌গুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থাৎ ন্যূনাধিক স্থলে প্রযুক্ত হয় মাত্র—তাহাও নির্নীত হইয়া থাকে।

একটা ব্যাপক সত্যের দৃষ্টান্ত দিইঃ যথা—রাত্রির পর দিন আইসে। কিন্তু এ সত্যটি কি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী? ইহা কি সর্ব্বদেশে বিস্তৃত?—হাঁ, আমাদের বিদিত সর্ব্বদেশেই বিস্তৃত। কিন্তু যত প্রকার দেশ সম্ভবত থাকিতে পারে—সমস্ত দেশেই কি ইহা বিস্তৃত?—না; যেহেতু, অন্য কোন জগতের বিধানানুসারে এমন কোন দেশও আমরা কল্পনা করিতে পারি যাহা চির-নিশায় নিমজ্জিত। যে জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তাহার নিয়মগুলি আমরা

যেমনটি দেখি তাহাই—তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। ঐ সকল নিয়মের যিনি প্রণেতা, তিনি অন্য নিয়মও নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। জগতের অন্য কোন বিধানানুসারে অন্য প্রকার ভৌতিক ব্যাপারের কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্য প্রকার গণিততত্ত্ব কিংবা অন্যপ্রকার নীতিতত্ত্বের কল্পনা করা যায় না। তেমনি, রাত্রি ও দিবসের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সম্বন্ধ স্থল-বিশেষে নাও থাকিতে পারে—এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব নহে। অতএব, রাত্রির পর দিন আইসে—এই যে সত্য, ইহা একটি ব্যাপক সত্য—সম্ভবতঃ ইহা সার্ব্বভৌমিক সত্য; তাই বলিয়া, ইহা অবশ্যম্ভাবী সত্য নহে।

মন্‌টেস্‌ক্যু বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা গ্রীষ্ম দেশের ফল নহে"। মানিলাম, উত্তাপে আত্মা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে,—উষ্ণ দেশে স্বাধীন শাসনতন্ত্র পরিচালন করা কঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া, উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনই হইতে পারে না। বাস্তবপক্ষেও কতকগুলি ব্যতিক্রম-স্থল আছে। অতএব এই নিয়মটিও একেবারে সার্ব্বভৌমিক নহে, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবিতাও আরো কম। কিন্তু এইরূপ ভাবে তুমি কি কারণতত্ত্বের কথা বলিতে পার? কোনো স্থানে কিংবা কোন কালে, তুমি কি এমন কোন ব্যাপার কল্পনা করিতে পার যাহা কোন ভৌতিক কিংবা নৈতিক কারণ ব্যতীত আবির্ভূত হইয়াছে?

যদি কল্পনা-বলে জগতের সমস্ত সত্তা ধ্বংস করিয়া, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শুধু একটি মনকে রাখা যায়, আর যদি সেই মনের বৃত্তিগুলিকে কিছুমাত্র পরিচালিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, সেই মনের মধ্যে কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব নিবিষ্ট করিতে আমরা বাধ্য হই।

এই সকল মূলতত্ত্বের ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এবং উহাদের কার্য্য-প্রসর কমাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদিরা কতই চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সেই চেষ্টা যে বৃথা চেষ্টা হইয়াছে তাহা আমরা কতবার দেখাইয়াছি। পরীক্ষাবাদিরা কি বলেন শুনা যাক্।

যাহাকে আমরা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী বলি সেই কারণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—ইহা মনের একটা অভ্যাস-মাত্র। তাঁহারা বলেন—প্রকৃতি-রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই, একটা ঘটনা আর একটা ঘটনাকে অনুসরণ করে, এবং এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের মন তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে; এই সম্বন্ধকেই আমরা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বলি। এইরূপ ব্যাখ্যা, শুধু যে কারণের মূলতত্ত্বকে উচ্ছেদ করে তাহা নহে, কারণ-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহারো মূলোচ্ছেদ করে। মনে কর দুইটি গোলা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। একটি চলিতে আরম্ভ করিল; তাহার পরেই, আর একটি চলিল। এইরূপ পারম্পর্য্য যখন সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে, তখন সেই পারম্পর্য্যের সহিত নিত্যতার যোগ হয়, এইমাত্র। অল্পমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমরা যে কারণ-শক্তির পরিচয় পাই, পূর্ব্বোক্ত পারম্পর্য্যের দ্বারা, সেই কারণ-শক্তি-সম্ভূত কার্য্য-কারণের বিশেষ সম্বন্ধটি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি আত্মমতের সুসঙ্গতি বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সেই পরীক্ষাবাদী হিউমও সহজেই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন্‌

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দ্বারা, বৈধভাবে কারণ-তত্ত্বের ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

কারণ-জ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ঐ জাতীয় অন্যান্য জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

অন্ততঃ, বস্তুত্ব ও একত্ব-জ্ঞানের উদাহরণ এইখানে দেওয়া যাউক।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, শুদ্ধ কতকগুলি গুণ ও ঘটনামাত্র আমরা উপলব্ধি করি। আমরা বিস্তৃতি স্পর্শ করি, বর্ণ দর্শন করি, গন্ধ আঘ্রাণ করি। কিন্তু বিস্তৃত, রঞ্জিত, গন্ধিত বস্তুকে কি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে? এই বিষয়ে হিউম একটু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোঠায়, বস্তু-জ্ঞানকে ফেলিতে পারা যায়? তবে, তাঁহার মতে—তাঁহার পরীক্ষাবাদ-অনুসারে, এই বস্তুজ্ঞানটি কি?—কারণ-জ্ঞানের ন্যায় ইহাও একটা বিভ্রম মাত্র! একত্বের জ্ঞানও আমরা ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত হই না। কেননা, একতা কি?—না,—তাদাত্ম্যতা, অবহুলতা; পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে যাহা কিছু প্রকাশ পায় সমস্তই, পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট—সমস্তই যৌগিক। কোন কারু-কার্য্যের মধ্যে যে একতা দৃষ্ট হয় উহা কারুকার্য্য-সম্ভূত মানব-মনের রচনা-সম্ভূত। কোন পদার্থের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা অঙ্গ-বিন্যাসের একতা। জ্ঞান-মূলক ও নীতি-মূলক একতা কেবল আত্মারই গ্রাহ্য—উহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, যদি সামান্য ধারণা-গুলিরই ব্যাখ্যা না হয়, তবে ঐ ধারণা-সমূহের মধ্যে যে মূলতত্ত্ব নিহিত—যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী—তাহার ব্যাখ্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়া ত আরো অসম্ভব। "এই একটী তথ্য, ঐ আর একটি তথ্য" এইরূপ বিশেষ-ভাবেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যে মূলতত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক তাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই তথ্যটি কি?—প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা শুধু তাহারই পরিচয় দেয়; কিন্তু, "উহা না হইলেই নয়" "উহার না-হওয়া অসম্ভব"—এবম্বিধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা পৌঁছিতে পারে না।

আর একটু বেশি দূরে যাওয়া যাক্। পরীক্ষাবাদ, শুধু যে সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে না তাহা নহে; আমরা আরো এই কথা বলি, এই সব মূলতত্ত্বকে ছাড়িয়া, পরীক্ষা-বাদ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

কারণের মূলতত্ত্বকে উঠাইয়া লও—দেখিবে, মানব-মন আপনা হইতে ও আপনার বিকারগুলি-হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা জানিতে পারিবে না—ঐ ইন্দ্রিবোধ-গুলির কারণ কি, অথবা উহার কোন কারণ আছে কি না তাহাও জানিতে পারিবে না। কিন্তু এই কারণতত্ত্বকে মানব-মনে আবার প্রতিষ্ঠিত কর,—স্বীকার কর যে, প্রত্যেক আবির্ভাব, প্রত্যেক পরিবর্ত্তন, প্রত্যেক ঘটনার ন্যায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বোধেরও একটা কারণ আছে, (কেননা ইহা-ত স্পষ্টই দেখা যায়, আমাদের কতকগুলি অনুভূতির কারণ আমরা নিজে নহি—অবশ্যই তাহার অন্য কারণ আছে)—তাহা হইলে, এমন কোন কারণে তুমি স্বভাবত উপনীত হইবে যাহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র। বাহ্যজগতের ধারণা প্রথমে এইরূপেই আমাদের মনে উদয় হয়। কারণ-সমূহের এই সার্ব্বভৌ-

মিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব হইতেই আমরা বাহ্য জগতের সত্তা উপলব্ধি করি এবং এই ধারণাটিও উক্ত মূলতত্ত্বের দ্বারাই সমর্থিত হইয়া থাকে। তবে-কিনা ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মূলতত্ত্ব এই ধারণাটিকে আরো পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে।

আমি জিজ্ঞাসা করি—যখনি তুমি জানিলে, কতকগুলি বাহ্যবস্তু আছে, তখনি তোমার মনে হয় কি না—সেই সকল বস্তু কোন-না-কোন স্থান অধিকার করিয়া আছে? তাহা যদি তুমি অস্বীকার কর তাহা হইলে, কোনো বস্তু কোনো স্থানে যে থাকে ইহাও তোমাকে অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে একটা ভৌতিক সত্যকে তোমার অস্বীকার করিতে হয়—যাহা মনোবিজ্ঞানেরও একটি মূলতত্ত্ব—যাহা সাধারণ জ্ঞানেরও একটি মূলসূত্র। কিন্তু, কোন বস্তু যেস্থানে থাকে, অনেক সময়ে সেইস্থানটিও একটা বস্তু—কেবল প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এই মাত্র। এই নূতন বস্তুটিও আবার আর একটা স্থানে অধিষ্ঠিত। এই যে নূতন স্থান ইহাও কি একটা বস্তু? যদি বস্তু হয়, এই বস্তুটিও আর একটি স্থানে অধিষ্ঠিত যাহা অপেক্ষাকৃত আরো বৃহৎ;—এইরূপ পরপর। এইরূপে তোমার মন একটা অসীম ও অনন্ত স্থানের ধারণায় উপনীত হয়—যাহার মধ্যে, সমস্ত সসীম স্থান ও সমস্ত বস্তু সন্নিবিষ্ট। এই অসীম ও অনন্ত স্থানই আকাশ।

ইহা-ত অতি সহজ কথা। দেখঃ—এই জল যে এই জল-পাত্রের মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই জলপাত্রটি যে একটা ঘরের মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই ঘরটি যে আর একটি বৃহত্তর স্থানে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? আর সেই বৃহৎ স্থানটিও যে আর একটা বৃহত্তর স্থানের অন্তর্গত তাহা কি তুমি অস্বীকার কর?—এইরূপে তোমাকে আমি অনন্ত আকাশ-পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারি। উক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে তুমি যদি একটা প্রতিজ্ঞা অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই অস্বীকার করিতে হয়। যদি প্রথমটিকে স্বীকার কর, তাহা হইলে শেষটিকেও স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য হইবে।

যাহা হইতে গোড়ায় বস্তুজ্ঞানই উৎপন্ন হয় না—শুধু সেই ইন্দ্রিয়বোধ কি করিয়া তোমাকে আকাশের ধারণায় উপনীত করিবে? অতএব দেখা যাইতেছে, এস্থলেও একটা উচ্চতর মূলতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

জীবন-সাগরে যাত্রা।

সমুদ্র-যাত্রাকালে, জাহাজ কোথাও থামিয়া যখন নোঙ্গর করে, তুমি তখন জল আনিবার জন্য ডাঙ্গায় যাও, এবং জল সংগ্রহ হইলে, পথে কন্দমূল কড়ি আদি যাহা কিছু পাও তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাক; কিন্তু জাহাজের কর্ত্তা পাছে কোন সময়ে তোমাকে ডাকেন এই জন্য সর্ব্বদাই জাহাজের দিকে তোমার মন স্থির রাখিতে হয়। আর, তিনি ডাকিবামাত্র ঐ সমস্ত জিনিস ফেলিয়া, জাহাজে তোমায় ছুটিয়া আসিতে হয়। যদি তাঁহার ডাকে না আইস তাহা হইলে তিনি ছাগ-মেষাদির ন্যায়, হাত-পা বাঁধিয়া তোমাকে জাহাজের খোলের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মানব-জীবনেও সেইরূপ। কন্দ মূল কড়ি প্রভৃতির ন্যায়, স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু নৌ-স্বামী যদি

তোমাকে ডাকেন, তাহা হইলে সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া, জাহাজে তোমাকে ছুটিয়া আসিতেই হইবে—পশ্চাৎদিকে একবার তাকাইতেও পারিবে না। তুমি যদি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া থাক, তাহা হইলে জাহাজ হইতে কখনই দূরে যাইও না, পাছে প্রভু তোমাকে ডাকেন আর তুমি প্রস্তুত না থাক।

সার সত্যের আলোচনা।

কাণ্টের মূলমন্ত্র।

দেশীয় দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওঙ্কার; কাণ্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of apperception অর্থাৎ সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। এই মূলমন্ত্রটির প্রভাবে কাণ্ট্ অভেদজ্ঞানের দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তবে যে, কেন তিনি অভেদ-জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না তাহা আশ্চর্য্য যদিচ খুবই, কিন্তু তাহার একটি নিগূঢ় কারণ আছে; তাহা এইঃ—

ভেদবুদ্ধির উপত্যকা হইতে যিনি অভেদ জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে চাহেন, তাঁহার উচিত একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া—পথের মাঝে থামিয়া-দাঁড়াইয়া তিনি যেন পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন। কাণ্ট্ অভেদজ্ঞানের দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়াই চৌকাটে ঠোকর খাইয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার কিয়ৎপরে যেমি তিনি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, আর অম্নি ভেদবুদ্ধির মায়ামৃগ তাঁহার জ্ঞানচক্ষুতে ধাঁদা লাগাইয়া হড়্‌হড়্ করিয়া তাঁহাকে নীচে টানিয়া লইয়া চলিল। ইহারই নাম কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি।• যাহাই হউক্ না কেন—যোগাত্মক ঐক্যের ন্যায় অমনতরো আর-একটা অভেদজ্ঞানের কপাট খুলিবার অব্যর্থসন্ধান-চাবি খুঁজিয়া বাহির করা সোজা কথা নহে। কিন্তু সে চাবিটি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা আছে শক্তস্থানে—'বিশুদ্ধজ্ঞানের সমালোচনা' নামক দর্শন-গ্রন্থে। বহুপূর্ব্বে ধাত্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে, কোনো ক্ষুধাতুর পরিব্রাজক রাক্ষস-পুরীর রাজদ্বারে অতিথি হইলে তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় লোহার কড়াই ভাজা! তেমনি, কালে ভদ্রে যদি কোনো সত্যপথের পথিক জ্ঞানের লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থের মলাট্-কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়া ভিতরে উঁকি দিতে সাহসী হ'ন, তবে ঠিক্ লোহার কড়াই-ভাজা না হউক্—তাহারই সহোদর-শ্রেণীর দন্তনিসূদন সাক্সালো সামগ্রী তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বদ্ধপরিকর পরিবেষক যদি বলেন—"আর চাই?", তবে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি পরিবেষকের কার্য্যপটুতার প্রতি আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া বলেন—"দিবে দেও! অধিকন্তু ন দোষায়;" কিন্তু কাণ্টের দ্বারের অতিথি তাহা বলেন না। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেন—"যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্।" সহযাত্রিগণের সহিত কাণ্টের দর্শনমন্দিরের অতিথি হইয়া আমিও এক্ষণে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, 'অধিকন্তু বড় যে ন দোষায়' তাহা নহে, পরন্তু 'মরণায়'! অতএব "যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্," এইটিই ঠিক্! পোষ্টাই সামগ্রী অল্পস্বল্পই ভাল। আমি তাই পরিবেষকের দলে মিশিয়া সহযাত্রিগণের পাতে-পাতে এক-আধ মুটার অনধিক কাণ্টীয় অন্ন খুব বিবেচনার সহিত সুসাবধানে বিলি করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভোক্তারা হয় তো দুই-গ্রাস মুখে উঠাইতে-না-উঠাইতেই বলিবেন—"যথেষ্ট হইয়াছে যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্।"

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য।

কাণ্ট্ যে বলিয়াছেন "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য," তাহা বস্তুটা কি? বস্তুটা হ'চ্চে—পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে যাহাকে আমি বলিয়াছি নিখিলবিশ্বের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। আমি তো এইরূপ বলিতেছি, কিন্তু কাণ্ট্ নিজে কিরূপ বলেন? কাণ্টের নিজের কথার তিনি নিজে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। কাণ্টীয় দর্শনের মোট কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কাণ্ট্ তাঁহার নিজের যেরূপ অভিপ্রায় নিজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চুম্বক বিবরণ এইঃ—

একত্ব যোগ বৈচিত্র (ক্ষেত্র দেখ)

একত্ব হ'চ্চে সংবিতের একত্ব (consciousness এর একত্ব); যোগ হ'চ্চে কল্পনার যোগ; বৈচিত্র্য হ'চ্চে দেশকালের বৈচিত্র্য। ভেদবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া কাণ্ট্ প্রথমে বৈচিত্র যোগ এবং একত্ব, তিনকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে বিন্যস্ত করিলেন;—বৈচিত্র্য থুলেন দেশকাল-পাত্রে, যোগ থুলেন কল্পনা-পাত্রে, একত্ব থুলেন সংবিৎ-পাত্রে। তাহার পরে একত্ব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যবর্ত্তী সেই যে কল্পনা-মূলক যোগ, সেই কল্পনা-মূলক যোগের গাত্রে সংবিতের একত্ব সঙ্ঘটিত করিয়া একমেটে যোগ'কে দোমেটে করিয়া গড়িয়া তুলিলেন, আর, সেই দোমেটে যোগের নাম দিলেন বুদ্ধির যোগ। কাণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে, কল্পনার যোগ সংবিতের একত্ব হইতে আপনাকে অলগ্ রাখে; বুদ্ধির যোগ সংবিতের একত্বকে মাথার মুকুট করিয়া মস্তকে ধারণ করে। কাণ্ট্ এটাও কিন্তু বলেন যে, ও-দুই পৃথক্-শ্রেণীর যোগের মধ্যে কেবল একমেটে-দোমেটে'র প্রভেদ, তা বই—বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। কথাটা আর-কিছু না—গৃহবিড়াল বনে গেলেই যেমন বনবিড়াল হইয়া ওঠে, কল্পনার যোগ তেমনি সংবিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে। ফলে, সংবিতের ঐক্য একপ্রকার স্পর্শমণি; তাহার স্পর্শমাত্রে একমেটে যোগ দোমেটে হইয়া ওঠে—কল্পনার যোগ বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে। কাণ্টের এই কঠোর বৈজ্ঞানিক-ধাঁচার কথাটিকে লৌকিক-ধাঁচার সভ্যভব্য পরিচ্ছদ পরিধান করানো আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হো'ক্।

আরব্য-উপন্যাসের আবুল্‌হোসেন্ যখন কালিফের সিংহাসনের রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কালিকে'র আমি এবং আজিকে'র আমি'র মধ্যে একত্বের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল খুবই। ব্যাপারটা যে কি, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে তিনি জবুথবু বনিয়া গিয়াছিলেন; তাহার পরে বিপুল সাম্রাজ্যের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে সত্যসত্যই রাজরাজেশ্বর মনে করিতে লাগিলেন। রাজা যেরূপে বসেন-দাঁড়ান, ভাবেন-চিন্তেন, বিচার করেন, আদেশজ্ঞাপন করেন, সমস্তই সদ্য-সদ্য তাঁহার মনোমধ্যে কল্পনার যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া-হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলিতে লাগিল। আবুল্‌হোসেনের কালিকে'র আমি'র সংস্রব হইতে তাঁহার আজিকে'র আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার কল্পনার বা মনোরথের ঘোটনা এবং যোজনা এই দুই জুড়িঘোড়া উন্মত্তবেগে ছুটিতে লাগিল; আর, মাঝে-মাঝে থমকিয়া-দাঁড়াইয়া পশ্চাতে পা ছুড়িয়া বুদ্ধি-সারথির চক্ষে রাশি-রাশি ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার

দুইদিন পরে যখন রাজাধিরাজ কালিফ আবুল্‌হোসেনের ঘুম ভাঙাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমভাঙাইয়া দিলেন, তখন আবুল্‌হোসেনের বুদ্ধির হাড়ে বাতাস লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার সাধের মনোরথ স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হইয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। যাহাই হোক্ না কেন—আবুল্‌হোসেনের পরশ্বতরশ্বের আমি এবং অদ্যকল্যের আমি'র মধ্যে অখণ্ডনীয় ধ্রুব ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; আর, তাহা যখন হইল, তখন তাঁহার নিকটে বিগত দুইদিনের সমস্ত প্রহেলিকা দুধ্‌কে-দুধ্ জল্‌কেজল্ হইয়া গেল। পূর্ব্বদিনে আবুল্‌হোসেনের মনোমধ্যে আজিকের সঙ্গে কালিপরশ্বের যোগসূত্রের খেই হারাইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে সংবিতের ঐক্য প্রত্যাবর্ত্তন করা'তে সেই হারা-সন্ধানসূত্র খুঁজিয়া পাইতে আবুল্‌হোসেনের একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। আজি-কালি-পরশ্বের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংবিতের ঐক্যমূলক এই যে যোগ, ইহাকেই বলেন কাণ্ট্—বুদ্ধির যোগ। এখন তো আবুল্‌হোসেনের মনে বুদ্ধির যোগ মাথা তুলিয়া-উঠিয়া আজি-কালি-পরশ্বের সমস্ত বৃত্তান্তের উপরে আলোক নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু গতকল্য, তাঁহার মনোমধ্যে যোটনা এবং যোজনা, এই দুই প্রমত্ত ঘোটক সাংবিত ঐক্যের লাগাম ছিঁড়িয়া কেমন উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা তো দেখিয়াছ! তাহাকেই বলেন কাণ্ট্—কল্পনার যোগ। তাই বলি যে, যোগফণী যখন মণি হারাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করে, তখন তাহারই নাম কল্পনার যোগ; পক্ষান্তরে, যোগফণীর মাথায় যখন মণি জ্বল্‌জ্বল্ করিতে থাকে, তখন তাহারই নাম বুদ্ধির যোগ। সে মণি কি? না, Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। মণিটার মূল্য কাণ্ট্ রীতিমত যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশীয় দর্শনকারেরা যুক্তি এবং শাস্ত্রের বাজারে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া যাচাই করিয়া দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহা সাত-রাজার ধন মাণিক! সাত রাজা হ'চ্চেন ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্ত লোকের সপ্ত লোকপাল; আর, সাত-রাজার ধন হ'চ্চে সপ্তলোক বা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কেহ হয় তো বলিবেন, "পাগলের মতো কি বলিতেছ? সংবিৎকে বলিতেছ—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড!"

"হাঁ, তাই আমি বলিতেছি! সংবিৎ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বটে! কিন্তু এ কথার অর্থ এবং তাৎপর্য্য এখন না—ইহার পরে ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রকাশ্য।"

কাণ্টের ইতস্তত:।

গোড়াতেই বলিয়াছি যে, কাণ্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য; আর, আমাদের দেশীয় দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওঙ্কার। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল নামে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যকে যদি কেবলমাত্র একটা দার্শনিক-ছিন্নসত্তা-রূপে (abstract entity রূপে) গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার সমস্ত গৌরব-মাহাত্ম্য সেই দণ্ডে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের পাল্লায় পড়িয়া উহার ভাগ্যে ঘটিয়াছেও তাই! আমাদের দেশের দর্শনকারেরা যে সংবিতের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লেখনীর দুই-এক আঁচ-

ড়েই সপ্রকাশ। তা'র সাক্ষী পঞ্চদশীর গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, অনেকধা যাতায়াত করিতেছে—তাহার মধ্যে একাকী কেবল আপন প্রভায় আপনি প্রকাশমানা সংবিৎ না-জানেন উদয়—না-জানেন অস্ত। সংবিতের শেষোক্তপ্রকার বিশ্বব্যাপী সার্ব্বাত্মিকতা কাণ্ট্ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন; আর তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সংবিতের ঐক্য'কে ফাঁকা ঐক্য না বলিয়া বলিয়াছেন—যোগাত্মক (Synthetic) ঐক্য। কাণ্ট্ বুঝিয়াছিলেন, এটা সত্য—কিন্তু বুঝিয়াও বোঝেন নাই। কাণ্টের মনোমধ্যে এইরূপ ইতস্তত ঘটাইবার কর্ত্রী হ'চ্চেন আর-কেহ না—ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধি। কাণ্ট্ যে অর্থে 'যোগাত্মক'শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই এইরূপ বুঝায় যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংবিতের যোগসূত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্বদ্ধ। এমন কি, কাণ্ট্ এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের গোড়া-বন্ধনের কর্ত্রী একাকিনী কেবল সংবিৎ। দুঃখের বিষয় এই যে, কাণ্ট্ তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথাটি পষ্ট করিয়া বলিতে গড়ীমসী এবং ইতস্তত করিয়াছেন বড্ড বেশীমাত্রা। কাণ্ট বলিয়াছেন যে, সংবিতের ঐক্যস্ফুরণের পূর্ব্বে যোগের সঙ্ঘটনকার্য্য বা যোজনাকার্য্য কল্পনাকর্ত্তৃক অজ্ঞাতসারে—অন্ধভাবে—সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাণ্টের এ কথায় শ্রোতার মনোমধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে; তাহা এই:—জ্ঞাতা-কর্ত্তৃক যে কার্য্য অজ্ঞাতসারে করা হয়, সে কার্য্যের কর্ত্তা জ্ঞাতা নিজে, অথবা প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? সুপ্ত ব্যক্তি যদি ঘুমের ঘোরে সহশায়ী ব্যক্তিকে প্রহার করে, তবে প্রহার করিল যে—সে কে? সুপ্তব্যক্তি নিজে, অথবা তাহার প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি নিজে; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার সেই নিজের কার্য্যের জন্য নিজে দায়ী, অতএব তাহাকে পুলিসে দেওয়া উচিত। যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার সে অজ্ঞানকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী নহে—অথচ সে কার্য্য তাহার নিজেরই কার্য্য; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, অন্ধ প্রকৃতির কার্য্যও জ্ঞাতার নিজের কার্য্য। সাবধান! সম্মুখে একটা প্রবল ঘূর্ণার পাক ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে! সে ঘূর্ণার পাক এইরূপ:—

প্রথম কথা।

কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্যের আয়ত্ত বহির্ভূত।

দ্বিতীয় কথা।

অথচ সে যোগের সংঘটন-ক্রিয়া—অর্থাৎ যোজনা-ক্রিয়া—জ্ঞাতা-কর্ত্তৃক অজ্ঞাতসারে প্রবর্ত্তিত হয়।

তৃতীয় কথা।

এটা যখন স্থির যে, কাল্পনিক যোজনা-ক্রিয়া জ্ঞাতা-কর্ত্তৃক অজ্ঞাতসারে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ঐপ্রকার যোজনা ক্রিয়ার ফল যে একমেটে যোগ, তাহাও অবশ্য জ্ঞাতা'র একত্বে আপাদমস্তক ওতপ্রোত। শেক্স্পীয়র্ বলিয়াছেন "there is method in madness" খ্যাপামি'র মধ্যেও একত্বের বাঁধুনি আছে। সে একত্ব, অবশ্য, জ্ঞাতারই একত্ব। একমেটে কাল্পনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্য্যেও জ্ঞাতার-একত্বের হস্ত তবে আছে? জ্ঞাতার একত্বই তো সংবিতের একত্ব! যদি বল যে, সংবিতের

একত্ব স্বতন্ত্র—জ্ঞাতার একত্ব স্বতন্ত্র ; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, আমার জ্ঞানের কার্য্য আমার আপনার কার্য্য নহে। অতএব তুমি যখন বলিতেছ যে, একমেটে কাল্পনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্য্যেও জ্ঞাতার একত্বের হস্ত আছে, তখন তাহাতেই আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সে কার্য্যে সাংবিত ঐক্যের হস্ত আছে। তবেই হইতেছে যে কল্পনাপ্রধান একমেটে যোগ-ক্ষেত্রেও সংবিতের ঐক্য আধিপত্য বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু গোড়ায় তুমি বলিয়াছ যে, কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্য হইতে স্বতন্ত্র (প্রথম কথা দেখ)।

বারান্তরে আমি দেখাইব যে, কাণ্ট্ ভেদবুদ্ধির কুহকে মুগ্ধ হইয়া সাধ করিয়া ঐ পাকচক্র-খেলনে-ওয়ালা অসঙ্গতি-সর্পটা'কে দুগ্ধ দিয়া গ্রন্থমধ্যে পুষিয়াছেন! কাণ্টের উচিত ছিল, গোড়াতেই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের একত্ব (যোগ এবং বৈচিত্র্যের বস্তুগত একত্ব) প্রতিপাদন করা। তাহা না করিয়া —গোড়াতেই তিনি ভেদবুদ্ধির উকিলী-কব্দিতে ঘাড় পাতিয়া-দিয়া জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছেন। শেষে তাই আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া নাকালের একশেষ হইয়াছেন।

মহম্মদ।

৩য় প্রস্তাব।

মহম্মদ অনেকের সমক্ষে স্বর্গভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন; কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ সন্দিহান হইল, কেহ বা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিল। মহম্মদের এক্ষণে ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত। উৎসাহদাত্রী খাদিজা জীবিত নাই, রক্ষক ও বিশ্বাসী আবুতালেব স্বর্গগত; শিষ্যগণ লাঞ্ছিত, নিজে স্বীয় জীবিকা ও আত্মরক্ষার জন্য গোপনে আবার তাহাদেরই অনুরাগ ও সাহায্যপ্রার্থী। দশ বৎসর ধরিয়া মহম্মদ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কিন্তু শত্রুর অত্যাচারে নানাবিধ যন্ত্রণায় ও নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যে তিনি ক্রমেই ডুবিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাতে আলস্য বা ঔদাস্য নাই। লোকে জীবনের যে অংশে শান্তি ও বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করে, অতীত জীবনে অর্জ্জিত সৌভাগ্য উপভোগ করিতে চায়, অনিশ্চিত-ফলপ্রসূ ও উদ্যমসাপেক্ষ নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কোচ বোধ করে, মহম্মদ সেই পরিণত বয়সে আসিয়া উপস্থিত; অথচ তিনি শান্তিহারা ও ভ্রাম্যমাণ। কিন্তু তিনি স্বধর্ম্ম ভিন্ন আর সকলই বলিদান দিতে প্রস্তুত।

ক্রমে বার্ষিক তীর্থ দর্শনের সময় সমুপস্থিত হইল। দেশ বিদেশীয় তীর্থযাত্রীগণ মক্কায় সমবেত হইতে লাগিল। মহম্মদ গুপ্ত নিবাস-স্থান হইতে বাহির হইলেন। মহম্মদ এক্ষণে আর কিছুই চাহেন না, আরবের কোন নগরে কোন পরাক্রান্ত লোক বা সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্ভয়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চান। তিনি তাহা কোথায় পাইবেন; অন্ধবিশ্বাসী লোকেরা কেনই বা তাঁহাকে সাহায্য করিবে! সংসারী লোক যাহারা ক্ষতিলাভ গণনায় উন্মত্ত, তাহাদের আশ্রয় লাভ ত দূরের কথা। একদিন তিনি মক্কার উত্তরে আল আকাবা শৈলের উপরে প্রচার করিতেছেন, মেদিনাবাসী কয়েকটি তীর্থযাত্রীর শ্রদ্ধা তাঁহার উপর নিপতিত হইল। তৎসময়ে মেদিনার অধিকাংশ লোক য়িহুদীয় ও খৃষ্টীয় ভাবাপন্ন ছিল। ঐ য়িহুদীগণ ঠিক এই সময়ে একজন মেসায়া অর্থাৎ

প্রেরিতের আপেক্ষা করিতে ছিল। যখন তাহারা মহম্মদের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ও মতামত শ্রবণ করিল, বলিয়া উঠিল, ইনিই সেই প্রেরিত, যাঁহার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; ইনিই প্রাচীন মত স্থাপনা করিতে আসিয়াছেন। এই বলিয়া তাহারা মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বিশ্বাস ও আগ্রহ দেখিয়া মহম্মদ এই পরাক্রান্ত জাতির সহিত মেদিনায় যাইতে চাহিলেন। কিন্তু অসাইত নামক অন্য এক পরাক্রান্ত জাতির সহিত তাহাদের বিবাদ থাকায় তাহারা মহম্মদকে অপেক্ষা করিতে কহিল। মহম্মদ তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু মুসব ইবন উমির নামক জনৈক সুবিজ্ঞ শিষ্যকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাহাদের সহিত মেদিনায় পাঠাইলেন। এইরূপে মেদিনায় মুসলমান ধর্ম্ম অল্পে অল্পে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রতিমাপূজকগণের নিকট মুসবকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। ক্রমে অসাইতগণের দুই একটি দলপতি মহম্মদধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মক্কা হইতে বিতাড়িত অনেক মুসলমান মেদিনায় আসিয়া ক্রমে ক্রমে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারের ত্রয়োদশবর্ষ আসিয়া উপস্থিত। মেদিনাবাসী নবধর্ম্মদীক্ষিত ৭০জন ব্যক্তি মহম্মদকে মক্কা হইতে আনিবার জন্য মুসবের সহিত চলিল। মক্কায় আসিলে মহম্মদ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহম্মদের পিতৃব্য আলআব্বাস যদিও মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মহম্মদের উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা অগ্রে নিজেদের সামর্থ্য বুঝ, পরে মহম্মদকে মেদিনায় লইয়া যাইও, নচেৎ সমগ্র আরবীয় জাতীর বিরাগ ও শত্রুতা উৎপাদন করিবে এবং আপনাদের বিনাশ টানিয়া আনিবে। তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সকলে সত্যবদ্ধ হইয়া বলিল প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিব, এক ঈশ্বরের সেবা প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে সম্পন্ন করিব, সম্পদে বিপদে মহম্মদকে রক্ষা করিব। তাহারা বলিল আমরা যদি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া বিনষ্ট হই কি ফল পাইব, মহম্মদ উত্তরে বলিলেন "স্বর্গ" তোমাদের পুরস্কার। মহম্মদ তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জনকে প্রধান শিষ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। বোধ হয় ঈশার দৃষ্টান্ত এ সময়ে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

এইরূপে সেই পবিত্র মাস উত্তীর্ণ হইল। যাহারা এই একমাসের জন্য বিবাদ কলহ ভুলিয়াছিল, তাহারা দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত মহম্মদের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। আবু সোফান এই সময়ে মক্কার অধিপতি ছিলেন। এই নবধর্ম্ম বিস্তারে তিনি ভীত হইলেন এবং প্রতীকার চেষ্টায় সকলকে আহ্বান করিলেন। কেহ বলিল মহম্মদকে নির্ব্বাসিত কর, কেহ বলিল তাহাতে কি হইবে, মহম্মদ অন্য সম্প্রদায়ের সম্ভবত মেদিনাবাসীগণের সাহায্য পাইয়া আমাদের উপর প্রতিশোধ লইবে; আবুজান বলিল মহম্মদকে হত্যা করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আইস প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বংশ হইতে এক এক জন অগ্রসর হইয়া পরস্পরে মিলিয়া এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই বলিয়া হত্যামানসে কয়েকজন মহম্মদের আবাস নিকেতনের দিকে চলিল। মহম্মদ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ছিলেন। তাহারা দ্বার ভগ্ন করিয়া দেখিল, আলি রহিয়াছে, মহম্মদ নাই। মহম্মদ সেই রাত্রেই মক্কা

হইতে পলাইলেন, সঙ্গে আবু বেকার। থর পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিতেছেন শুনিলেন শত্রুর পদশব্দ অদূরে। বলিষ্ঠ সাহসী আবুবেকার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; বলিল আমরা দুই জনে, বহু শত্রুর বিরুদ্ধে কি করিব। মহম্মদ বলিলেন দুই জন কেন, আর একজন রহিয়াছেন, ঈশ্বর যে আমাদের সঙ্গে! শত্রুরা আসিল কিন্তু মহম্মদকে খুজিয়া পাইল না। মহম্মদ তিন দিন ঐ গহ্বরের ভিতরে লুকায়িত রহিলেন। চতুর্থ দিবসে উভয়ে সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া মেদিনায় যাইতে লাগিলেন। অধিক দুর যান নাই, ফিরিয়া দেখিলেন যোদ্ধা সোরাকা কয়েকজন অশ্বারোহী লইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। আবু বেকার হতাশ, মহম্মদ তখনও বলিতেছেন ভয় কি ঈশ্বর যে আমাদের সঙ্গে। সোরাকার অশ্ব মহম্মদের সম্মুখে আসিয়াই হটিয়া গেল। সোরাকা অশ্বসহ ভূমিসাৎ হইলেন। এই দুর্দ্দৈবে সোরাকার উৎসাহ ভঙ্গ হইল। মহম্মদ তাহা বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে যাহা বলিলেন, তাহাতে সোরাকার মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি মহম্মদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সঙ্গী সহ ফিরিয়া চলিলেন। মহম্মদ ক্রমে মেদিনা হইতে দুই মাইল দূরে ফলবৃক্ষপূর্ণ স্বাস্থ্যকর কোবায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের উষ্ট্র আর অগ্রসর হইল না। মহম্মদ যেস্থানে অবতরণ করিলেন আল টাট্বা নামক মসজেদ তীর্থযাত্রীগণের নিকট সেস্থান এখনও প্রদর্শন করিতেছে। এইস্থানে মহম্মদ চারি দিন অবস্থান করিয়া বোরাইদা ও তাহার ৭০ জন অনুচরকে দীক্ষিত করিলেন।

মহম্মদের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার শিষ্যগণ সোৎসাহে কোবায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মলিনবস্ত্র ছাড়াইয়া তাঁহাকে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করাইল। মহম্মদ বিশ্রাম ও ভজনার জন্য শুক্রবার নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ দিন প্রাতে প্রার্থনার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। প্রার্থনা ও উপদেশের পরে মহম্মদ উষ্ট্র চড়িয়া মেদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোরাইদা তাঁহার ৭০জন অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদের রক্ষীরূপে চলিল, রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য কেহ বা তালপত্র তাঁহার মস্তকের উপর ধরিল। বোরাইদার উৎসাহবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। পতাকা না হইলে চলিবে না, এই বলিয়া নিজ মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিয়া হস্তস্থিত বল্লমের অগ্রভাগে উহা ঝুলাইয়া দিল। পলাতক মহম্মদ, যাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিবার জন্য মক্কার লোক লালায়িত, আজ সেই ধর্ম্মবীর বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া মেদিনায় প্রবেশ করিলেন। বিশ্বাসী আলি মক্কা হইতে পলাইয়া শত্রুর ভয়ে কেবলমাত্র রাত্রিতে পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে তথায় আসিয়া পৌঁছিল। কয়েক দিন পরে আয়েসা ও মহম্মদের বাটীর অন্যান্য পরিজনবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাই মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়ন বৃত্তান্ত; এবং এই স্মরণীয় ঘটনা হইতেই সাল গণনায় সূত্রপাত। খৃঃ শতাব্দীর সহিত ইহার ৬২২ বৎসর অন্তর।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, ফাল্গুন মাস।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১১৫৩ ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৯৩৸৯
সমষ্টি	...	১৭৪৬৸৵০
ব্যয়	...	১৪৩ ৵৩
স্থিত.	...	১৬০৩৸৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
দুইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১০৩৸৯

১৬০৩৸৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১০১৪৸৶৬

এককালীন দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী

১৲

কালনা ব্রাহ্মসমাজ ৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

১০০৲

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

৫৲

অন্যান্য বাবতে প্রাপ্ত ৩৸৶৬

১০১৪৸৵৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৸০
পুস্তকালয়	...	১৪ ৴৬
যন্ত্রালয়	...	৪৫৸৶০
গচ্ছিত		২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৭॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪৯।৶৩
সমষ্টি	...	১১৫৩ ৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬।৴৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫৶৯
পুস্তকালয়	...	১২৴৩
যন্ত্রালয়	...	৬৭৸৩
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১॥৶৩
সমষ্টি	...	১৪৩ ৴৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৫, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫০৬৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৬০৩৸৯
সমষ্টি	...	২১০৯৸৶০
ব্যয়	...	৪৬৫।৶৩
স্থিত	...	১৬৪৪॥ ৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
দুইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

১৪৪॥৯

১৬৪৪॥৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৪৩॥০

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এক্‌জীকিউটার মহাশয়গণ

৩৪০৲

দানাধারে প্রাপ্ত

৩॥০

৩৪৩॥০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৸০
পুস্তকালয়	...	১০॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৯৯।৴৩
গচ্ছিত	...	১২১৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন	...	১৸৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		২২॥০
সমষ্টি	...	৫০৬ ৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমজ	...	২৯৫ ৴৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৫॥৬
পুস্তকালয়	...	৫৸৶৯
যন্ত্রালয়	...	১১৪৸৩
গচ্ছিত	...	৪৲
সমষ্টি	...	২৬৫।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৬৭১ সংখ্যা | ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০০। ৬ আষাঢ় মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত।

মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই গ্রন্থে একশত-একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের রচিত ভাল ভাল সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্বরলিপি-পদ্ধতি খুব সরল ও সহজ। এমন কি যাঁহাদের একটু স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত স্বরলিপি দেখিয়াই গানগুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন। স্বরলিপি-পুস্তক-মুদ্রাঙ্কন যেরূপ ব্যয়সাধ্য, সে হিসাবে সাধারণের সুবিধার জন্য, ইহার মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ৫৫ নং অপারচিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	(বঙ্গানুবাদ) মূল্য		১৲	মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	„	১৷৷০
উত্তর-চরিত নাটক	ঐ	„	১।০	বেণীসংহার নাটক	ঐ	„	১।৴০
রত্নাবলী নাটক	ঐ	„	৷৷০	চণ্ডকৌশিক	ঐ	„	৷৷০
মালতীমাধব নাটক	ঐ	„	১।৴০	প্রবোধচন্দ্রোদয়	ঐ	„	১৲
মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১৷৷০	বিদ্ধ শালভঞ্জিকা	ঐ	„	৷৷০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১।০	ধনঞ্জয় বিজয়	ঐ	„	।০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	„	৷৷০	কর্পূর মঞ্জরী	ঐ	„	৷৷০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	„	৷৷০	প্রিয়দর্শিকা (নবপ্রকাশিত)	ঐ	„	৷৷০

নূতন পুস্তক।

১। ভারতবর্ষে (ফরাসী পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ... মূল্য ৷৷০

২। ঝাঁশীর রাণী (জীবন-বৃত্তান্ত) ... মূল্য ৷৷০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

একটী বসন্ত-প্রাতের সকুরা-পুষ্প।

সত্যমূলক জাপানী গল্প।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

মূল্য ৷৷০ আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সার সত্যের আলোচনা।

কাণ্ট্‌-ঘরের লোক।

আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে, ভেদজ্ঞান হইতে অভেদ-জ্ঞানে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছি। পথের মাঝে বিশেষ বিশেষ ঘাটি-স্থানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সমুত্থিত রহিয়াছে। সে প্রাচীরগুলার প্রতিষ্ঠাকর্ত্রী হ'চ্চেন ভেদ-বুদ্ধি। সেগুলা ভাঙিয়া-ফেলিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। একটা প্রাচীর হ'চ্চে ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া-তোলা কাল্পনিক প্রভেদ। আমি দেখাইতে চাই—প্রভেদ কেবল উপরে-উপরে, ভিতরে-ভিতরে দুয়ের মধ্যে খুবই মিল রহিয়াছে। দেখাইতে চাই যে, ১ ২ ৩ এবং 1-2-3'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সা-রে-গা মা এবং Do-re-mi-fa'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অনেকটা সেই ধাঁচা'র প্রভেদ। যাঁহারা বলেন যে, "সোপাধিক, "নিরুপাধিক," "আভাসচৈতন্য," "কূটস্থ-চৈতন্য," এরূপ-ধরণের কোনো কথার উল্লেখ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, তাঁহারা যদি একবার একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থখানি প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, Transcendental apperception এর নামই কূটস্থ চৈতন্য; Empirical apperception এর নামই আভাস-চৈতন্য; Transcendent এর নামই নিরু-পাধিক; Immanent এর নামই সোপাধিক। তা ছাড়া, কাণ্টের দর্শনে সোপাধিক এবং নিরুপাধিকের সন্ধিস্থলে বেশীর ভাগ আর-একটি কথা দেখিতে পাই-বেন—সেটি হ'চ্চে Transcendental। Transcendent মুখ্য-রকমের নিরুপাধিক, Transcendental গৌণ রকমের নিরুপাধিক, অর্থাৎ-কিনা—সোপাধিকের কিনারা-ঘ্যাঁসা নিরু-পাধিক।

কাণ্টের জন্য আমার কেন এত মাথা-ব্যথা? অবশ্যই তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে। সে কারণ এই যে, তত্ত্ব-জ্ঞানসম্বন্ধে কাণ্ট্‌ যাহা-যাহা বলিয়াছেন,

তাহার ভিতরে অনেকগুলি খাঁটি-সত্য চাপাচুপি দেওয়া আছে। কান্টের দর্শন-সমুদ্রে ডুব দিয়া সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া আনিয়া যদি দেশীয় পণ্ডিতগণের চক্ষের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, তাহার একটিও নূতন নহে—সমস্তই আমাদের দেশের বহুপুরাতন পৈতৃক-সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় এই যে, কান্টের নিজের তত্ত্বান্বেষণের সেই প্রকৃষ্ট ফলগুলি তাঁহার নিজের ভোগে আসিল না--শুদ্ধকেবল ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের প্রচলিত মতামতের সঙ্গে সেগুলির মিল না-হওয়া-গতিকে। তেলে-জলে কেমন করিয়াই বা মিশ খাইবে। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সার সত্যের দৃঢ় ডাঙাভুমিতে দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কান্ট্ এক পা বাড়াইয়া সার সত্যের ডাঙায় ভর স্থাপন করিয়াছেন, আর, তাঁহার আর-এক পা রহিয়াছে সংশয়ের তরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান পিছনের নৌকায় ভর দিয়া—ইত্যবসরে তিনি তাঁহার চারিদিকের ধর্ম্মযাজকদিগের ভ্রূকুটী-কুটিল মুখভঙ্গী দেখিয়া পিছনের পা ডাঙায় উঠাইতে সাহস পাইলেন না। কান্টের এক পা সংশয় দোলায় দোদুল্যমান—আর-এক পা ধ্রুব সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখিয়া আমার মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কান্ট্ অর্দ্ধ সংশয়বাদী—অর্দ্ধ স্থিরবাদী। তা বই, যাঁহারা বলেন যে, কান্ট্ প্রকৃতপক্ষেই সংশয়বাদী, তাঁহাদের কথায় আমি কোনোক্রমেই সায় দিতে পারি না। তবে, এটা আমি মানি যে, আধুনিক ইউরোপের (বিশেষত ইংলণ্ডের) আর-আর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ কান্টের দর্শনের উপরি-স্তরের তরঙ্গ দোলায় দুলিয়া দুলিয়া বেড়ানো একটা খেলা পাইয়াছেন মন্দ না; তাঁহাদের মস্তিষ্ক-চালনার পক্ষে তাহা একপ্রকার ফুট্বল্ বা লন্-টেনিস্ বা পোলো। এতদ্ব্যতীত, কান্টের দর্শনের অন্তস্তলে যে অগাধ নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জল রহিয়াছে, তাহার তাঁহারা বড় একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। কান্টের এই শ্রেণীর বহির্ভক্ত চেলারা সংশয়বাদের লৌহশৃঙ্খল-কেই আপনাদের কণ্ঠের হার করিয়াছেন, এ কথা খুবই সত্য—কিন্তু সে দোষ কান্টের নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের দেখাদেখি নব্য ভারতবাসীরা তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্বজ্ঞানের পথকে ব্যাঘ্রের মতো ডরাইতে শিখিয়াছেন। ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের সাম্প্রদায়িক স্থূলদৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের পথ যে অধঃপতনের পথ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে—তাহা তো হইবারই কথা। তত্ত্বজ্ঞানের আলোক যদি তাঁহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক কোটরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সাধের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দ্যায়, তবে তাঁহাদের আর থাকিবে কি? কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের তো আর সেরূপ মর্ম্মান্তিক বিরোধ নাই! উল্টা;বরং বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তত্ত্বজ্ঞান। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, অবিদ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল; কেবল তত্ত্বজ্ঞানই পরমপুরুষার্থের সোপান। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা—নব্যভারতের বিদ্বন্মগুলীর মুখে প্রায়শই এইরূপ একটা ইউরোপীয় বাঁধি-গৎ যখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাতে সত্যকে পাওয়া যায় না—লাভের মধ্যে কেবল সংশয়ই সার হয়। যেন—তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যারই নামান্তর। ন্যায়-শাস্ত্রীয় ঢেঁকীর

কচ্‌কচিকেই তাঁহারা জানেন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান। এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, তত্ত্বজ্ঞান ঢেঁকির কচ্‌কচিও নহে, আর, সংশয়ের বিভ্রান্তিও নহে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান সেই ধ্রুবতত্ত্বের জ্ঞান, যাহার সংস্পর্শে —"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি,"—হৃদয়ের গাঁট খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় পাইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে কাণ্ট্ সংশয়বাদীর সর্দ্দার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও কাহারো অবিদিত নাই যে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সংশয়ের দিক্ দিয়াও যা'ন নাই, পরন্তু তাঁহাদের গন্তব্যপথে তাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিপদে অগ্রসর হইয়াছেন; তবুও যে আমি কাণ্ট্‌কে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না কেন, তাহার কারণ ঐ যাহা আমি একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি;—কি? না, কাণ্ট্ নিতান্তই দায়ে পড়িয়া সংশয়বাদে আক্রান্ত হইয়াছেন; তা বই, সংশয়বাদ তাঁহার প্রকৃত মনের কথা নহে। তাঁহার আবিষ্কৃত পথ নিতান্তই একটা নূতন পার্ব্বত্য-পথ, যদিচ তাহা ইউরোপের কাছেই নূতন —ভারতের কাছে বহুপুরাতন; অমন একটা নূতন পথের উচ্চশিখরে দৃঢ়তার সহিত ভর দিয়া দাঁড়ানো প্রথম আবিষ্কর্ত্তার পক্ষে কিরূপ অসমসাহসিক কার্য্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাণ্ট্ যে তাহা করিতে ইতস্তত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমরা একটুও দোষ দিতে পারি না। একা হাতে তিনি যাহা করিয়াছেন—যথেষ্ট করিয়াছেন! তাঁহার সংশয়বাদের জটিল জঙ্গলের মধ্য হইতে প্রকৃত তত্ত্বের আলোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে—ইহা অনেকে হয় তো জানেন না, কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন।

কাণ্টের মর্ম্মস্থানীয় গোড়ার কথা বেশী নহে—দুই-তিনটি। একটি হ'চ্চে—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, কি? না,—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind—সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা, ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। কাণ্টের এ কথাটি বড্ড একটা নূতন কথা হইত, যদি সাংখ্যদর্শনের গোড়াতেই না থাকিত যে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ। ভাবনা তো ফাঁকা হইবেই;—ভাবনা জোগাইতেছেন কে? না, সংবিৎরূপী বা চৈতন্যরূপী পুরুষ; ইনি যে খঞ্জ অর্থাৎ চলৎশক্তিরহিত। সাক্ষাৎ উপলব্ধি তো অন্ধ হইবেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি জোগাইতেচেন কে? না, প্রকৃতি; ইনি যে অন্ধ। সাংখ্য বলেন যে, পুরুষ খঞ্জ হইয়াও—খঞ্জ নহেন কেবল প্রকৃতির গুণে; প্রকৃতি অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহেন কেবল পুরুষের গুণে। কাণ্ট্ বলেন, ভবনা ফাঁকা হইয়াও—ফাঁকা নহে কেবল সাক্ষাৎ উপলব্ধির গুণে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ হইয়াও —অন্ধ নহে কেবল ভাবনার গুণে।

কাণ্টের আর-একটি গোড়ার কথা হচ্চে—Synthetic unity of apperception—সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। কাণ্ট্ বলেন— The synthetic unity of cousciousness is an objective condition of all knowledge ;a condition, not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to qecome an object for me.

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ঘটিত-(অর্থাৎ বস্তুঘটিত)-মূল-নিবন্ধন।

এম্নি-একটা মূল-নিবন্ধন—অর্থাৎ যাহা নহিলে নয় এম্নি-একটা গোড়ার কথা—যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞান-গোচরে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞেয়বস্তুর পক্ষেও তাহা আবশ্যক। কাণ্ট্ এ যাহা বলিয়াছেন, এটা একটা জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বটে, কিন্তু যতটা জটিল মনে হইতেছে, ততটা নহে। উহার মুখ হইতে দার্শনিক ভাষার মুখোস্ খুলিয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা রাক্ষসও নহে, দৈত্যও নহে, অসুরও নহে, পরন্তু উহা আমাদের একটি চিরপরিচিত ঘরের লোক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক্।

লৌকিক-ব্যবহারের পক্ষে এ কথা খুব সত্য যে, আগে কাঁচা-মাল (raw material), পরে তৈয়ারি-জিনিষ (manufactured articles) কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাহাকে আমরা কাঁচা-মাল ঠাওরাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাঁচা-মাল নহে; তাহাও তৈয়ারি-জিনিষ। চর্কাকাটা বুড়ীর নিকটে তুলা কাঁচা-মাল, সূতা তৈয়ারি-জিনিষ; তাঁতির নিকটে সূতা কাঁচা-মাল, বস্ত্র তৈয়ারি-জিনিষ; দর্জ্জির নিকটে বস্ত্র কাঁচা-মাল, পোষাক তৈয়ারি-জিনিষ। তেমনি আবার, ইষ্টকনির্ম্মাতার নিকটে মৃত্তিকা কাঁচা-মাল—ইঁট তৈয়ারি জিনিষ, রাজমজুরের নিকটে ইষ্টক কাঁচা-মাল, দেয়াল তৈয়ারি জিনিষ। প্রকৃতিমাতার কাছে তুলাও তৈয়ারি জিনিষ, মৃত্তিকাও তৈয়ারি-জিনিষ। বস্ত্রবয়ন করিবার পূর্ব্বে যেমন সূত্র সংগ্রহ করা চাই, তেম্নি বৃক্ষ ভাবিবার পূর্ব্বে বৃক্ষ যে কিরূপ, তাহা চক্ষে দেখা চাই; এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, বৃক্ষের মূর্ত্তি যাহা আমরা চক্ষে দেখি, তাহা কাঁচা-মাল এবং বৃক্ষের ভাব যাহা আমরা মনে ভাবি, তাহা তৈয়ারি-জিনিষ। এই গেল একদিকের কথা; আর-এক দিকের কথা এই যে, বস্ত্রই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—সুতাও তৈয়ারি-জিনিষ। সুতাই যে কেবল তৈয়ারি জিনিষ তাহা নহে—তুলাও তৈয়ারি জিনিষ। মনে ভাবা বৃক্ষই যে তৈয়ারি জিনিষ তাহা নহে—চক্ষে-দেখা বৃক্ষও তৈয়ারি জিনিষ। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনে-ভাবা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্তা আমরা আপনারা; চক্ষে-দেখা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্রী হ'চ্চেন প্রকৃতি। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চক্ষে দেখা বৃক্ষই হো'ক আর মনে-ভাবা বৃক্ষই হো'ক্, তাহা গড়িয়া তুলিবার মূল প্রকরণ-পদ্ধতি একইপ্রকার—সে প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে সংযোজনা synthesis। শাখা পত্র-ফল ফুলের সংযোজনা ব্যতিরেকে মনে-ভাবা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না—চক্ষে-দেখা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। গঠনকার্য্যের মূল প্রকরণ-পদ্ধতি উভয়ই সমান—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; এমন জিজ্ঞাস্য এই যে, গঠন কার্য্যের নির্ব্বাহকর্ত্তা কি দুই স্থলে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা দুই স্থলেই একই অভিন্ন ব্যক্তি। এক ব্যক্তিকে আমি ইষ্টক তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি, আর এক ব্যক্তিকে থাম তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি; তাই আমি বলি যে, ইষ্টকের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র, আর, স্তম্ভের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি-মাতাকে আমি বৃক্ষ তৈয়ারি করিতে দেখি নাই; অথচ যখনই আমি বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই একেবারেই একটা তৈয়ারি বৃক্ষ আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। ইহাতে দর্শকের মনোমধ্যে এইরূপ একটা সন্দেহ

হইতে পারে যে, তবে বুঝি প্রকৃতিমাতা বাহিরে বসিয়া কার্য্য করেন না; তবে বুঝি তিনি প্রতিজনের অন্তরের অন্তঃপুরে বসিয়া কার্য্য করেন? নহিলে তাঁহাকে কেহ চক্ষে দেখিতে না পায় কেন? তবে কি আমার অন্তরে দুই ব্যক্তি একত্রে যুগলে-বাঁধা থাকিয়া—এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের দৃশ্য-মূর্ত্তি, আর-এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের ভাব-মূর্ত্তি? রূপকচ্ছলে বলিতে-চাও বলো দুই ব্যক্তি। পরন্তু কাণ্ট্‌ ও-জায়গায় বলেন একই জ্ঞানের দুই পৃষ্ঠ। এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে আভাসচৈতন্য Emperical consciousness আর এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে কূটস্থচৈতন্য Transcendental consciousness; তাহার মধ্যে আভাস-চৈতন্য আহঙ্কারিক subjective অর্থাৎ ব্যক্তি-গত; কূটস্থচৈতন্য objective বস্তুগত অর্থাৎ সর্ব্বগত। তার সাক্ষী—কাণ্ট্‌ বলিয়াছেন, The synthetic unity cf apperception is an 'objective' condition of all knowlege "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বস্তু ঘটিতমূল-নিবন্ধন।" এই কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরে বলিয়াছেন যে, a condition not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me. "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য জ্ঞানের এম্নি-একটা মূল-নিবন্ধন যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানগোচরে উপনীত হইবার জন্য তাহা জ্ঞেয় বস্তুর পক্ষেও আবশ্যক।" মোটামুটি সহজ ভাষায় বলিলাম জ্ঞেয়-বস্তু—কিন্তু কাণ্টের চুল-চেরা ভাষায় জ্ঞেয়-বস্তু হ'চ্চে Intuition অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়; যেমন—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বৃক্ষ। কাণ্টের কথার মর্ম্ম-নিহিত তাৎপর্য্য এই যে, সেই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বৃক্ষমূর্ত্তি, যাহাকে আমরা সচরাচর বলি প্রকৃতির স্বহস্তবিরচিত, তাহাতেও সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যের কার্য্যকারিতা রহিয়াছে। একটা তৈয়ারি বৃক্ষ যখন আমাদের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখন, তাহা সেই সাংবিত ঐক্যের যোগসূত্রে বাঁধা হইয়াই আমাদের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। কাণ্টের এই দুরূহ কথাটা খুব সহজ ভাষায় মোটামুটি বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে এইরূপে:—একই অভিন্ন ব্যক্তি দর্শন এবং চিন্তন, উভয় কার্য্যেরই কর্ত্তা। বৃক্ষ দেখিবার সময় যে ব্যক্তি চাক্ষুষ আলোকে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের মূর্ত্তি সংগঠন করে, বৃক্ষ ভাবিবার সময়েও সেই ব্যক্তি মানসিক আলোকে শাখাপত্র ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের ভাব সংগঠন করে। সংযোজনা-কার্য্য দুইস্থলেই সমান চলে; ভাবনা-কার্য্যেও যেমন চলে—দর্শন কার্য্যেও তেমনি চলে। কাজেই বলিতে হয় যে, সংযোজনা-কার্য্য synthesis জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। সংযোজনা মস্ত একটা টানা-জাল। সেই টানা-জালে কালের এক মুহূর্ত্তের সঙ্গে আর-আর মুহূর্ত্তের এবং আকাশের এক দেশের সঙ্গে আর-আর দেশের যোগ বাঁধা হইয়া পড়িতেছে নিত্য-নিয়ত। সেই মহাবিস্তীর্ণ যোগরশ্মিজালের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে সাংবিত ঐক্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল। আর, সাংবিত ঐক্য ঐ মহাবিস্তীর্ণ যোগজালের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কাণ্ট্‌ সাংবিত ঐক্যের বিশেষণ দিয়াছেন যোগাত্মক। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোজনা-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবিতের ঐক্য আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচর হয়। গায়ক যখন স্বরপরম্পরা

সংযোজনা করিয়া গান করে, তখনই আপনাকে গায়করূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। আমরা যখন আলোকরশ্মিযোগে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষ দর্শন করি, তখনই আমরা বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা মনোমধ্যে শাখাপত্র ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের একটা ভাব দাঁড় করাইতে চেষ্টা করি, তখন আমরা বৃক্ষের মন্তারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা বৃক্ষের দৃশ্যমূর্ত্তিতে বৃক্ষের মানসিক ভাব সংযোজিত করিয়া বা অধ্যারোপিত করিয়া উভয়ের ঐক্য অবধারণ করি, তখন আমরা আপনাকে বোদ্ধারূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে যখন আমরা সংযোজনার জাল গুটাইয়া-লইয়া ও-সকল কিছুই করি না—তখন আমরা আপনাকে কোনো কিছু-রূপেই উপলব্ধি করি না। প্রথমে কাণ্ট্ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভাবনার মধ্যে প্রভেদের সূচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা—ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। তাহার পরে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি দুইকে সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অভেদ-জ্ঞানের গোড়া'র কথাটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাণ্টের ভিতরকার কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহাতে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরস্পরের সহিত একীভূত। অর্থাৎ যেখানে ভাবনাও যা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধিও তা, একই। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের নাম দিয়াছেন কাণ্ট্ Intellectual intuition।

কাণ্ট্ বলেন And yet this (অর্থাৎ সাংবিত সংযোজনা) need not be a principle for every possible understanding, but only for that which gives nothing manifold through its pure apperception in the representation, I am. An understanding which through its self-consciousness could give the manifold of intuition, and by whose representation the object of that representation should at the same time exist, would not require a special act of the synthesis of the manifold for the unity of its consciousness, while the human understanding which possesses the power of thought only, but not of intuition, requires such an act.

ইহার তাৎপর্য্যার্থঃ—

"আমি সব জ্ঞানের সম্বন্ধে বলিতেছি না—কেবল আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধেই বলিতেছি যে, সংযোজনা জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। আমাদের জ্ঞানে আমি আছি বলিলেই কিছু আর সব আছে বুঝায় না।' পরন্তু যে জ্ঞান এরূপ যে, তাহার আত্মসত্তাতেই সর্ব্বসত্তা সিদ্ধ হয়, সে জ্ঞানের সাংবিত ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজনারূপিণী স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, মনুষ্যের বুদ্ধিতে কেবল ভাবনা-প্রবর্ত্তনেরই শক্তি আছে, তা বই, সাক্ষাৎ উপলব্ধি-সংঘটনের শক্তি নাই; তাই মনুষ্যবুদ্ধির সাংবিত ঐক্যের জন্য সাক্ষাৎ উপলব্ধিগোচর বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজন-ক্রিয়া নিতান্তই আবশ্যক।" কাণ্টের এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভাবনাশক্তি আমাদের নিজের শক্তি; পরন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটাইবার শক্তি আমাদের নিজের নহে;—এ শক্তি ঐশী শক্তি। এইজন্য, সেই ঐশী শক্তির প্রসাদলব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি গোচর বিষয়সকল আত্মসাৎ করিবার জন্য, সংযোজন-ক্রিয়ার বা ভাবনার পরিচালনা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক। পক্ষান্তরে, উপনিষদে আছে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"

—ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐশ্বরিক জ্ঞান সংযোজনারূপিণী প্রক্রিয়ার বশবর্ত্তী নহে। কাণ্টের এই জায়গা'র কথাটি বিশেষমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; অতএব বারান্তরে তাহার যথাবিহিত চেষ্টা দেখা যাইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

(প্রথম উপদেশের অনুবৃত্তি)

যেমন আমরা বিশ্বাস করি, বস্তুমাত্রই একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ আমরা বিশ্বাস করি, ঘটনামাত্রই কোন না-কোন সময়ে সংঘটিত হয়। এমন কোন ঘটনা কি কল্পনা করিতে পার যাহা কোন কালাংশেরই অন্তর্গত নহে? তোমার মানস-চক্ষে, এই কালের স্থায়িত্ব পর-পর প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অবশেষে আকাশের ন্যায় কালকেও অসীম বলিয়া তোমার উপলব্ধি হয়। কালকে যদি তুমি অস্বীকার কর, যে সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্র কালের পরিমাপক, সেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রকেও তোমার অস্বীকার করিতে হয়; যে সকল স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর মানবজীবন বিশ্রাম করে, সেই সকল বিশ্বাসকেও তোমার উচ্ছেদ করিতে হয়। যে দুইটি মূলতত্ত্ব বাহ্যজগৎ-জ্ঞানের অন্তর্নিহিত ও সহজাত সেই আকাশ ও কালের ধারণা কেবল ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

তাই, পরীক্ষাবাদীরাও বেশ বুঝিয়াছেন, —এরূপ কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব আছে যাহা অপরিহার্য্য, অথচ পরীক্ষাবাদ যাহার ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ।

এইখানে থামা যাক্ঃ—আমরা তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু নির্ণয় করিয়াছি, হয় তাহা আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছে, নয় আমরা এইটুকু নিশ্চিত জানিয়াছি—মানব চিত্তে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব বস্তুতই মুদ্রিত রহিয়াছে যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী।

কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সত্তা সপ্রমাণ ও সমর্থন করিয়া আমরা এক্ষণে এই-প্রকৃতির মূলতত্ত্ব মানবজ্ঞানের সকল বিভাগেই অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, এবং খুব যথাযথ ভাবে এই মূলতত্ত্বগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেও চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু কতকগুলি প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের যে শিক্ষালাভ হইয়াছে—তাহাতে ভয় হয় পাছে বহুমূল্য তত্ত্বের সহিত কতকগুলি অপ্রমাণিত অনুমান মিশ্রিত করিয়া সেই তত্ত্বগুলির মর্য্যাদা লাঘব করি। ঐরূপ শ্রেণীবন্ধনে তত্ত্ববিদ্যা আপাততঃ খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবে বটে, কিন্তু প্রাজ্ঞ-জনের চক্ষে উহার প্রামাণিকতা কমিয়া যাইবে। ক্যাণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, গত বৎসরে আমরাও তোমাদের সমক্ষে, মূলতত্ত্বগুলির শ্রেণীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; যে সকল মূলতত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি এবং যে সকল ধারণা সেই সকল মূলতত্ত্বের অনুবন্ধী—সেই সকল মূলতত্ত্ব ও ধারণার সংখ্যা কমাইতেও চেষ্টা পাইয়াছিলাম। এই কার্য্যের গুরুত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলেও, এস্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। একটা মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী-প্রতিভার সহিত যে মত-

বাদ মিশ খায়, সেই মতবাদকে যাহাতে সুদৃঢ় ও সারবান্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহাই আমাদের চেষ্টা। এইহেতু, যাহা কিছু ব্যক্তিগত ও অনিশ্চয়াত্মক তাহা আমরা পরিহার করিব। কনিংস্বর্গের দার্শনিক ক্যাণ্ট, সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব-সমূহের যে শ্রেণী-বিন্যাস করিয়াছেন তাহার পরীক্ষা ও বিচার করিতে আমরা চাহি না; আমরা এই সকল মূলতত্ত্বের প্রকৃতির অভ্যন্তরে আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চাহি; আমাদের কোন্ বৃত্তি এই সকল মূলতত্ত্বকে প্রকাশ করে—কোন্ বৃত্তির সহিত উহাদের যোগ আছে তাহাই তোমাদের নিকট দেখাইতে চাহি।

এই মূলতত্ত্বগুলির বিশেষত্ব এই,—চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি, এই মূলতত্ত্বগুলি আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা উহাদিগকে উৎপাদন করিতে পারি না—আমরা উহাদের জন্মদাতা নহি। আমরা উহাদিগকে মনে ধারণা করি, কার্য্যে প্রয়োগ করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। আমাদের সাক্ষীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। যেমন আমি কোন বস্তু নিজ বলে সঞ্চালিত করিয়া বুঝিতে পারি—আমিই ঐ গতিক্রিয়ার কারণ, সেইরূপ, জ্যামিতিক লক্ষণাগুলির কারণ আমি স্বয়ং—এইরূপ কি আমার প্রতীতি হয়? যদি আমরাই এই লক্ষণাগুলি প্রণয়ন করিয়া থাকি, তাহা হইলে উহা ত আমাদের নিজস্ব ধন। তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে ভাঙ্গিতে পারি, বিকৃত করিতে পারি, পরিবর্ত্তন করিতে পারি, এমন কি, উচ্ছেদ করিতেও পারি। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহা পারি না। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা উহাদের উৎপাদক নহি। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে,—যে-ইন্দ্রিয়বোধ পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব কখনই উৎপন্ন অথবা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এই অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই:—মূলতত্ত্বগুলি আমাতে আছে কিন্তু আমার নহে। আর যেমন, ইন্দ্রিয়বোধ বাহ্যজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ আর কোন চিত্তবৃত্তি, সেই মূলতত্ত্ব-সমূহের সহিত আমাদের যোগ নিবদ্ধ করে;—সেই সকল মূলতত্ত্ব যাহা বাহ্যজগতের উপরেও নির্ভর করে না—আমার নিজের উপরেও নির্ভর করে না। সেই চিত্তবৃত্তিটি কি?—না, প্রজ্ঞা।

মানব-অন্তঃকরণে তিনটি সাধারণ বৃত্তি আছে, যাহা পরস্পর বিমিশ্রিত—যাহা প্রায় একসঙ্গেই কাজ করে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য, উহাদিগকে আমরা বিশ্লেষণ করি, বিভাগ করি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা জানি,—উহাদের ক্রিয়া একসঙ্গেই সম্পাদিত হয়—উহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ-বন্ধন আছে—অবিভাজ্য একতা আছে। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রথম ধর্ত্তব্য—কর্তৃশক্তি;—ইচ্ছাধীন ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনী শক্তি। ইহার দ্বারাই মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে প্রকটিত হয়; এবং ইহার অভাবে, অন্যান্য বৃত্তিগুলি না-থাকার সামিল হইয়া পড়ে; কেন না, তাহা হইলে, আমাদের নিজত্বই থাকে না। যে মুহূর্ত্তে, আমাতে কোন ইন্দ্রিয়বোধ প্রকাশ পায়, সেই মুহূর্ত্তের অবস্থাটি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে—একটু মনঃসংযোগ না করিলে, কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মনের এই কর্তৃশক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি যে মুহূর্ত্তে রহিত

হয়-সেই মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অবসান হয়। সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছিত অবস্থার কথা আমাদের স্মরণ হয় না; কারণ, সে সময়ে আমাদের কর্তৃশক্তি স্তম্ভিত থাকে,—কাজে-কাজেই আত্মচৈতন্য অন্তর্হিত হয়—কাজে-কাজেই স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। এমন কি, অনেক সময়ে, রিপুর আবেগ বশতঃ, যখন আমাদের স্বাধীনতা চলিয়া যায়,—যখন আমাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না,—সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়—তখন আমরা কি করিয়াছি, কিছুই জানিতে পারি না। এই কর্তৃশক্তি—এই স্বাধীনতা থাকাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই স্বাধীনতা থাকা প্রযুক্তই, মনুষ্য আপনাকে সংযত করে, নিয়মিত করে, শাসিত করে। এই স্বাধীনতা—এই কর্তৃশক্তির অভাবে, মানুষ আবার প্রকৃতির বশীভূত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই অংশটি যেরূপ শ্লাঘ্য ও সুন্দর, এরূপ আর কোন অংশই নহে। কিন্তু যেমন একদিকে, আমাদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে, তেমনি আবার অন্য বিষয়ে আমরা পরাধীন,—আমরা বাহ্য জগতের নিয়মাধীন। এস্থলে আমি কর্ত্তা নই—আমি ভোক্তা। আমি আমার সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নই—আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করি মাত্র। আমার অন্তরে, কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা, কতকগুলি বাসনা, কতকগুলি প্রবৃত্তি নিয়ত উত্থিত হইতেছে বলিয়া আমি অনুভব করি, কিন্তু আমি উহাদের জন্মদাতা নহি। আমি ইচ্ছা না করিলেও, উহারা স্বতঃ উত্থিত হইয়া আমার জীবনকে সুখ-দুঃখে পূর্ণ করে।

ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ—এই দুইটি ছাড়া আমাদের আর একটি বৃত্তি আছে;—সেটি, জ্ঞানবৃত্তি—বুদ্ধিবৃত্তি—প্রজ্ঞা। (যে নামেই অভিহিত হউক না, তাহাতে কিছু যায়-আসে না) এই বৃত্তির দ্বারা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যকে উপলব্ধি করি;—যাহা প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে নিহিত বলিয়া অনুমিত হয়—যাহা জ্ঞানক্রিয়ার সহিত অনুবদ্ধ—যাহা ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব ও ইচ্ছা-সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র—সেই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বগুলিকেও আমরা এই বৃত্তির দ্বারা উপলব্ধি করি। *

ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ ও প্রজ্ঞা—এই তিন বৃত্তি এক্ষণে নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইয়াছে। যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি চালিত হয়—সেই মূলতত্ত্বের সত্তা, এবং ইন্দ্রিয়বোধ ও ইচ্ছাশক্তির সত্তা—এই তিনেরই সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষীচৈতন্য সাক্ষ্য দেয়। আমাদের পর্য্যবেক্ষার মধ্যে যাহা কিছু আসিয়া পড়ে, তৎসমস্তই আমরা বাস্তবিক বলিয়া অভিহিত করি। আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি সেই সুখ দুঃখের ভোগও বাস্তবিক, কেন না উহা আমাদের আত্মচৈতন্যের বিষয়ীভূত। আমাদের ইচ্ছাশক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অথবা প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও এবং যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা এই প্রজ্ঞা প্রকাশিত সেই মূলতত্ত্বের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। অতএব আমরা এইরূপ প্রতিপাদন করিতে পারি যে, সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সত্তা, আমাদের পর্য্যবেক্ষার উপর বিশ্রাম করে এবং যে পর্য্যবেক্ষণ আরো অব্যবহিত ও সুনিশ্চিত সেই সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্যের উপর বিশ্রাম করে।

---

* আমার প্রদত্ত এই সকল উপদেশের পূর্ব্বে মানব-চিত্তবৃত্তির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। আজ-কাল এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ অবলম্বিত হইয়াছে। আজ-কাল এই ভিত্তির উপরেই আধুনিক অধ্যাত্ম বিদ্যা স্থাপিত।

কিন্তু আমাদের সাক্ষীচৈতন্য সাক্ষী ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে জিনিসটি যাহা তাহাই সাক্ষীচৈতন্য প্রকাশ করে মাত্র— তাহা সৃষ্টি করে না। এই-এই গতিক্রিয়া তুমি উৎপাদন করিয়াছ, এই-এই ইন্দ্রিয়-বোধ তুমি অনুভব করিয়াছ,—ইহা আত্ম-চৈতন্য কিংবা সাক্ষীচৈতন্য তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই যে তাহা সত্য এরূপ নহে! অথবা, "এই-এই তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য"—এই কথা সাক্ষী-চৈতন্য বলিতেছে বলিয়াই যে উহা সত্য তাহা নহে। আসল কথা, উহাদের বাস্ত-বিক সত্তা আছে বলিয়াই, উহা অস্বীকার করা প্রজ্ঞার পক্ষে অসম্ভব। প্রজ্ঞা নিহিত সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সাহায্যে প্রজ্ঞা যে সকল সত্য প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত নিরপেক্ষ সত্য—আত্যন্তিক সত্য। প্রজ্ঞা উহাদিগকে সৃষ্টি করে না—উহাদি-গকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রজ্ঞা স্বকীয় মূলতত্ত্বের বিচারকর্ত্তা নহে; প্রজ্ঞা উহাদের সম্বন্ধে কোন হিসাব দিতে পারে না। কারণ, প্রজ্ঞা উহাদের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞা উহাদেরি নিয়মা-ধীন। তা-ছাড়া, সাক্ষীচৈতন্য প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করে না, উহার মূলতত্ত্বগুলিকেও উৎপাদন করে না। কারণ, সাক্ষীচৈতন্যের আর কোন কাজ নাই—আর কোন ক্ষমতা নাই—উহা প্রজ্ঞার এক প্রকার দর্পণ বই আর কিছুই নহে। অতএব নিরপেক্ষ সত্য-গুলি প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা ও সাক্ষীচৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র; প্রত্যক্ষপরীক্ষা ও আত্ম-চৈতন্য উহাদের সত্তা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় মাত্র। একপক্ষে, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাতেই সত্য সকল প্রকাশিত হয়, আবার পক্ষান্তরে কোন প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা দ্বারাই উহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা ও প্রজ্ঞার মধ্যে এইরূপ মিলও আছে, প্রভেদও আছে। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার সাহা-য্যেই আমরা এমন কিছু প্রাপ্ত হই যাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে।

অতএব দেখ, আমরা যে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি, উহা কতকগুলি আনু-মানিক সিদ্ধান্তের উপর, অথবা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছি, সেই সব তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের সেই পর্য্যবেক্ষা জ্ঞানের উৎ-কৃষ্ট অংশেই প্রযুক্ত। এইখানেই আমরা অন্য যাত্রী হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছি। এই পথের ভিত্তিটি যেমন সুদৃঢ়, তেমনি উন্নত।

আমরা যে নবপন্থাটি আবিষ্কার করি-য়াছি, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। উহাতেই আমরা অবিচলিত ভাবে আবদ্ধ থাকিব। এই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বসমূহ বিভিন্নদিক্ দিয়া বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে; এই সকল মূল তত্ত্ব হইতে যে সকল মহা-মহা সমস্যা সমুত্থিত হয়, তাহাও আলোচনা করা যাইতে পারে;—এই পর্য্যালোচনার উপরেই সমগ্র দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই পর্য্যালোচনার দ্বারাই, দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণতা, পরিমাণ, ও বিভাগ সম্পাদিত হয়। মানব-চিত্ত ও তৎ-সংক্রান্ত নিয়মের আলোচনাই যদি তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা হয়, তাহা হইলে ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—যে সমস্ত সার্ব্ব-ভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব প্রজ্ঞার উপর কর্ত্তৃত্ব করে, সেই মূলতত্ত্ব-সমূহের আলো-চনাই দর্শনশাস্ত্রের উচ্চতম অংশ। তত্ত্ব-বিদ্যার এই অংশকে, জর্ম্মাণ-দেশে প্রাজ্ঞানিক তত্ত্ববিদ্যা বলে। ইহা পারীক্ষিক তত্ত্ববিদ্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এই অংশকে

আন্বীক্ষিকী-বিদ্যাও (তর্কশাস্ত্র) বর্জ্জন করিতে পারে না। যে প্রণালীতে আমাদের জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই সকল প্রণালীর মূল্য ও বৈধতা পরীক্ষা করাই যখন আন্বীক্ষিকী বিদ্যার কাজ, তখন—যে সকল মূলতত্ত্বের উপর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য ও বৈধতার পরীক্ষা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা কি করিয়া বর্জ্জন করিবে?

এই সকল মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনা হইতেই আমরা ক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্বে উপনীত হই। যদি আমরা এই সকল মূলতত্ত্বের সূত্রস্থান সেই মূলজ্ঞান পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারি—যে মূলজ্ঞানের উপরেই আমাদের জ্ঞানের প্রথম ব্যাখ্যা ও চরম ব্যাখ্যা নির্ভর করে—তবেই দর্শন-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পবিত্র দেব নিকেতনটি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

কোন অবস্থাতেই একথা বলিও না—আমি এই জিনিস্‌টি হারাইয়াছি", বলিও—"আমি প্রত্যর্পণ করিয়াছি"। তোমার ছেলেটি কি মরিয়াছ?—"যাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে"। তোমার পত্নী কি মরিয়াছে?—"প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে"। তোমার সম্পত্তি হইতে তুমি কি বঞ্চিত হইয়াছ?—"তাহাও প্রত্যর্পিত হইয়াছে"। ঋণদাতা কাহার দ্বারা তাঁহার নিজস্ব দাবী করেন—তোমার তাহাতে কি আসে-যায়?

অতএব যতক্ষণ তিনি দ্রব্যটি তোমার নিকট রাখেন, ততক্ষণ তুমি অন্যের সম্পত্তি মনে করিয়া, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। পথিকেরা যেরূপ পান্থশালার ব্যবহার করিয়া থাকে তুমিও সেইরূপ উহার ব্যবহার করিবে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইল জুডিয়ার প্রান্তরে জড়ডন নদীর তীরে জন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার প্রচারের সার কথা অনুতাপ কর স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, Repent ye for the kingdom of God is at hand। তাঁহার পর যখন যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাঁহার মুখে ঐ একই কথা অনুতাপ কর এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর স্বর্গরাজ্য আগত প্রায়। এইরূপে দেখা যায় যুগে যুগে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে অনুতাপ করিতে বলিয়া গিয়াছেন, কেন না ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। ইহাই ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপাদান, ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই কেবল যে ইহার প্রয়োজন তাহা নহে আজীবনই প্রয়োজন। অনুতাপের মূল পাপবোধ, যতদিন না এই পাপবোধ সম্যক রূপে মনুষ্যহৃদয়ে উৎপন্ন হয় ততদিন অনুতাপের চিহ্ন দেখা যায় না এবং পাপ হইতে উন্মুক্ত হইবার চেষ্টাও হয় না। এই পাপবোধ জাগ্রত করিতে হইলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল মনুষ্যের পাপের অভাব নাই, পদে পদেই পাপ দোষ ত্রুটী হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ণতার দিকে ঈশ্বরের দিকে যাইতে হইলে অনুক্ষণই অনুতাপ করিতে হয়, অনুতাপ-অগ্নিই আমাদের পাপমলা সকল ভস্মীভূত করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় আমাদের

অনেকেই অনেক অনুতাপ করিয়াছেন; অনেক গুরুতর পাপ হইতে নিস্তারও পাইয়াছেন কিন্তু এখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে করিয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই, উহাদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করা কোন মতেই উচিত নহে, উহা আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মের পক্ষে বৃহৎ। এই সকল পাপের জন্য আমরা এখন কদাচ অনুতাপ করিয়া থাকি। এ কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা প্রত্যেকেই অন্তর পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারি। এই যে ব্রাহ্ম সমাজের মুখ সেরূপ উজ্জ্বল হইতেছে না কেন? কাহার দোষ? প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা কি তাহার জন্য দায়ী নন? ইহার জন্য প্রত্যেকের প্রগাঢ় অনুতাপের আবশ্যক হইয়াছে, নিজেকে ছাড়িয়া অন্যের উপর দোষ চাপাইলে চলিবে না। আমাদের এই দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া বাহিরের লোক যদি আমাদিগকে ধিক্কার দেয় দিউক। সেই ধিক্কারই যেন আমাদের নিদ্রিত হৃদয়কে জাগ্রত করে, ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়। এতদিন আমরা বাহিরের লোকের জন্য প্রচার করিয়া আসিতেছি এখন আমাদের নিজের মধ্যে প্রচারের আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের মূলধন সকল প্রায় ক্ষয় হইয়াছে, যদি গৃহে ধন না থাকে তবে কি দান করিব? আমরা কোথায় যাইতেছি একবার চিন্তা করিয়া দেখি। বাস্তবিক আমরা ঠিক পথে যাইতেছি, না পথভ্রষ্ট হইয়াছি? ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য কি তাহা যে কোন ব্রাহ্ম জানেন না সে কথা বলিতে আমরা সাহস করি না। এ সম্বন্ধে অনেকেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা অনেকেই বড় বড় কথা শিখিয়াছি কিন্তু কয়টা কথা জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি, কয়টা কথায় জীবনে সুফল ফলিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন এবং কার্য্য করিয়া চিন্তা করেন। আমরা গম্যপথে কতদূর অগ্রসর হইতেছি তাহা সর্ব্বদাই দেখা প্রয়োজন। আমরা কি দিন দিন ধর্ম্মজীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছি, না বহুদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি। এবং যাহা পাইয়াছি তাহা যথেষ্ট মনে করিয়া ঘোর আধ্যাত্মিক নিদ্রায় মগ্ন হইতেছি। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের হৃদয়স্থিত আদর্শ পরিবারের অনুরূপ হইতেছে? ব্রাহ্মসমাজ কি জগতের উন্নত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে? যাঁহারা হুজুগে পড়িয়া অথবা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিম্বা যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন কিন্তু পরে কোন কারণে ইহার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রকৃত কল্যাণার্থী, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনার ও অপরের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা ধর্ম্মপথে দিন দিন অগ্রসর হইতে চাহেন, ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ নিতান্ত আকুল তাহারা কখন এই সকল কথায় উপেক্ষা করিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে আমাদের অগ্রণীরা এই সকল বিষয় আলাপ ও আলোচনা করেন তাহাতে দুই দশজন যোগ দেন, ফলে কিছু হয় না।

এখন দেখা যাউক আমরা কি চাহি? যাহা চাই তাহা পাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করি এবং তাহা পাই কি না? আমরা

চাই ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান হইতে; চাই ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে; চাই আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে; চাই জ্ঞান প্রেম পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে; চাই জগতে প্রেম পুণ্য শান্তি বিস্তার করিতে; চাই নরনারীকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাল বাসিতে; আমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। বাস্তবিক প্রাণের সহিত এই সকল চাই আর না চাই অন্তত মুখে বলি যে আমরা এই সকল চাই। আমরা এই সকল পাইবার জন্য বাস্তবিক কোন চেষ্টা করি কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যদি চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে আজ আর এ কথা শুনিতে হইত না, "ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, প্রাণের গভীর পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না" তাহা হইলে আজ বহু দিনের পুরাতন ব্রাহ্ম কেন ক্ষোভ করিবেন "ব্রাহ্মসমাজে যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইল না—ব্রাহ্মসমাজে যে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব এক সময়ে দেখিয়াছিলাম তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে!" তাহা হইলে আজ এতলোক ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধন অবলম্বন করিবে কেন? আজকাল যে দিকে চাই সবই কেমন শুষ্ক শুষ্ক বোধ হয়। ভাই ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তাহাদের মুখ শুষ্ক মলিন কথা কর্কশ বা মৌখিক মিষ্টতার আবরণে আবৃত; ব্যবহার উদাসীনের মত অথবা বাহ্য সভ্যতার আড়ম্বরে পূর্ণ, যে যার নিজের নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, কেহ যেন কাহার নয়, কাহারও প্রাণে একটু প্রেম আছে বলিয়া মনে হয় না। নিজেকে বাদ দিয়া বলিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন। স্মরণ আছে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রথম অবস্থায় দুক্রোশ অন্তরে কোথায় একটী ব্রাহ্ম আছে তাহা খুজিয়া বাহির করিতাম এবং অন্যের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা ৫।৭ ক্রোশ দূরে স্থিত ব্রাহ্মের সহিত সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। আর এখন বলিতে লজ্জা হয়, বলিব না। এখন কি আর সেই পুরাতন সঙ্গীত গাইতে সাহস হয় যাহা এক সময়ে কত আনন্দের সহিত আশাপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতাম—

"পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন;
যার তরে আশা করে,
আমরা করি এত আয়োজন।
দেখে যার পূর্ব্বভাস মনেতে বাড়ে উল্লাস
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ বিচিত্র শোভন;
নরনারী সবে মিলে ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে
ডাকে তোমায় পিতা বলে,
আনন্দে হয়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে
প্রেম-পরিবারের সুখ করে আস্বাদন;
সেই ত স্বর্গের শোভা,
ভক্তজন মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা, দেখি নাই কেহ কখন।"

আক্ষেপের বিষয় যে আমরা নিজ নিজ অবস্থায় যেন বেশ সন্তুষ্ট আছি। যেন এতদিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আমরা যথেষ্ট সাধুতা ও ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছি। ধর্ম্ম জিনিষটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছি। ধর্ম্মসম্বন্ধে আর আমাদের ভাবিবার ও করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমাদের এই আত্মাভিমান যদি পরীক্ষার অগ্নিতে নিক্ষেপ করি তাহা হইলে দেখিতে পাই এ সকল অভিমানই বৃথা তুঁষ ও খোসা। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে দৃঢ়তা, যাহা লাভের জন্য এই বেদী

হইতে আচার্য্যেরা পুনঃপুনঃ বাক্যব্যয় করিয়াছেন তাহা কি আমরা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের জ্ঞান চর্চ্চা কি বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? এ বিষয়ের উত্তর প্রত্যেকে নিজে নিজেই দিন। সংবাদপত্রের Telegram যুদ্ধের খবর Calcutta Column এইরূপ দু-চারটী ছোট ছোট বিষয় দেখিলাম ত যথেষ্ট হইল। কোন গুরুতর বিষয় অধ্যয়ন করা বা তাহাতে মনোনিবেশ করা আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া আসিতেছে। আমরা উপাসনার প্রারম্ভে বলি "সত্যং জ্ঞানং" কিন্তু সত্য ও জ্ঞানলাভের জন্য কি কোন চেষ্টা করি? আজ কাল জীবনসংগ্রামের দিনে শরীররক্ষার জন্য আমাদের এতই ব্যস্ত থাকিতে হয় যে অন্য কিছুরই জন্য সময় হয় না। আমরা বলি সংসারই ধর্ম্মসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান, কিন্তু সংসারে তাহা দেখাইতে পারিলাম কৈ? প্রেমের বিশালতার স্থানে সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে। এমন এক দিন ছিল যে দিন সমস্ত জগতের জন্য ব্রাহ্মের প্রাণ কাঁদিয়াছে, বিশ্বপ্রেমের পূর্ব্বাভাস আমরা আস্বাদ করিয়াছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আজ নিজেদের মধ্যে প্রেমের অভাব দেখিতে পাই। ভক্তিও সেইরূপ ক্ষীণ হইয়াছে, আমরা কি আমাদের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত? খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে শত শত লোক বিশ্বাসের জন্য—ধর্ম্মের জন্য ও সেবার জন্য অকুতোভয়ে শান্ত চিত্তে ও আহ্লাদের সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যেও এক সময়ে ব্রাহ্মদের স্বার্থত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহারা অল্প উৎপীড়ন সহ্য করেন নাই, কত দিন অনশনে কাটাইয়াছেন এমন কি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মৃত্তিকাও ভক্ষণ করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে ইঁহারা যে বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন তাহা মনে করি না। আজ কি আমরা তাঁহাদের সেই উচ্চ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিব না? তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন আজও জীবিত আছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন কেন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।

প্রাচীন মহর্ষিগণের বিষয় একবার স্মরণ করি। তাঁহাদের মত কয়জন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহাকে পাইয়াছি আমরা কয়জন বলিতে পারি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, আমি ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছি এবং তাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহার দৃষ্টান্ত কি আমরা অনুসরণ করিব না? আমরা কে কয় ঘণ্টা আত্মার গভীর স্থানে সেই আত্মার পরমাত্মাকে লইয়া বসিতে পারি ও অনিমেষ নয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। ঐ যে সঙ্গীত করি "সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার। তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।" কিন্তু বাস্তবিক কি তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়াছি? এই যে মন্দিরের উপাসনা ইহা আমাদের প্রেমের অভাবে শুষ্ক মলিন ও ক্ষীণ হইয়াছে, বাক্যের পর বাক্য রচনা করি, কাহারও মন আকৃষ্ট হয় না, তাই মনে হয় এই সাপ্তাহিক উপাসনার সময়টা কিছু হ্রাস করিলে ভাল হয়। নিজের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি প্রাণটা এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে আর কিছুতেই জাগে না। কাজ করিতে হয় তাই করি, সভাসমিতিতে যাই কিন্তু কৈ সে উৎসাহ কৈ? হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে না পাইলে ধর্ম্মসাধন বল, সাধুতা বল, সৎকার্য্য বল সকলই বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া শাখায়

জল সিঞ্চনের ন্যায় নিষ্ফল। ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা ইহাই ধর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সৎকার্য্য করিতে গিয়া নিজের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি। আপনাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই শৃঙ্খল ভগ্ন না হইলে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইব না। তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন এই নির্জীবতা এই শুষ্কতা এই সকল বহু দিনের সঞ্চিত পাপ দূর হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত সার ও সত্য পদার্থ লইয়া পুষ্ট হইবে, জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্বাস ভক্তি ও পুণ্য দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মুখোজ্জ্বল হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি, কার্য্যে যেন ইহা পরিণত করিতে পারি। আজ আমরা ঈশ্বরের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করি তিনি আমাদের দুর্দ্দশা দূর করিবেন।

—— •

ছান্দোগ্যোপনিষদ।

পূ। যদিও মৃত্তিকা থেকে ঘট হইতে দেখা যায় তথাপি মৃত্তিকা হইতে অন্য মৃত্তিকা, ঘট হইতে অন্য ঘট তো উৎপন্ন হয় না। তবেই সৎ হইতে অন্য সৎ বস্তুর উৎপত্তি একথাটা টেঁকিল না।

উ। হাঁ সত্য, সৎবস্তু হইতে আর একটী সদ্বস্তু উৎপন্ন হয় না; তবে কি জান, সৎই সংস্থানভেদে অবস্থান করে। যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতে ঘট কপালাদি হয় ইহাই সৎ বস্তুর সংস্থানভেদে অবস্থান।

পূ। ভাল, তাই যদি হয়, সৎই যদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হন তাহা হইলে 'প্রাগুৎপত্তেরিদমাসীৎ' উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎ ছিল, কার্য্যের পক্ষে এ কথার তো সার্থকতা থাকে না?

উ। তুমি কি শুন নাই, 'ইদং' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য 'সৎ এব' সৎই ছিল কার্য্যের সম্বন্ধে কেবল এইরূপ অবধারণমাত্র করা হইয়াছে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সৎই ছিল এই কথাটা বলা হইয়াছে। এস্থলে কারণের তৎতৎ আকারে অবস্থান ইহা স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্য্যটী পূর্ব্বে সৎ ছিল এ কথা বিরুদ্ধ হয় না।

পূ। আচ্ছা, কার্য্যের কারণমাত্র সৎ ইহাই যদি অবধারণ করিয়া থাক তাহা হইলে কারণটীই ছিল, কার্য্য ছিল না তাহা অসৎ, ইদানীং সৎ হইয়াছে, এই তো অসৎকারণবাদ আসিয়া পড়িল।

উ। না, কারণেরই কার্য্যরূপে অবস্থান হেতু অসৎকারণবাদ আসিতেছে না। যেমন মৃত্তিকাই ঘটশব্দবুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করে ইহাও সেইরূপ।

পূ। ভাল তোমার মতে সৎবুদ্ধি হইতে কার্য্য যদি ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় হয়, যেমন তুমি দেখাইলে ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়রূপে মৃত্তিকার অবস্থান তাহা হইলেও তো কারণ হইতে কার্য্য একটী বস্ত্বন্তর হইয়া দাঁড়াইল। যেমন অশ্ব হইতে গো একটা ভিন্ন বস্তু। তবে তোমার সৎকারণবাদ টেঁকিল কৈ?

উ। না, পিণ্ড ঘট হইতে এবং ঘট পিণ্ড হইতে ভিন্ন এইরূপ ইতরেতরের ব্যভিচার সত্ত্বেও এই দুই যে মৃত্তিকা তাহার কোনই ব্যভিচার নাই। যদিও পিণ্ড ঘট নয় এবং ঘটও পিণ্ড নয় তথাপি পিণ্ড ও ঘট যে মৃত্তিকাময় তাহার কোন ব্যত্যয় নাই অর্থাৎ মৃত্তিকা ব্যতিরেকে

উহাদের স্বরূপসিদ্ধিরই অভাব ঘটে। কিন্তু গো অশ্বকে এবং অশ্ব গোকে সম্পূর্ণই ব্যভিচার করিতেছে। যখন মৃৎ ব্যতিরেকে ঘটাদির স্বরূপ লাভ হয় না তখন বুঝিও মৃত্তিকাদির সংস্থান মাত্র ঘটাদি। সেইরূপ এই যে সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ইহা সতেরই সংস্থান অর্থাৎ তত্তৎআকারে সতেরই অবস্থান। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা যে সৎই ছিল এ কথা অযৌক্তিক নয়।

পূ। ভাল, তুমি শ্রুতি অনুসারে সৎকে নিরবয়ব নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন দিব্য ও অমূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ কিন্তু নিরবয়ব সতের বিকারসংস্থান অর্থাৎ তত্তৎআকারে অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়।

উ। না, ইহা দোষের হইবে না। তুমি রজ্জুতত্ত্ব জান না বলিয়াই তো তদবয়বে সর্প সংস্থান সঙ্গত হইতেছে সেইরূপ জগৎ কারণতাজ্ঞান না থাকিলে ঐ অজ্ঞানকল্পিত সৎ অবয়ব হইতে এই বিকারসংস্থান বা দ্বৈতপ্রপঞ্চ সঙ্গত হইবে। ঘটাদি বিকার নাম মাত্র মৃত্তিকাই সত্য, এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ নাম মাত্র সৎই সত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি 'ইদং' এই শব্দ প্রত্যয়ের বিষয় ছিলেন সে সময়েও তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' একই অদ্বিতীয়।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।

সেই সৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন করিলেন। সাংখ্যেরা প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু এই ঈক্ষণকার্য্য দ্বারা প্রকৃতির সাংখ্যকল্পিত জগৎকারণত্ব নিরাস হইতেছে। কারণ সাংখ্যমতে প্রধান অচেতন, তাঁহার ঈক্ষাপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্ব সম্ভব হয় না। কিন্তু সৎ সচেতন, কারণ তিনি ঈক্ষিতা। এই ঈক্ষণ কিরূপ, পরে তাহা বলা হইতেছে আমি বহু হইব। যেমন মৃত্তিকা ঘটাদির আকারে যেমন রজ্জু বুদ্ধিকল্পিত সর্পাকারে দৃষ্ট হয় সতের বহু হওয়াও সেইরূপ।

পূ। এই তোমার অসৎবাদ আসিল। তুমি বলিতেছ রজ্জু যেমন সর্পাকারে প্রতীয়মান হয় এই দৃশ্যমান জগৎ তদ্রূপ অর্থাৎ সর্পটা যেমন সৎ নয় সেইরূপ জগৎও সৎ নয়, সুতরাং অসৎবাদ আসিয়া দাঁড়াইল।'

উ। না তাহা নহে। কারণ ঈক্ষিতাই কার্য্যাকারে দ্বৈতভেদে গৃহীত হইতেছেন, সতই অন্যরূপে গৃহীত হইতেছেন, সুতরাং সমস্তই সৎ। যেমন তার্কিকেরা সৎ হইতে ভিন্ন বস্তুন্তর কল্পনা করিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর তাহার অসত্তা বা অনস্তিত্ব স্বীকার করেন আমরা সেইরূপ কখনই সৎ হইতে ভিন্ন অভিধান বা অভিধেয় কল্পনা করি না, সৎই সমস্ত অভিধান ও অভিধেয়। যেমন রজ্জু সর্পজ্ঞানে সর্প বলিয়া অভিহিত হয়, যেমন পিণ্ড ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে পিণ্ডঘটাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি রজ্জুতত্ত্ব বা রজ্জু স্বরূপ বুঝিয়াছে তাহার যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, যেমন যে ব্যক্তি মৃৎস্বরূপ বুঝিয়াছে তাহার যেমন ঘটাদিভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় সেইরূপ যাঁহার সৎস্বরূপের জ্ঞান হইয়াছে তাঁহার দ্বৈতভ্রান্তি ঘুচিয়া থাকে। ফলত সৎই সমস্ত অভিধান ও অভিধেয়।

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি আমাদের বন্ধু বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ন্যায় ইনিও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের একজন প্রিয়শিষ্য ছিলেন এবং কেশবের ন্যায় ইহাঁদ্বারাও ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। ইহাঁর অভাবে বাস্তবিকই আজ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। ঈশ্বর ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

৬৪৪ সংখ্যা | শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৯। | ১৮২০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৫ · কলিগতাব্দ ৫০০০। ২ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

প্রতিজ্ঞাপালন।

প্রতিজ্ঞাপালন মনুষ্যের এক প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সৎ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম, অসৎ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাপালন অধর্ম্ম। যাঁহার হৃদয়ে মহত্ত্বের বীজ আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেন কোন দৈববলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেন। প্রতিজ্ঞা পালনে হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়। তিনিই যথার্থ বীর যিনি প্রতিজ্ঞাপালনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পুরাকালের মহৎ লোকেরা এই ধর্ম্ম পালনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই ধর্ম্মাক্রান্ত লোকসমূহের দৃষ্টান্ত মানসপটে অঙ্কিত রাখিলে মনুষ্য আপন আপন জীবনকে উন্নত করিতে ক্ষমবান হয়। আমি কতকগুলি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছি। সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি যাচককে বিমুখ করিবেন না। একদা কূটবুদ্ধি বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রার্থী হইলে, তিনি অকাতরে তাহা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। পরে তিনি দক্ষিণা চাহিলেন। রাজা কোষাধ্যক্ষকে সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিবার জন্য আদেশ করিলেন, তৎশ্রবণে ঋষি বলিলেন, মহারাজ! সমস্ত রাজ্যই যখন আমার হইল, তখন ভাণ্ডারস্থ স্বর্ণমুদ্রা আপনার হইল কি প্রকারে? ইহাতে রাজা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিন। এক সপ্তাহ অতীত হইলে, দেখিলেন, দিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, রাজমহিষী রাজকুমার ও আপনাকে বিক্রয় পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ইহা কেবল তাঁহার দানশীলতার পরিচয় নহে; প্রতিজ্ঞা পালনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রাজা যুধিষ্ঠির যখন অজ্ঞাতবাসের পণ রাখিয়া, দুর্য্যোধনের সহিত পাশক্রীড়ায় পরাজিত হন, তখন কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃবর্গ সমভিব্যাহারে বনে গমন করিলেন। রাজ্যভোগের স্পৃহা বা অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃসত্য

পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যই তাঁহাকে লঙ্কাসমরের দারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই ঘটনা হইতেই তাঁহার সমস্ত জীবনই যাতনাময় হইয়াছিল। প্রহ্লাদের কথা সকলেই জানেন। জগতের নাথ হরি তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। তিনি কাহারও অনুরোধে, কিছুরই অনুরোধে, এ হরি নামে বিরহিত হইবেন না, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। হরিবিদ্বেষী তাঁহার পিতা, এই হরিনাম পরিত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহাকে শিলাতলে, হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তিনি সেই অভয়দাতাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। ঈশ্বরের সহায়তায় তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন। স্বাধীনতা-প্রিয় রেগুলসের সৎ প্রতিজ্ঞা পালনও প্রশংসাযোগ্য। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য কার্থেজে গমন করিয়া কার্থেজীয়দিগের হস্তে পরাভূত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। পরে রোমকেরা জয়লাভ করেন। তখন কার্থেজীয়েরা রেগুলসকে সন্ধি স্থাপনের জন্য রোমে পাঠাইলেন, পাঠাইবার সময় বলিয়া দিলেন, যদি সন্ধি স্থাপন করিতে না পার, প্রতিজ্ঞা কর যে, কার্থেজে ফিরিয়া আসিবে। তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া রোমে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সিনেট সভায় সন্ধির কথা উত্থাপন করিলেন, সভার সভ্যগণ সন্ধির বিষয়ে অনুকূল মত দিলেন। কিন্তু রেগুলস বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া রোমের গৌরব রক্ষার জন্য পরামর্শ দিলেন। কাহারও অনুরোধ না শুনিয়া তিনি কার্থেজে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে ফিরিয়া গেলেন। জানিতেন ফিরিলেই প্রাণ যাইবে। তথাপি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। নিষ্ঠুর কার্থেজীয়গণ অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিল।

মহাজ্ঞানী সক্রেটীস্ বোধ হয় "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রচার জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে এই ব্রত সাধন করিয়াছিলেন। এথেনীয় যুবকদিগকে তিনি পৌত্তলিকতার পাশ হইতে মুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া একেশ্বরবাদের উপদেশই তাহাদিগকে দিতেন। এইজন্য নগরবাসী অধিকাংশ লোকে তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। পরিশেষে মেলিটস্ স্বদেশপ্রচলিত ধর্ম্মের লোপকারীর অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। শত শত বিচারপতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। সময় উপস্থিত হইলে তিনি হেমলক্ নামক বিষলতার রস পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল; রাজভয়ে মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচার করিলেন না। জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিলেন। তিনি দেবগণের নিকট অমরধামে চলিলেন, এই তাঁহার বিশ্বাস। ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। গুরু নানক ও গোবিন্দের শিষ্যেরাও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহারা অকাতরে মোগল সম্রাটের হস্তে আপন আপন প্রাণ সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া কখনই তাহা পালন করা উচিত নহে। এই অসৎ প্রতিজ্ঞা হইতেই অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এবং সৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন করিলেও ঘোর পাপানুষ্ঠান

করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কানপুরের একটা ঘটনা বলিতেছি, জেনারেল হুইলর সিপাহীদিগের হস্তে পরাভূত হইয়া, সন্ধির জন্য নিশান তুলিলেন, নানা সাহেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। হুইলর উত্তর দিলেন "আমরা সন্ধি করিতে চাই। আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নিরস্ত্র হইয়া নৌকায় উঠিতে দেন।" নানাসাহেব তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সাহেবেরা স্ত্রীপুত্র লইয়া যেমন নৌকারোহণ করিলেন, মাঝিরা অমনি জলে ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিল। ওদিকে উপর হইতে তাঁহাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোকই মরিল। যাহারা প্রাণ লইয়া উপরে উঠিল তাহাদিগকে নানা সাহেব খণ্ড বিখণ্ড করিতে আদেশ দিলেন। দুরাচার নানা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কি ঘোরতর পাপেরই অনুষ্ঠান করিল! টারকুইন পৃস্কসের সময়ে তাঁহার পুত্রের দুরাচার হেতু রোমকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দেশে আর রাজা হইতে দিবেন না। রাজা মাত্রেই কি দোষী? ইহাকে সৎ প্রতিজ্ঞা বলা যায় না। সিজাররূপ মহাসূর্য্যের গৌরব-রশ্মিতে পৃথিবী যখন গৌরবান্বিত, ব্রুটসের প্রাণে তখন তাহা সহিল না। সিজার রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ব্রুটসের মনে ভয় হইল, সিজার রাজমুকুট শীঘ্রই ধারণ করিবেন। ব্রুটস বলিয়াছিলেন, "আমি সিজারকে ভালবাসি বটে কিন্তু রোমকে তদপেক্ষা অধিকতর ভালবাসি" এইজন্য ষড়যন্ত্র করিয়া সিনেট সভা মধ্যে চক্রান্তকারীদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। সিজারের মত পরাক্রান্ত ও রোমের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর দ্বিতীয় কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি সহস্র লোকের অন্নদাতা। বন্ধুগণের ভাগ্য বিধাতা এবং ব্রুটসের পরম বন্ধু ও উপকারী। ব্রুটস্ অসৎ প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকেই বধ করিল। ভাবিল যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। কি ভ্রান্তি! কি মহাপাপ!

এখন আমাদের নিজের কথা বলিতেছি। আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিই, আমাদের কি কোন প্রতিজ্ঞা পালনরূপ ধর্ম্ম নাই? আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পরব্রহ্মবোধে কোন সৃষ্ট পদার্থের পূজা করিব না। প্রাণপণে আমরা কি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব না? গোপনেও যেন আমরা এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করি। এক স্থানে কতকগুলি ফল ছিল, তথায় একটি বালক ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময়ে একজন তাহাকে কহিল; কেহ ত এখানে নাই, তুমি এইবেলা এই ফল সহজেই লইয়া যাইতে পার। বালক তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিতার সহিত বলিয়া উঠিল, কেন? কেহ এখানে নাই— আমি ত আছি। আমি আপনাকে আপনি ত দেখিতে পাই। আমরা যেন সেই প্রবীণ বালকের কথা স্মরণে রাখিয়া গোপনেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করি। যেন মনে মনে বলিতে পারি "আমি ত আপনাকে আপনি দেখিতে পাই। আমরা কি শরীর মন আত্মাকে পবিত্র রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইব না? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া অহঙ্কারবিরহিত হইয়া কাহার অনিষ্ট করিব না, কোমল রসনায় কঠিন কথা কহিব না; মিষ্ট ও সত্য কহিব, ঈশ্বরের গুণ গানে ইহাকে নিযুক্ত রাখিব; সকল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিব, তাঁহার উপাসনা করিব, তাঁহার ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকিব; সেই সুখস্বরূপ শান্তস্বরূপকে লাভ

করিয়া আনন্দে মগ্ন হইব, আমরা কি এই দেবোচিত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইব না? কেবল শোক, তাপ ও অনুতাপ করিয়াই কি জীবন কাটাইয়া দিব? বিফলে গেল জীবন। দেখ, দেখিতে দেখিতেই মৃত্যু নিঃশব্দে আসিতেছে; ঐ দেখ সেই নিবিড় অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিবার উপক্রম করিতেছে। এখন হৃদয়ে এমন আলোক সঞ্চয় করিবার প্রতিজ্ঞা কর, যাহাতে এখান হইতেই সেই আনন্দধাম দেখা যায়। বল, "ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।"

কোথা নাথ—অনাথের নাথ! দয়াময়! দুর্ব্বলের বল। আমরা কেমন করিয়া এই সকল সৎ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ইহলোক পরলোকে সুখী হইব? কি উপায় আছে, তুমি বলিয়া দাও। আর সংসারযন্ত্রণা সহ্য হয় না। কোথায় মুক্তিদাতা! সংসারবন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দাও। সৎ প্রতিজ্ঞা পালনে আমাদের সহায় হও। এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার।

বিগত প্রবন্ধে আমরা কাণ্টীয় দর্শনের অন্ধিসন্ধি-প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিষম এক সঙ্কটস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এই প্রদেশটির আশপাশের গলিঘুঁজিতে ভয়ানক ডাইনামাইট্—সর্ব্বসংশয়—নিশ্ছিদ্র যুক্তি-পরিচ্ছদে চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে, তাহা আমি জানি। জানিয়াও তবু যে তাহাকে আমি ঘাঁটাইতে ভয় পাইতেছি না—সে কেবল দেশীয় শাস্ত্রের মন্থনসম্ভূত মৃতসঞ্জীবনী সুধার মাহাত্ম্যগুণে। পশ্চাত্য দর্শনের কিন্তু বড়ই দুর্দ্দশা! কাণ্টের সময়ের অনতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় ভট্টাচার্য্য-মহলে নানা শ্রেণীর নানা দর্শনকার নানা মতামতের মনোরাজ্য বাতাসে ফাঁদিয়া সেই সেই মনোরাজ্যের গন্ধর্ব্বনগরগুলাকে বাস্তবিক সত্যের ঢঙে সাজাইয়া আসিতেছিলেন সুনির্ভয়ে। কাণ্ট্ এক কথায় তাঁহাদের সুখস্বপ্ন জন্মের মতো ভাঙিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, বাস্তবিক-সত্য মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার বহির্ভূত।

গোড়াতেই তো আমি বলিয়াছি, "আগে যুদ্ধ—পরে শান্তি!" হে যাত্রিভায়া'রা! শান্তিসদনে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছ বটে, কিন্তু মনে করিও না যে, বিনা যুদ্ধে অভীষ্ট-ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ফণীর মস্তক হইতে মণি উৎপাটন করা সোজা কথা নহে! অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! ধৈর্য্যের কবচ পরিধান কর! জ্ঞানের অস্ত্র শাণিত কর! ফলে, একটা দিক্ আছে—যে দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয় যে, কাণ্টের দর্শন আগাগোড়া একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড! এ কুরুক্ষেত্রের কুরু-পাণ্ডব হচ্চেন জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা। যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন দোঁহে দোঁহার ভ্রাতা ছিলেন কেবল জ্ঞাতিসম্পর্কে; কিন্তু জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা দোঁহে দোঁহার অর্দ্ধাঙ্গ—শিবদুর্গা বলিলেই হয়! স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য-কলহ সবাই জানে খড়ের আগুন; তা বই, তাহা যে এমনতরো একটা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' রকমের প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে—এ কথা পৃথিবীর আদিম-যুগ হইতে এ-কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নেও কাহারো জানা ছিল না। বিবাদানল এতদিন পর্য্যন্ত স্তূপাকার ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত ছিল, তাই লোকের তাহা চক্ষে পড়ে নাই।

ভস্মরাশি আর-কিছু না—বাদাবাদের শব্দাড়ম্বর। সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিটাকে যুক্তি-তর্কের শুষ্ককাষ্ঠ দিয়া বিধিমতে খোঁচাইয়া তুলিয়া কাণ্ট্ মহাসুধী কাণ্ড-এক বাধাইয়াছেন কম না! এখন সে অগ্নিটা'কে সামলানো দায়!

কাণ্টের খোঁচাখুঁচি।

কাণ্ট্ আপনার মন'কে সাম্‌নে ডাকিয়া আনিয়া শুধাইলেন—"বল দেখি বৎস, কে আগে? বাস্তবিক-সত্তা আগে—না জ্ঞান আগে?" মন বলিল—বাস্তবিক-সত্তা।" মনের এ কথায় কাণ্টের বুদ্ধি সায় দিল না। কাণ্ট্‌মুনি ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে ভাবনা ঢেউ খেলিতে লাগিল এইরূপঃ—

"মন তো বলিবেই 'আগে সত্তা—পরে জ্ঞান।' এটাও তো সে বলে যে, 'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ঘুরিতেছে।' বিজ্ঞান তো আর তাহা বলে না! জগৎশুদ্ধ লোক যখন ইন্দ্রিয়-মনের কথায় ভুলিয়া একবাক্যে বলিতেছিল—'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ,' তখন বিজ্ঞানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কোপর্নিকস্ একাকী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'না, তাহা নহে! সূর্য্য স্থির—পৃথিবী ভ্রাম্যমাণ!' * ইনি আমার গুরু। ইঁহার দৃষ্টান্তের মন্ত্রপূত অঞ্জনে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া আমি দেখিতেছি এই যে, সংবিৎ স্থির রহিয়াছে; আর তাহারই সাক্ষিতাগুণে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের সত্তা সংসিদ্ধ হইতেছে;—আগে জ্ঞান, পরে সত্তা, তাহাতে আর ভুল নাই।" এ তো পঞ্চদশীর কথা। পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা।

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প অনেকধা গতায়াত করিতেছে—তার মাঝে উদয়ও হ'ন না, অস্তও যা'ন না, একা কেবল সংবিৎ, যিনি স্বয়ম্প্রভা।" তবে ত কাণ্ট্ প্রতীতিবাদী (Idealist)। কাণ্টের হস্ত হইতে "বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমালোচনা" প্রথম যখন বাহির হইয়াছিল, তখন তদ্দৃষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ভাবিয়াছিলেনও তাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কাণ্ট্ তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া দিলেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া।

সংশয়বাদের গোড়া'র সূত্র।

"দ্রষ্টার সাক্ষিতাগুণে বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়"—এই কথাটি কাণ্ট্ ইঙ্গিত-আভাসে জ্ঞাপন করিয়া অতবড় একটা লোক-বিরুদ্ধ কথা'র তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া শেষে তিনি এক-পা এক-পা করিয়া পিছাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"কথাটা অযথা নহে—জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণেই বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণে সে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা কেবল ভাব-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা, তা বই, তাহা সত্য-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা নহে—প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে।" কাণ্টের এ কথা'র ভাব-টা বুঝিতে পারা গিয়াছে; তাহা এই;—

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি (viceroy) সত্যসত্যই কিছু আর ভারতবর্ষের রাজাধি-

* We have here the same case as with the first thought of Copernicus, who, not being able to get on in the explanation of the movement of the heavenly bodies, as long as he assumed that all the stars turned round the spectator, tried, whether he could not succeed better by assuming the spectator to be turning round and the stars to be at rest. A similar experiment may be tried in metaphysic, so far as the intuition of objects is concerned ইতি কাণ্ট্।

রাজ নহেন; সত্যসত্যই তাহা তিনি না হউন্, কিন্তু তথাপি ভারতবাসীর নিকটে তিনি ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ মহারাজেরই সামিল। তেম্নি, ভাবরাজ্যের মনোময়ী বাস্তবিক-সত্তা প্রকৃত-প্রস্তাবে বাস্তবিক-সত্তা না হইলেও মনুষ্যজ্ঞানের নিকটে তাহা বাস্তবিক-সত্তারই সামিল।

কাণ্টের এইপ্রকার দ্বৈধসূচক কথা শুনিয়া লোকের মনে সহজেই এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের বলে সিদ্ধ-হয়-বলিতেছ সেই যে ভাবরূপী বাস্তবিক-সত্তা, তাহা যদি প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি? কাণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন এই যে, তাহা আর-কিছু না - সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য synthetic unity of consciousness। তিনি বলেন--

It is clear also that as we can only deal with the manifold in our representation, and as the x corresponding to them (অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা) is really nothing to us, it is clear, I say, that the unity necessitated by the object cannont be any-thing but the formal unity of our consciousness in the synthesis of the manifold in our representations.

ইহার বাংলা—

এটা যখন স্পষ্ট যে, আমরা কেবল আমাদের বহুধা-বিচিত্র প্রতীতিসমূহের সঙ্গেই কারবার করি, * আর সেই সঙ্গে এটাও যখন স্পষ্ট যে, সেই প্রতীতি-সমূহের পৃষ্ঠের আড়ালে বস্তু যাহা সংগোপিত আছে, তাহার সহিত আমাদের কোনো কারবার চলিতে পারে না, তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি বস্তুর একত্ব (বা বস্তুগত একত্ব objective unity), তাহা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর একত্ব নহে; তবে কি? না, সংবিতের যে একপ্রকার ঔপাধিক (অর্থাৎ formal কিনা উপাধিগত) একত্ব আমাদের প্রতীতি-বৈচিত্র্যের সংযোজনা-ব্যাপারে অধ্যারোপিত হয় (অর্থাৎ চাপানো হয়)—সে একত্ব সেই একত্ব। এ যে একটি কথা কাণ্ট্ বলিতেছেন—কি বলিতেছেন, তাহা কি পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন? তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটা হ'চ্চে এইঃ—

সংশয়বাদের নিজমূর্ত্তিধারণ।

মনুষ্যের জ্ঞান একপ্রকার জেলখানার কয়েদী। বাহিরে যে-দিকে সে চক্ষু ফিরায়, সেই দিকেই দেখে—সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে

---

* প্রতীতি-শব্দের মুখ্য অর্থ—representation। তার সাক্ষী—

(১) প্রতি = re।
(২) ইতি = Presentation।
(৩) প্রতীতি = representation।

ইতি-শব্দের ধাত্বর্থ গতি। যাহা গতিসূত্রে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা 'ইতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করি; আবার, তাহাই যখন আমাদের মনে প্রত্যুপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বলি—প্রতীতি। বেদান্তদর্শনে তিন-প্রকার সত্তা'র উল্লেখ আছে—

(১) পারমার্থিক।
(২) ব্যাবহারিক।
(৩) প্রাতীতিক।

প্রাতীতিক সত্তা কি? না, প্রতীতিই (representationই) যাহার সর্ব্বস্ব, তা বই, বাস্তবিক-সত্তা'র সহিত যাহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই—যেমন স্বপ্নের সত্তা। লোকমধ্যে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়) শব্দ সচরাচর বিশ্বাস-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা তো হইবারই কথা:—মনে যাহা প্রতীয়মান হয় (comes to be represented,) তাহার ইতিত্বে (সাক্ষাৎ objective presenceএ) বিশ্বাস সহজ-জ্ঞানের পক্ষে অনিবার্য্য। এইজন্য সহজ-জ্ঞানের শাস্ত্রে অর্থাৎ লোকের শাস্ত্রে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়)-শব্দের অর্থ শুধুই-কেবল বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে ঘট-প্রত্যয়-শব্দে বুঝায়—ঘটের জ্ঞানগত ভাব বা representation বা Idea।

অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—আকাশ; আপনার দিকে যখন চক্ষু ফিরায়, তখন-আবার দেখে—হস্তপদ তাহার বাঁধা রহিয়াছে কালের অবিমোচ্য বন্ধন-রজ্জুতে। আকাশ-প্রাচীরের ও পৃষ্ঠে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা; কালরজ্জুর গোড়া বাঁধা রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তায়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয় আকাশ ভেদ করিয়া—আকাশের ও-পৃষ্ঠে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু সকলের বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না; তথৈব, অন্তরিন্দ্রিয় (বা অন্তঃকরণ) কালের গঙ্গাস্রোতের উজানে চলিয়া—গোমুখী ছাড়াইয়া মহোচ্চ কৈলাসধামে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্র।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে গন্তব্য-পথের ঠিকানা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে যাত্রিগণের উদ্যমভঙ্গ হইবারই কথা; কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষণীয় নহে; যেহেতু কাণ্ট্ পাশ্চাত্য-দর্শনের পথপর্য্যটকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে মাঝপথের প্রধান-প্রধান কতিপয় প্রদেশ-খণ্ড পরিচিহ্নিত হইয়াছে এইরূপেঃ—

এপারে রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তা। ওপারে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা। দুই পারের মাঝখানে রহিয়াছে—

(১) সংবিতের একত্ব এপার ঘেঁষিয়া, (২) বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য ওপার ঘেঁষিয়া, (৩) অন্তরিন্দ্রিয়ের (বা অন্তঃকরণের) সংযোজনারূপী আবর্ত্তের টান দুয়ের মধ্যস্থলে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক-সত্তার ঐ যে দুই দিকের দুই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—এপার এবং ওপার, দুই পারই মনুষ্য-জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত অজ্ঞেয়-প্রদেশ। মানচিত্র-এ-যাহা আলেখ্যপটে লেখনী টানিয়া আঁকিয়া দেখানো হইল, ইহার যাথার্থ্য ফলে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা একবার পদব্রজে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্।

মানচিত্রের ফলপরীক্ষা।

গুরু বলিলেন—"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" গুরুর মুখবিনির্গত ঐ তেজোময় বাক্যটি শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শিষ্যের কর্ণকুহরে তাহা প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তত্রাচ শিষ্য তাহার একটি অক্ষরও শুনিতে পাইলেন না। শিষ্যের কর্ণকুহরে যে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কেন না, একটু পূর্ব্বে ক্লান্তির প্রাদুর্ভাবে শিষ্যের চক্ষুদুটি বুজিয়া আসিতেছিল ক্রমশই অধিকাধিক মাত্রা, ইতিমধ্যে "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই শব্দের ধমকে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, গুরুমুখোচ্চারিত ঐ শব্দটি শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে;—না যদি প্রবেশ করিবে, তবে শিষ্যকে জাগাইয়া দিল কে? অত-বড় একটা জোরালো শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে আসিল না—এটা হইল শুদ্ধকেবল মনোযোগের অভাবে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হওয়া চাই বিশেষ একটি দেশে (যেমন কর্ণকুহরে), আর, সেই সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ মনের) সংযোজনা-ক্রিয়া'র উদ্রেক হওয়া চাই বিশেষ-একটি কালে (যেমন জাগরণ-মুহূর্ত্তে); এই দুই ব্যাপারের সমবেত কার্য্য-কারিতা ব্যতিরেকে বিষয়ের উপলব্ধি সম্ভবে না। দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল; একটি হচ্চে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য (যেমন ক, র, ত, ল, ন্য, স্ত, আ,

ম, ল, ক, ব, ৎ—এতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি); আর-একটি হ'চ্চে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোজনা-ক্রিয়া (যেমন, ঐ পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিগুলি একত্র সংযোজনা করিয়া "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই একটি সমগ্র শব্দ গড়িয়া তোলা)। পরে-পরে ঘটিল যাহা, তাহা এই ঃ—

গুরু বলিলেম—"শুনিতেছ? না, শুনিতেছ না?" শিষ্য বলিলেন—"শুনিতেছি! আজ্ঞা করুন্!" গুরু বলিলেন—"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" শিষ্য এবারে দিব্য সজাগ! কএর পরে যেম্নি শুনিলেন র, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত ক কে স্মরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে র জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ত, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত কর-কে স্মরণে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সঙ্গে ত জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ল, অম্নি তিনি পলায়নোদ্যত করত কে স্মরণে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সঙ্গে ল জুড়িয়া দিলেন; ল জুড়িয়া-দিয়া পাইলেন "করতল"। ইহার নাম সংযোজনা। এইরূপ করিয়া শিষ্যটি ক, র, ত, ল, ন্য, স্ত, আ, ম, ল, ক, ব, ৎ—এতগুলি মুহূর্ত্তপরম্পরাগত ধ্বনির মোট বাঁধিয়া একটা বিদেশীসিকে ওজনের শব্দ অন্তঃকরণের মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া পাইলেন—কি না করতলন্যস্ত-আমলকবৎ। এ শব্দটি অনেকের যোগে এক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ইহারি নাম যোগাত্মক ঐক্য। (synthetic unity)। মোট ঘটনাটি এই ঃ—

শিষ্যের কর্ণ যেমন রহিয়াছে অভ্যাগত ধ্বনিপরম্পরা'র প্রতি দ্বার খুলিয়া, তাঁহার চক্ষু তেম্নি রহিয়াছে গুরুমুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া। শিষ্যের কর্ণকুহরে ধ্বনিপরম্পরা যাহা প্রবেশ করিতেছে, তাহা গুরুমুখের সহিত কার্য্যকারণসূত্রে সম্বদ্ধ। শিষ্য দুই ভাবের দুইতরো সংযোজনা এক সঙ্গে চালাইতেছেন ঃ—একদিকে তিনি সমষ্টি ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অনেক ধ্বনিকে এক করিয়া ফেলিতেছেন; আর-এক দিকে তিনি কার্য্যকারণ-ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া উচ্চরিত ধ্বনিপরম্পরাকে গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পনের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছেন। গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন হ'চ্চে প্রবর্ত্তক (active), বায়ুর শাব্দিক কম্পন হ'চ্চে অনুপ্রবৃত্ত (passive)। শিষ্যের কর্ণকুহর হইতে গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন পর্য্যন্ত ঐ-যে এক-প্রকার প্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তকের তরঙ্গমালা নাচিয়া চলিতেছে—শিষ্য ঐ অনেকাত্মক ব্যাপারটিকে কার্য্যকারণ-সূত্রে গাঁথিয়া অন্তঃকরণমধ্যে এক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই যে দুই ভাবের দুই তরো ঐক্যসূত্র দেখিতে পাওয়া গেল—(১) সমষ্টিভাবের ঐক্যসূত্র এবং (২) কার্য্য কারণ-ভাবের ঐক্যসূত্র, এ দুই ঐক্যসূত্র একই মৌলিক ঐক্যসূত্রের দুইটি শাখা বই নয়। সে যে মৌলিক ঐক্যসূত্র তাহা আর-কিছু না—ক্যাণ্ট্ যাহাকে বলেন, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। একই সংবিৎ-সেনাপতি পিছনে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক সৈন্যবিভাগের মধ্যে, তথৈব, সমগ্র সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে, একত্বের বন্ধনসূত্র সঞ্চারিত করিতেছেন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বনি পংক্তির পরস্পারের সহিত এবং গুরুমুখের সহিত সেই যে যোগাত্মক ঐক্য—সে ঐক্য ভাসিতেছে শিষ্যের মানস-সরোবরে (অর্থাৎ অন্তঃকরণে); আর, সেই মানস সরোবরের কূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং। স্বয়ং সেই যে শিষ্য, তিনিই সংযোজনা-কার্য্যের মূলাধার। কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন

তিনি আপনাকে—আপনারই সেই সংযোজনা-কার্য্যের ফলরূপে জলে প্রতিবিম্বিত; দেখিতেছেন আপনাকে—ধ্বনি-পংক্তির যোগাত্মক ঐক্যে সমষ্টিরূপে প্রতিবিম্বিত; আর দেখিতেছেন আপনাকে—শ্রূয়মাণ শব্দের সহিত গুরুমুখের যোগাত্মক ঐক্যে কার্য্যকারণের বন্ধনগ্রন্থিরূপে প্রতিবিম্বিত। গুরুর মুখমণ্ডলও শিষ্যের মানস-সরোবরে ভাসিতেছে। শিষ্যের মানস-সরোবরের এপারে যেমন রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং; তেমনি সেই মানস-সরোবরের যে-স্থানটিতে ভাসিতেছে গুরুর মুখমণ্ডল, সেই-স্থানটির ওপারে রহিয়াছেন গুরু স্বয়ং। মনে কর, মানস-সরোবর বাঁধ ভাঙিয়া সুপ্তিগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এপার হইতে ওপারে অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যাইতে পারে—যেহেতু মাঝখানে জলের ব্যবধান নাই। তবেই হইতেছে যে, এপার এবং ওপার, একই ডাঙাভূমির দুই শৃঙ্গ—এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন গুরু স্বয়ং। আর এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্য। অতএব এটা স্থির যে, এপার এবং ওপার তলে-তলে একই ডাঙাভূমি। সেই যে একই ডাঙাভূমি, তাহাই বাস্তবিক-সত্তা। শিষ্য স্বয়ং এবং গুরু স্বয়ং উভয়েই একই ডাঙাভূমিতে—বাস্তবিক-সত্তাতে—ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ বাস্তবিক-সত্তাকে "জানি না" বলিয়া জ্ঞান হইতে উচ্ছেদ করিলে যে ডালে আমরা বসিয়া আছি, সেই ডালকে উচ্ছেদ করা হয়। কাণ্ট্ প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। লোকে দেখিয়া অবাক্ যে, কাণ্টের দার্শনিক দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তা-রূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ যজ্ঞে শিব নাই—মঙ্গল নাই।

সংশয়বাদে জ্ঞানের অসম্মতি।

কাণ্টের কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আকাশ কি বাস্তবিকই জ্ঞানের পথাবরোধক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর? কাল কি বাস্তবিকই জ্ঞানের অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? বাস্তবিক-সত্য কি বাস্তবিকই মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত? তবে কি এ যাবৎকাল মহামহা ঋষিতপস্বীরা বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়া আসিতেছেন? এ বৃথা পণ্ডশ্রম না করিলেই কি নয়? প্রকৃত কথা এই যে, বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো ইহাকে বলে না—ইহাকে বলে আর-এক পদার্থ; ইহাকে বলে—ক্ষুদ্র শিশু হইয়া মাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়ানো। মাতাকে দেখিলে ক্ষুদ্রশিশুটিও হাত না বাড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; শিশুটি হাত বাড়াইলে মাতাও তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না;—উভয়ত এইরূপ। বাস্তবিক-সত্যের প্রতি মনুষ্যজ্ঞানের যেমন প্রাণের টান—মনুষ্যজ্ঞানের প্রতিও বাস্তবিক-সত্যের তেম্নি প্রাণের টান। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শুভ অবসরে দোঁহার সম্মিলন ঘটিতে পারা কিছুই বিচিত্র নহে—বরং তাহা না ঘটিতে পারাই বিচিত্র। কাণ্ট্ কোথা হইতে পাইলেন যে, আকাশ অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—কাল অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? দুইই শূন্যবৎ অবস্তু, তাহা কি তিনি জানেন না? আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে আর-এক কথা;—লেখে এই যে, আকাশও প্রাচীর নহে—কালও বন্ধনসূত্র নহে। প্রাচীর হ'চ্চেন অবিদ্যা (অর্থাৎ জ্ঞানাভিমানিনী অজ্ঞতা); বন্ধনও তিনিই। প্রাচীর ভাঙিবার এবং বন্ধন খুলিবার কর্ত্রী উপরে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতী মঙ্গলেচ্ছা, নীচে জীবের প্রাণের ব্যাকুলতা এবং মনের একাগ্রতা, মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের সুনির্ম্মল আলোকের অভিব্যক্তি। কাণ্টীয় দর্শনের

আলোচনা হইতে আমরা বহুমূল্য সত্য একটি পাইয়াছি—কিন্তু সে সত্য সংশয়বাদ নহে; তাহা যে কি, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল

সত্য।

দ্বিতীয় উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের উৎপত্তি-নির্ণয়।

পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এবং মনোবৃত্তি-সকল যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি মূলতত্ত্বের সত্তা আমরা সিদ্ধ করিয়াছি, এরূপ এক্ষণে মনে করা যাইতে পারে। যে পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত সেই সাক্ষিচৈতন্যের পরীক্ষা হইতে যেমন একদিকে আমরা এই সকল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনি আবার দেখিতে পাই, যে উচ্চভূমির উপর এই সকল মূলতত্ত্ব অধিষ্ঠিত, পরীক্ষার হাত সেখানে পৌঁছায় না এবং উহারা আমাদের সম্মুখে যে সকল প্রদেশ উদ্ঘাটিত করে তাহাও পরীক্ষাবাদের অনধিগম্য। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রকার মূলতত্ত্ব প্রায় সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। এই তত্ত্বগুলির উৎপত্তি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, আমাদের বিবিধ মনোবৃত্তির মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, একটি ছাড়া আর কোন মনোবৃত্তি হইতে উহাদের উৎপত্তি অসম্ভব। সেটি কি?—না, জ্ঞান-বৃত্তি, যাহাকে আমরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। প্রজ্ঞা হইতেই, বুদ্ধিবৃত্তি কতকগুলি নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি; কিন্তু এইখানেই কি থামিতে পারিব? অধুনা মানব-বুদ্ধি যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, এই পরিণত মানব বুদ্ধিতে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ পায় যাহার সত্তায় সংশয় করা অসম্ভব। তাহার দৃষ্টান্ত, কার্য্যকারণের-মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট এইরূপ ভাবে প্রকাশ পায়, যথা:—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, তাহারি একটা অবশ্যম্ভাবি কারণ আছে। অন্যান্য মূলতত্ত্বগুলিও এই একইরূপ স্বতঃসিদ্ধতার আকার ধারণ করে। কিন্তু যেমন মিনর্ভা-দেবী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, জুপিটার-দেবের মস্তক হইতে বাহির হইয়াছিলেন সেইরূপ এই তত্ত্বগুলিও কি ন্যায়শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মানব-আত্মা হইতে একেবারেই বাহির হইয়াছে? গোড়ায় উহারা কিরূপ লক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছিল? কিন্তু সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সূত্রস্থানে আরোহণ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? যে পথ দিয়া উহারা অধুনা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেই সমস্ত পথ অনুসরণ করিতে কি আমরা সমর্থ? এই নূতন সমস্যাটির কতটা গুরুত্ব তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এই সমস্যাটির মীমাংসা করিতে পারিলে, ঐ মূলতত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অনেকটা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে বাধাবিঘ্নও অনেক। নীল নদীর উৎপত্তি-স্থানের ন্যায় যাহা প্রচ্ছন্ন, মানব-জ্ঞানের সেই সূত্রস্থানটিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করা যাইতে পারে? ঐ তমসাচ্ছন্ন অতীতের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, এরূপ কি আশঙ্কা হয় না যে, হয়ত অবশেষে আমরা একটা কাল্পনিক সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইব? ইহা একটি মহাবিপদের স্থান। নৌকা-ডুবির জন্য, ঐ মগ্নশৈলটি

এরূপ প্রখ্যাত যে, ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া ইহাও মনে হয়, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরাও এই বিষম সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া, উহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে, লক্ ও কঁডিয়াক্—এই দুই দার্শনিক এই সমস্যার বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই এতটা পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন; এবং একথাও বলা যাইতে পারে, তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মূল-প্রস্রবণ পর্য্যন্ত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকেই কলুষিত করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহারা পরীক্ষা-প্রণালীর এত ভক্ত, সেই পরীক্ষা-বাদিরাই এই স্থলে আসিয়া একপ্রকার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন। কেন না সাক্ষিচৈতন্যের সাক্ষ্য গ্রহণে ও চিন্তা-আলোচনার সাহায্যে আমরা যে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করি, সেই সকল জ্ঞান-তত্ত্বের বাস্তবিক লক্ষণ গোড়ায় পর্য্যালোচনা না করিয়া, কোন একটা দীপালোক কিংবা পথপ্রদর্শক সঙ্গে না লইয়া একেবারেই তাঁহারা সূত্রস্থানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রীড্ ও ক্যাণ্ট—এই দুই দার্শনিক পণ্ডিত, পাছে অতীতের তমোজালে পথ হারাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে বর্ত্তমান-সীমার মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূল তত্ত্বগুলির আকার গোড়ায় কিরূপ ছিল তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, অধুনা তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহারি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। পরীক্ষাবাদিগের সেই দুঃসাহসিক চেষ্টা অপেক্ষা আমরা ইঁহাদের সাবধানতা ও বিমৃষ্যকারিতার পক্ষপাতী। তবে কি না, যখন একটা সমস্যা সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে,—যতক্ষণ না ইহার একটা মীমাংসা হয়, ততক্ষণ উহা মানব-চিত্তকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করিবে। অতএব, উহাকে একেবারে এড়াইয়া-যাওয়া দর্শনশাস্ত্রের উচিত নহে পরন্তু অতিমাত্র সাবধানতা সহকারে, কঠোর প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই দর্শনশাস্ত্রের কর্ত্তব্য।

আর একবার এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া দেওয়া যাক্;—তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও ভাল হইবে, অন্যের পক্ষেও ভাল হইবেঃ—মানব-জ্ঞানের আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে বহুদূরে; তদবস্থ জ্ঞান সমূহকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে, উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। আর কিছু করিতে হইবে না, শুধু একবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আলোচনা করিয়া দেখিলেই আমাদের আত্মচৈতন্য হইতেই সমস্ত তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারিব। কতকগুলি সুনিশ্চিত তত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলে, পরে আর পথভ্রষ্ট হইয়া কোন কাল্পনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে না। জ্ঞানের আদিম অবস্থা-রূপ মূল-প্রস্রবণে আরোহণ করিবার সময়, যদি কখন ভ্রমে পতিত হই, তাহা হইলে আমরা সেই ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিব এবং অপক্ষপাতী পর্য্যবেক্ষার সাহায্যে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিতেও সমর্থ হইব। আমরা এক্ষণে যেখানে অবস্থিতি করিতেছি, যদি জ্ঞানের সূত্রস্থান হইতে, বৈধ উপায়ে আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিব, আমরা ভ্রান্ত হইয়াছি—পথভ্রষ্ট হইয়াছি। সাধারণতঃ সত্য আমাদের নিকট যে আকারে প্রকাশ পায়, তাহার একটা শুষ্ক বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছেঃ—

১। দুই প্রকারে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর, দুইটি প্রস্তর তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; এবং পরে, আর দুইটি প্রস্তর উহাদের পার্শ্বে স্থাপিত হইল। তখন আমরা এই অকাট্য সত্যে উপনীত হই যে, প্রথমোক্ত দুইটি প্রস্তর এবং শেষোক্ত দুইটি প্রস্তর—এই উভয়ে মিলিয়া চারিটি প্রস্তর হইল। এইস্থলে সত্যকে আমরা বস্তুভাবে উপলব্ধি করিলাম; কতকগুলি বাস্তবিক ও নির্দ্দিষ্ট পদার্থের আধারে ঐ সত্যটিকে প্রাপ্ত হইলাম। তা-ছাড়া, কখন-কখন আমরা সাধারণ ভাবেও এইরূপ প্রতিপাদন করি যে, দুয়ে-দুয়ে চার হয়। তখন আমরা ঐ সত্য, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে, বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকি। ইহাই সত্যের বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম ধারণা।

এখন দেখা যাউক্, সত্য-উপলব্ধির এই যে দুই প্রকার-ভেদ,—ইহার মধ্যে কোন্‌টি মানব-জ্ঞানে, কালের হিসাবে, অগ্রে প্রকাশ পায়। ইহা কি ঠিক্ নহে—ইহা কি একবাক্যে সকলেই স্বীকার করে না যে, আমাদের বস্তুগত স্থূল ধারণাই বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম ধারণার অগ্রবর্ত্তী? স্থান-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষ ভাবে, কোন সাধারণ সত্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে, গোড়ায় কি আমরা কোন বিশেষ সত্যকে, এই-এই বিশেষ অবস্থায়, এই-এই বিশেষ মুহূর্ত্তে, এই-এই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করি না?

২। "ইহা কি আমি অস্বীকার করিতে পারি?"—এইরূপ প্রশ্ন না করিয়াও, আমরা সত্যকে অন্য প্রকারেও উপলব্ধি করিতে পারি। তখন, আমাদের জ্ঞানের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহারি প্রভাবে সত্যকে উপলব্ধি করি। তখন, জ্ঞান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে। তখন যে সত্য আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকে সন্দেহ করিতে চেষ্টা করিলেও সন্দেহ করা যায় না, অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিলেও অস্বীকার করা যায় না। তখন সেই সত্য আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রকার নেতিবাদের অতীত বলিয়া প্রতীতি হয়। তখন সেই সত্য শুধু একটা সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না, পরন্তু অবশ্যম্ভাবি সত্য রূপে প্রকাশ পায়।

সেই সত্য অর্জ্জনকালে গোড়ায় চিন্তা আলোচনার দ্বারা আমরা আরম্ভ করি না। আলোচনা বলিলে বুঝায় তাহার আগে একটা কিছু ব্যাপার হইয়া গিয়াছে যাহা লইয়া আলোচনা হইতেছে। যদি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের পূর্ব্বে আর কোন ব্যাপার হয় নাই এইরূপ দাঁড় করাইতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যাপারটিকে স্বতঃসিদ্ধ না বলিলে চলে না। এইরূপ সত্যের যে স্বতঃসিদ্ধ ও সহজ প্রতীতি, উহা কি সত্যের চিন্তা-প্রসূত অবশ্যম্ভাবি ধারণার পূর্ব্ববর্ত্তী নহে? কি ব্যক্তি, কি জাতি—উভয়েরি মধ্যে আলোচনা-বুদ্ধি বিলম্বে উন্নতি লাভ করে। বলিতে গেলে এই আলোচনা-বুদ্ধিই প্রকৃত দার্শনিক বৃত্তি। কখন-কখন ইহা হইতেই সন্দেহ ও সংশয়বাদ, কখন বা চিন্তাজনিত সুগভীর বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই বিবিধ মতবাদ, কৃত্রিম তর্ক-শাস্ত্র এবং বিবিধ কৃত্রিম শাস্ত্রীয় সূত্রের উৎপত্তি। (সেই সূত্রগুলি, অভ্যাসবশতঃ আমরা এইরূপ ভাবে ব্যবহার করি যেন উহা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম) কিন্তু আসলে ধরিতে গেলে, স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রত্যয়ই প্রকৃতির প্রকৃত তর্কশাস্ত্র। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানার্জ্জন ব্যাপারে এই সহজ প্রত্যয়েরি কর্ত্তৃত্ব আমরা উপলব্ধি করি।

শিশু, জনসাধারণ, মানব-জাতির বারআনা লোক উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত অসীম নির্ভরের সহিত উহারি উপর বিশ্রাম করে।

মানব-জ্ঞান-সমূহের উৎপত্তি-স্থান কোথায়, আমরা উহার সহজ মীমাংসা এইরূপ করিয়াছিঃ—আমরা এইটুকু নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি—কোন্ মনোব্যাপারটি অন্য সকল মনোব্যাপারের পূর্ব্ববর্ত্তী—যাহা ব্যতীত অন্য কোন মনোব্যাপার প্রকাশ পাইতে পারে না, এবং যাহা আমাদের জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ক্রিয়া ও প্রথম রূপ।

যেহেতু, চিন্তা-আলোচনার লক্ষণ যাহাতে আছে তাহা কখনই আদিম হইতে পারে না, তাহা আর একটা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সূচনা করে,—অতএব, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—আমাদের আলোচ্য বিষয়টি অধুনা যেমন চিন্তার চিহ্নে ও সূক্ষ্মধারণার চিহ্নে চিহ্নিত, গোড়ায় সেরূপ কখন ছিল না; গোড়ায় অবশ্য কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন বস্তুগত নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কালক্রমে তাহা হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া, এইরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বের আকার—সার্ব্বভৌমিক আকার ধারণ করিয়াছে। একটি শৃঙ্খলেরি এই দুই প্রান্ত। এখন আমাদের শুধু এইটুকু অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কি করিয়া মানব-জ্ঞান একটি প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে,—আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায়—স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

কোন্ পথে সুখ?

১। "আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই যেন ঘটে" এইরূপ আকাঙ্খা না করিয়া, "যাহাই ঘটুক্ না কেন, আমি তাহা অম্লান-বদনে গ্রহণ করিব"—এইরূপ যদি তোমার মনের ভাব হয় তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে।

২। রোগ শরীরেরই বাধা, উহা আত্মার বাধা নহে;—আত্মার বাধা হয়, যদি উহাতে আত্মার সম্মতি থাকে। খঞ্জতা পদেরই বাধা—উহা আত্মার বাধা নহে। যাহা কিছু ঘটুক না—সকল অবস্থাতেই তুমি এইরূপ বলিতে পার যে, এ বাধা আমার নহে, এ বাধা আর কিছুর।

৩। কে তবে তোমাকে উৎপীড়ন করে—কে তোমাকে কষ্ট দেয়? তোমার অজ্ঞানই তোমাকে উৎপীড়ন করে—তোমাকে কষ্ট দেয়। যখন আমরা বন্ধুবান্ধব হইতে—সুখ সম্পদ হইতে বিযুক্ত হই, তখন নিজের অজ্ঞানই আমাদিগকে উৎপীড়ন করে। ধাত্রী যখন কিয়ৎকালের জন্য শিশুর নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন শিশু ক্রন্দন করে; কিন্তু আবার যেই তাকে কিছু মিঠাই দেওয়া হয় অমনি সে তাহার দুঃখ ভুলিয়া যায়। তুমি কি সেই শিশুর মতন হইতে ইচ্ছা কর?

আমি যেন একটু মিষ্টান্নে ভুলিয়া না যাই, আমি যেন যথার্থ-জ্ঞানের দ্বারা—বিশুদ্ধ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হই। সেই যথার্থ জ্ঞানটি কি?

মানুষের এইটুকু বুঝা উচিত—কি বন্ধুবান্ধব, কি পদ-মর্য্যাদা, এ সমস্ত কিছুই আপনার নহে—সমস্তই পর; নিজের দেহকেও পর বলিয়া বিবেচনা করিবে। ধর্ম্মের নিয়মকেই সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে—

চক্ষের সম্মুখে রাখিবে। সে ধর্ম্মের নিয়মটি কি? তাহা এই:—যাহা কিছু বাস্তবিক আপনার তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, অন্যের জিনিসে দাবি রাখিবে না। যাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবে; * যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই তাহাতে লোভ করিবে না; যাহা তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া লওয়া হইবে, তাহা তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সহজে ছাড়িয়া দিবে; যে কয়েক দিনের জন্য ভোগ করিতে পাইয়াছ, তজ্জন্য প্রদাতাকে ধন্যবাদ করিবে।

৪। হতভাগ্য মনুষ্য! যাহা প্রতিদিন দেখিতেছ তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নহ? এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই সমুদ্র, এই পৃথিবী,—ইহাদের অপেক্ষা মহৎ অথবা বৃহৎ দ্রষ্টব্য পদার্থ আর কি আছে? যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে শাসন করিতেছেন, তিনি তোমার হৃদয়ে আছেন, তাঁহার পথের যদি তুমি পথিক হও, তাহা হইলে ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমার কি আর আস্থা থাকে? আবার যখন, সেই চন্দ্র সূর্য্যকেও তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন তুমি কি করিবে?—শিশুর ন্যায় বসিয়া বসিয়া শুধু কি ক্রন্দন করিবে? তুমি এরূপ কষ্ট পাইতেছ কেন? যথার্থ জ্ঞানের অভাবেই কষ্ট পাইতেছ—মোহ বশতই কষ্ট পাইতেছ।

৫। হে মনুষ্য! আর কিছুতেই উন্মত্ত হইও না;—শুধু শান্তির জন্য, মুক্তির জন্য, মহত্ত্বের জন্য উন্মত্ত হও। দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হও। ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া, সাহস পূর্ব্বক এই কথা বল:—

"এখন হইতে প্রভো, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার প্রতি বিধান কর; তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও তাহাই ইচ্ছা;—আমি তোমারি। তোমার যাহা ভাল মনে হয়, আমি তাহা কখনই পরিত্যাগ করিব না; যেখানে ইচ্ছা তুমি আমাকে লইয়া যাও, যেরূপ সজ্জায় আমাকে সজ্জিত করিতে চাহ, সেইরূপ সজ্জাতেই আমাকে সজ্জিত কর। তোমার কি ইচ্ছা, আমি প্রভুত্ব করি, কিংবা সামান্য লোকের মত থাকি, কিংবা গৃহে অবস্থান করি, কিংবা নির্ব্বাসিত হই, কিংবা দারিদ্র্য ভোগ করি, কিংবা ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করি? যাহা তুমি বিধান করিবে, তাহাই আমি লোকের নিকট সমর্থন করিব, তাহাই উপাদেয় বলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিপাদন করিব"।

অতএব, যাহা তোমার পক্ষে বাস্তবিক অমঙ্গল, তাহাই মন হইতে দূর করিয়া দেও। দুঃখ, ভয়, লোভ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, বিলাসিতা, ভোগাভিলাষ—এই সমস্ত মন হইতে অপসারিত কর। কিন্তু যতক্ষণ তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির না রাখিবে—তাঁহার দ্বারা পরিচালিত না হইবে—তাঁহার পদে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন না করিবে, ততক্ষণ ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি তোমার মন হইতে কিছুতেই দূর হইবে না। এ ছাড়া তুমি যদি অন্য পথে যাও, তোমা অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি আসিয়া তোমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে; চিরকাল তুমি বাহিরে বাহিরে সুখ-সৌভাগ্য অন্বেষণ করিবে, অথচ কস্মিন কালেও তাহা পাইবে না। কেননা, তুমি সেইখানে উহা অন্বেষণ করিতেছ যেখানে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এবং সেইখানে অন্বেষণ

* মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং—উপনিষৎ।

করিতে উপেক্ষা করিতেছ যেখানে উহা বাস্তবিকই আছে।

সংবাদ।

গত ৩ জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সমাহিত হইয়াছিল। তিনি জীবদ্দশায় যে গৃহে যে আসনে বসিতেন সেই গৃহে সেই আসনের সম্মুখে তাঁহার ব্যবহার্য্য বস্তু সকল সুসজ্জিত রাখা হইয়াছিল। ভক্তিভাজন বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি দেবের একান্ত প্রিয় হাফেজ হইতে কএকটা কবিতা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। হা! গত বৎসর ঐ গৃহে তাঁহার সমস্ত পরিবার তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মহা আনন্দে এই উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন আজ তিনি কোথায়!

১৮২৬ শকের অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি-স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	৬৲
„ „ সতীশচন্দ্র মল্লিক	ঐ	৩৲
শ্রীমতী ইন্দুলেখা রায়	চট্টগ্রাম	৩৷৵৹
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	বেহালা	১৷৹
„ „ অন্নদাপ্রসাদ সরকার	ভবানীপুর	৩৷৵৹
„ „ দেবেন্দ্রনাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
„ „ লালবিহারী বড়াল	হুগলী	৩৷৵৹
„ „ তুলসীদাস দত্ত	কালীঘাট	৩৷৵৹
„ „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	চৌহাটা	৩৷৵৹
„ „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পাণ্ডুয়া	৩৷৵৹
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী	দেবানন্দপুর	৬৷৹
শ্রীযুক্ত বাবু যাদবকৃষ্ণ দাস	কলিকাতা	৩৲
„ „ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
„ „ এইচ, সি, মল্লিক এস্কোয়ার	ঐ	৩৷৵৹
„ „ মহেন্দ্রনাথ সেন	ডিব্রুগড়	৩৷৵৹

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭৫।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৬৪৪॥ ৯
সমষ্টি	...	২০৩৯৸৵৩
ব্যয়	...	৩৭৬৸৵৬
স্থিত	...	১৬৬২৸৶৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১৬২৸৶৯

১৬৬২৸৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২২৪॥ ৬

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
৯৲

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর
১৫৲

অন্যান্য বাবতে প্রাপ্ত ৬॥

২২৪॥ ৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা … ৩০॥/০
পুস্তকালয় … ১।০
যন্ত্রালয় … ১২৭৲
গচ্ছিত ৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের
মূলধন ৭॥০

সমষ্টি … ৩৯৫।/৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … ২৭৭৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা … ১৮॥৶৩
পুস্তকালয় … ৮৯
যন্ত্রালয় … ৬৭৶৩
গচ্ছিত … ২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের
মূলধন ১১৩

সমষ্টি … ৩৭৬৮৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় … ৩৪৪।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত … ১৬৬২৮৵৯

সমষ্টি … ২০০৭।৵৯
ব্যয় … ৩৪৩॥/৯

স্থিত … ১৬৬৩৮/০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
তুইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১৬৩৮/০

১৬৬৩৮/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … ২০৪৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী সৌদামনী দেবী
২৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
২৲

২০৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা … ১০৲
পুস্তকালয় … ৩৮/০
যন্ত্রালয় … ১১২৵০
গচ্ছিত … ৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন … ২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের
মূলধন ৭॥০

সমষ্টি … ৩৪৪।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … ১৯৫॥/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা … ৩৯৶৯
পুস্তকালয় … ২৮/৬
যন্ত্রালয় … ৯৮।৵৬
গচ্ছিত … ২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের
মূলধন ৫॥৯

সমষ্টি … ৩৪৪॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

[illegible] সংখ্যা ১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০৬। ২ ভাদ্র শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সম্মুখে দুর্গোৎসব, এই সময়ে কর্ম্মচারীগণের বেতনাদি হিসাবে সমস্ত চুকাইয়া দিতে হইবে তন্নিমিত্ত কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এতকাল জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ-দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ২৮এ আষাঢ়, বুধবার।

কোমলহৃদয়তা।

আমাদের ব্যবহারে যাহা কিছু পীড়াদায়ক এক কোমলহৃদয়তাই তাহাকে সংশোধন করে। কোমল স্বভাবই সতত দয়ার সহিত সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য যত্নশীল থাকে। সুতরাং ইহার কার্য্য অতি বিস্তীর্ণ। কোন বিশেষ ঘটনা বা অকস্মাৎ বিপৎপাতের সময় মনুষ্যের কোন কোন সদ্‌গুণের উদ্দীপন হইয়া থাকে, ইহা কিন্তু সে প্রকৃতির নহে। যতক্ষণ আমরা মনুষ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করি, ততক্ষণই ইহার কার্য্য চলিতে থাকে। আমাদের আলাপ ও সম্ভাষণকে নিয়মিত করিয়া ইহা সমস্ত ব্যবহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দেবদত্ত ধর্ম্মের সহিত যেন কৃত্রিম শিষ্টাচারকে এক করিয়া না বুঝি। গাম্ভীর্য্যহীন অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিরও ইহা থাকিতে পারে। ধূর্ত্তেরা সর্ব্বদাই এই জাল বিস্তার করে। কঠিনহৃদয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি স্বীয় নীচান্তঃকরণ ঢাকিবার জন্য ইহা ব্যবহার করে। সমাজকে আয়ত্ত করিবার জন্য অন্ততঃ বাহ্য শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রকৃত কোমলহৃদয়তার সার্ব্বভৌমিক শক্তি আছে। প্রকৃত কোমল হৃদয়তার অভাবে লোকে ইহার ছায়ারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রকৃত শিষ্টাচারের আদর্শকে লোকে কৃত্রিম শিষ্টাচারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু সংসারে যিনি যশস্বী হইতে বা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে চান, তিনি যেন বিনয় বচন, সরল ও সদয় ব্যবহার এবং নম্রতা অভ্যাস করেন। এই কোমল ভাব ধার্ম্মিকের স্বভাবসিদ্ধ। ইহার আবাসভূমি আমাদের হৃদয়ে। হৃদয় হইতে উৎপন্ন না হইলে বাহিরের প্রদর্শিত শিষ্টাচার তৃপ্তিকর হয় না। কৃত্রিম শিষ্টাচার সকল সময়ে চরিত্র গোপন করিতে পারে না। সেই অকৃত্রিম শিষ্টাচার যাহা শান্তহৃদয় হইতে উৎপন্ন, তাহার সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র। নিপুণরূপে অভ্যস্ত শিষ্টাচার হইতে প্রকৃত শিষ্টাচার অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে এ প্রকার কোমল ভাব, ধর্ম্ম বা মঙ্গলের বিশেষ সহা-

য়তা করে না। ইহা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কার্য্যেই লাগিয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে তাঁহারা উপেক্ষা করেন বটে, কিন্তু বড় বড় লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ আছে। যখনি উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহারা মনুষ্যের উপকার করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ উপকার করিবার অবসর অতি অল্পই উপস্থিত হইয়া থাকে। হয় ত তাঁহাদের জীবনের অবস্থা ও পদ, তাঁহাদিগকে এপ্রকার অবসর দিতেই পারে না। প্রধান প্রধান ঘটনার সময় প্রধান প্রধান সদ্গুণের উত্তেজনা হইতে পারে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়াই মনুষ্যজীবন সংরচিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সীমার মধ্যে অধিকাংশ মনুষ্যের সুখোপকরণ বিন্যস্ত রহিয়াছে। ধর্ম্ম আকস্মিক মহৎকার্য্য দ্বারা উপার্জ্জিত বা রক্ষিত হয় না। ইহা প্রতি দিনের অনুষ্ঠানের বিষয়। ইহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইলে অভ্যাসাধীন করিতে হয়। অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন ধূমকেতুর ন্যায় ইহার উদয় হইলে চলিবে না। কিন্তু দিবালোকের ন্যায় নিয়মিতরূপে উদয় হওয়াই ইহার কার্য্য। যে সুগন্ধি সমীরণ কখন কখন আমাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে, ইহা তাহার মত নহে। সচরাচর যে বায়ু বহমান থাকিয়া আকাশকে পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ করে ইহা সেই প্রকার। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে পারে, তথাপি বৃহৎ উপকার করিবার অবসর নাও আসিতে পারে। কিন্তু এমন দিন কখনই আইসে না, যে দিন কোমলহৃদয়তা সংসারের গৃহস্থলির মধ্যে সুখবর্দ্ধন ও স্বীয় আত্মার ধর্ম্মকে দ্রঢ়িষ্ঠ করিতে না পারে। আর উপযুক্ত সময়ে হৃদয়ের কোমল ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে গুরুতর উপকারজনক কার্য্য না করিয়াও লোকের সুখলাভের উপায় করিয়া দিতে পারা যায়। মনুষ্য জীবনে এমন অবস্থা আইসে যখন সহাস্য উৎসাহজনক সাদর বিনয়নম্র ব্যবহার, এবং সমবেদনাসূচক দৃষ্টি বহুল দানাপেক্ষা হৃদয়ে শান্তি দান করে। অপর পক্ষে দাতা যদি কঠোর গর্ব্বের সহিত দান করেন, তবে তাঁহার দানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। হয় এই যাহাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা করি তাহাদের হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করিয়া দিই। পৃথিবীতে সুখবর্দ্ধনে যার এত শক্তি, সে কোমল ভাবকে কি সামন্য ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়? বাস্তবিক কোমলতাই পরস্পরের সুখবর্দ্ধনের একমাত্র উপায়। বিভিন্ন স্বার্থরক্ষার সময়েও ইহা বিবাদের উপশম করিয়া দেয়। এবং মিলনের বীজ সমূহকে সজীব রাখিতে ক্ষমবান্ হয়। ইহা শত্রুতাকে প্রশমিত ও স্নেহকে নবীভূত করে। ইহা দ্বারাই পরস্পরের মুখাবলোকন করিবা মাত্রই, মনে হর্ষোদয় হয়। পৃথিবী হইতে এই কোমল ভাবকে নির্ব্বাসিত কর, মনে কর এই পৃথিবীতে কঠোর বিবাদপ্রিয় লোক ভিন্ন আর কেহই নাই, তাহা হইলে জনসমাজের অবস্থা কিরূপ প্রতীয়মান হইবে? ভীষণ নির্জ্জন অরণ্যও কি তাহা অপেক্ষা আদরণীয় নহে? অন্ধকারাবৃত গিরিগুহা—যথায় ভূগর্ভস্থ বায়ু উদ্গীরিত হইতেছে, সেই গর্ত্ত যথায় সর্প সকল গর্জ্জন করিতেছে, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল চীৎকার করিতেছে; এই সকলই কি সেই জনসমাজের প্রতিরূপ নহে? আশ্চর্য্য এই মনুষ্যের যখন একই সাধারণ স্বার্থ তখন কেমন

করিয়া তাহারা ইহার বিলোপে প্রবৃত্ত হয়? প্রকৃতি কি যথেষ্ট পরিমাণে অপরিহার্য্য দুঃখ দানে ক্ষান্ত রহিয়াছে, যে আমরা আবার পরস্পর বিবাদ করিয়া অশান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই? যদি কর্ত্তব্য-বোধ ও জনসাধারণের সুখ-বর্দ্ধন তোমাকে উদ্বোধিত করিতে না পারে, তবে নিজের স্বার্থের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর। সাধু লোক যে কোন উদ্দেশ্যই সংসিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করুন, কোমলহৃদয়তা তাঁহার সহায়তা করিবেই করিবে। ইহা প্রত্যেক হৃদয়কে আকর্ষণ ও স্বপক্ষে অনুকূল করিতে পারে। যখন যুক্তি তর্ক পরাস্ত হয়, এই নম্রহৃদয়ই মনুষ্যকে কার্য্য-বিশেষে প্রবৃত্ত করিতে ক্ষমবান্ হয়। ইহাই উগ্রস্বভাব ব্যক্তিকে নিরস্ত্র ও নিরঙ্কুশ হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে পারে। আর কঠোরতা শত্রুকে দমন করিতে না পারিয়া বরং তাহাকে আরো চিরশত্রু করিয়া তুলে। এবং নিরপেক্ষ উদাসীনকেও শত্রু-রূপে পরিণত করে। স্বার্থের ঘাত-প্রতি-ঘাতে প্রপীড়িত ব্যক্তিও ক্ষমাবান্ হইলে ক্রোধশূন্য থাকিতে পারেন। শান্তপ্রকৃতি লোকের আরো অপরাপর সদ্গুণ আছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। মনের উচ্চ-তম সদ্গুণ সমূহকে আমরা বহুদূর হইতে গণনা করিয়া থাকি। ইহাদের সহিত অসদাচরণ সংমিলিত হইলে, আমরা ভক্তি-শূন্য হইয়া তাহাদের প্রশংসা করি। তাহারা অতি দূরস্থ নক্ষত্রের ন্যায়। তাহাদের মঙ্গল কিরণ আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না। অপর পক্ষে সকলেই একটু না একটু কোমলহৃদয়তার শক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। এবং সেইজন্য সকলেই ইহাকে ভালবাসে। এইপ্রকার চরিত্রের লোক সংসারে শীঘ্রই সহজে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। এবং কাহারও বিদ্বেষ-ভাজন না হইয়া ভাগ্যবান্ হন। তাঁহার দুর্ভাগ্যে সকলেই দুঃখিত হয়। তাঁহার দোষ সকলেই মার্জ্জনা করিয়া থাকে। আমাদের বাহিরের অবস্থার উপর ইহার প্রভাব যেমনই হউক, মনের আনন্দভোগে ইহার শক্তি অব্যর্থ ও অতি প্রবল। ইহাই প্রত্যেক আনন্দদায়ক মনোবৃত্তির একমাত্র উত্তেজক। মন এই পরিষ্কৃত গগনে বিচ-রণ করিতে ভালবাসে। ইহাই মনের প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণ। যখন দয়া ও কোম-লতা অন্তরে বিরাজ করে, তখন বাহির হইতে কোন কিছু আসিয়া আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। তখন সকল লোক ও সকল ঘটনাকে আমরা অনুকূল নয়নে দৃষ্টি করি। কিন্তু যদি একবার বিরক্তির মেঘ মনে উদিত হয়, তবে সমুদায় অনুকূল দৃশ্যই অন্তর্হিত হইয়া যায়। বোধ হয় যেন সমস্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হইয়াছে। এবং চক্ষে সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণবর্ণ রূপে প্রতি-ভাত হইতেছে। প্রশান্ত মন স্থির সমুদ্রের ন্যায়। ইহাতে বস্তুমাত্রের রূপ যথাযথ রূপে প্রতিফলিত হয়। উগ্র স্বভাব, আলোড়িত বারিরাশির ন্যায়; ইহাতে বস্তুর রূপ বিকৃত হইয়া পতিত হয়। তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র যেমন শীঘ্র নিস্তরঙ্গ হইয়া যায়, সাধু লোকের ক্রোধ তেমনি শীঘ্র উপশমিত হইয়া যায়। যদি কেহ তাঁহার অত্যন্ত অপকার করে, তাহা হইলে তিনি কর্ত্তব্যবোধে মনুষ্যোচিত আত্মরক্ষাই করেন। সামান্য সামান্য অপরাধ যদ্দারা জনসাধারণ উত্তেজিত হয়, তাহা তাঁহাকে বিচ-লিত করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার দিন সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বলতা, অসাবধানের ভ্রম, নির্ব্বোধের নির্ব্বুদ্ধিতা, চলচিত্তের চাঞ্চল্য মার্জ্জনা করিয়া তিনি দেবমন্দির-সদৃশ স্বীয় প্রশান্ত

হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। এইরূপেই তাঁহার জীবনপ্রবাহ ধীরে ধীরে বহিতে থাকে।

কিছুমাত্র পক্ষপাত না করিয়া নিজ চরিত্র আলোচনা কর। এবং আপনার দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া, পরের দোষ মার্জ্জনা কর। অহঙ্কারই পৃথিবীকে কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ করিয়াছে। আত্মগৌরবের পূর্ণতায়, আমরা যে কি, তাহা বিস্মৃত হইয়া যাই। সুতরাং স্বীয় প্রাপ্যেরও অধিক আমরা লোকের নিকট পাইতে অধিকারী বিবেচনা করি। আমরা অপরাধীর প্রতি খড়্গহস্ত হই, যেন নিজে কখন কাহার নিকটে অপরাধ করি নাই। আমরা পরের দুঃখ দেখিলে দুঃখ বোধ করি না, যেন দুঃখ কাহাকে বলে কখন অনুভব করি নাই। অহঙ্কারের উচ্চাকাশ হইতে যেন আমরা আমাদের সমযোগ্য নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিতে শিক্ষা করি। ঈশ্বর যে, সকল মনুষ্যকেই সমান করিয়াছেন এবং সকলেরই যে দুর্ব্বলতা আছে, এ কথা যেন আমরা বুঝিতে পারি। স্বাভাবিক সমতা ও মানবীয় দুর্ব্বলতা দর্শনেও যদি অন্যের প্রতি তোমার দয়ার উদ্রেক না হয়, তবে ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরের চক্ষে তুমি কি হীন পদার্থ। আমরা কি সেই ক্ষমা পরস্পরকে দেখাইতে পারি না, যাহা আমরা কাতর প্রাণে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি? যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত হইতে বিবাদবিসম্বাদের সূচনা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। ক্রোধের সময় আমরা বস্তুর বিকৃতরূপই দর্শন করি। অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সম্মানকেও বৃহৎ করিয়া বুঝি। সামান্য আক্রমণকেও আসন্ন মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্রোধ পড়িয়া গেলে আশঙ্কিত অপরাধের বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাই না। যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ আমাদের চঞ্চল কল্পনা গঠন করিয়াছিল, তাহা একবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিবাদের কারণ সংকুচিত হইলেও তাহার ফল রহিয়া যায়। তখন বন্ধু আর বন্ধু নাই, শত্রু চিরশত্রু হইয়াছে। তখন আমরা ভবিষ্যৎ সংশয়, বিদ্বেষ ও বিরক্তির বীজ বপন করিয়া ফেলিয়াছি। অতএব যখনি বিবাদের কারণ উপস্থিত হইবে, তখনি মুহূর্ত্তের জন্যও ক্রোধ সম্বরণ করিও। ভাবিও ইহা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। ক্রোধোন্মত্ত হইলে যে কিছুই লাভ নাই, এবং জীবনের কতখানি সুখ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ তাহাও বিচার করিয়া দেখিও। বিবাদের লবণাক্ত স্রোত সহজেই ক্ষুদ্র চিড় হইতে বহির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথায় তাহাদের পরিণতি তাহা কেহই পূর্ব্বে দেখিতে পায় না। এবং যে ব্যক্তি ইহাকে প্রথমে প্রবাহিত হইতে দেয়, সে তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে এই বিনয়ের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস রাখিও। পৃথিবীকে গম্যস্থানের পান্থশালা বলিয়া বিবেচনা করিও। মনে কর, ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে তুমি তোমার অনন্ত জীবনরূপ নাট্যাংশের অভিনয় করিতেছ। এ প্রকার উন্নত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইলেই হৃদয় নিশ্চয়ই প্রশান্ত হইবে। এই উন্নত উচ্চভাবরূপ পর্ব্বতশিখর হইতে পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণাকে অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইবে। স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরায়ণ অসার ব্যক্তিরাই রিপুর অধীন হয়। পৃথিবী তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে; কত দিকে কত বস্তু, ও কত লোককে তাহারা এমন ভাবে ধরিয়া রহিয়াছে যে তাহারা নিয়ত আহত হইতেছে ও আঘাত করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মভাব আমাদিগকে এই সকল বিরক্তিকর পার্থিব

পদার্থ হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে পারে। প্রকৃত ধর্ম্মভাব পৃথিবীর সহিত আমাদের ততটুকু সংযোগ রক্ষা করে—যতটুকুতে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারি। ইহা উদার ভাবের জনয়িতা। আর এই উদার ভাব হইতেই কোমলতা ও বিনয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। নম্রতা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে আমরা অপরাধীকে কৃপাচক্ষে দেখিয়া থাকি, ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় তাহাদের দোষ দেখিলে ক্রোধে অস্থির হই না। কর্ত্তব্যসাধন ও সুখবর্দ্ধনের জন্য নম্রভাব পোষণ করিতে যেন যত্নবান্ হই। ইহা সকল বয়স ও সকল অবস্থার অলঙ্কারস্বরূপ। ইহা যৌবনের ঔদ্ধত্য ও বার্দ্ধক্যের কঠোরতাকে প্রশমিত করিতে পারে। ইহা প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব ও ভৃত্যের ভক্তি বৃদ্ধি করে। উপসংহারে বলিতেছি যেন কৃত্রিম শিষ্টাচারকে প্রকৃত বিনয় বলিয়া ভ্রম না হয়। কৃত্রিম শিষ্টাচার অনেক সময়ে অনেক কঠোরতা গোপন করে। আমাদের কোমলহৃদয়তা যেন ঈশ্বরপ্রেম হইতে উত্থিত হয়। সরলতা, ন্যায় এবং সত্যের সহিত যেন আমাদের কোমল হৃদয় সংযুক্ত থাকে।

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রেমে আমাদের হৃদয়কে অভিষিক্ত কর। আমাদের কঠিন হৃদয়কে পুষ্পবৎ কোমল কর। পরের দুঃখে যেন দুঃখ অনুভব করিতে পারি, পরের সুখে যেন সুখী হই। এ দুঃখময় সংসারে আসিয়া যেন কাহার চক্ষের জল আকর্ষণ না করি। হে পরমেশ্বর! আমাদের কোমল হৃদয়কে তুমি উজ্জ্বল কর, তুমি ইহাতে বাস কর। তোমাকে ইহাতে দেখিতে দেখিতেই যেন আমাদের জীবন অবসান হয়। এই আমাদের ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মদান।

মধ্যাহ্নে ঘিরিয়াছিল খররবিদাহ
আঁধারিয়া ক্ষণপরে এল বারিবাহ,—
সরস অমৃত-ধারা বক্ষ-মাঝে চাপি
রসের আবেশখানি রেখেছিল ঝাঁপি।
আচম্বিতে কোথা হতে অহঙ্কারে ফুলি'
এল বায়ু বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ-অসি তুলি';
অমনি উদার বক্ষ মেলি' দিয়া তার
বরষিল তপ্ত-বুকে অমৃতের ধার।
তেমনি যখন রসে ভরে যায় প্রাণ
জানি না কেমনে তারে করা যায় দান।
হেনকালে আসে যদি আবেগ-ঝটিকা
হানে প্রাণে বেদনার বিদ্যুতের শিখা;
অমনি সে বিগলিত প্রেম-রস-ধারা
অবিরাম বহে, মোরে করে আত্মহারা।

সার সত্যের আলোচনা।

পুরাণ-কাহিনী।

বিগত প্রবন্ধে এই একটি কথা রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছিল যে, কাণ্টের দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ কথা সত্য—কিন্তু তথাপি বাস্তবিক-সত্তা সেই যজ্ঞের সভামণ্ডপে অনাহূতা উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার স্বামীকে ছাড়িয়া একাকিনী। বাস্তবিক-সত্তা'র স্বামী কে? না কাণ্ট্ যাহাকে বলেন—thing-in-itself স্বয়ংবস্তু। বাস্তবিক-সত্তা স্বয়ংবস্তুকে ছাড়িয়া সংবিতের যোগাত্মক-একতা-বেশে যজ্ঞ ভবনে প্রবেশ করিলেন। এই যে বস্তুবিরহিতা বাস্তবিক-সত্তা, ইনি আপনাতে আপনি নাই। সভার মাঝখানে বাস্তবিক-সত্তা'র প্রাণসংশয় উপস্থিত;—কাজেই কাণ্ট্ সংশয়বাদী। মৌলিক পদার্থসকলের মাঝখান হইতে কাণ্ট্ স্বয়ংবস্তুকে সরাইয়া

দিয়াছেন—তাহা তিনি দি'ন্—কিন্তু আপনার মন হইতে একতিলও সরাইয়া দিতে পারেন নাই। কাণ্ট্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বয়ংবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না এইজন্য, যেহেতু তাহা করিলে এইরূপ একটা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া-রকমের অসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে। তার সাক্ষী—This proves no doubt that all speculative knowledge is limited to objects of experience; but it should he carefully borne in mind that this leaves it perfectly open to us to think the same objects as things by themselves, though we cannot know them. For otherwise we should arrive at the absurd conclusion that there is phenomenal appearance without something that appears.

ইহার বাংলা।

"এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তাসম্ভূত সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের গণ্ডি'র মধ্যে আবদ্ধ; এটা কিন্তু সাবধানে মনে রাখা চাই যে, সে-সব বস্তু'র বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানে জানিতে পারা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাহা মনে ভাবিতে পারিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। কেন না, পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের উপলব্ধিকালে যদি তাহাদের বাস্তবিক-সত্তা মনেও ভাবা না যায়, তবে তাহাতে ফলে দাঁড়ায় এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে।" কাণ্ট্ এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে, বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানের অগম্য হইলেও তাহাকে মনে না ভাবিলেই নয়—এ কথাটার মধ্যে প্রধান একটি দোষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই যে, যেন জ্ঞানের অগম্য পদার্থকেও মনে ভাবিতে পারা সম্ভবে। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তাকে কাণ্ট্ ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন; অথচ, জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা'র প্রতি তিনি পরাঙ্মুখ। জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা হ'চ্ছেন সেই বাস্তবিক-সত্তা, যিনি স্বয়ংবস্তুর সহিত (thing in-itself এর) সহিত একাসনে উপবিষ্টা। রূপকটিকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলি—তাহা হইলেই কাণ্টের সংশয়বাদের প্রকৃত বৃত্তান্তটি আপামর সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে। কাণ্ট্ ছিলেন সর্ব্বপ্রকারে স্বকার্য্যে দক্ষ। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তা তাঁহার চিন্তার উদ্ভাবনা—একপ্রকার মানসকন্যা। বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সেই যে মানসকন্যা সতী, তাঁহার পতি হ'চ্চেন স্বয়ংবস্তু। তাঁহার পিতার নিকটে (কাণ্টের নিকটে) তিনি মনে-ভাবা; পতির নিকটে (স্বয়ংবস্তুর নিকটে) জ্ঞানে-জানা। সেই বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতী সংবিতের একতাবেশে পদার্থসভার মাঝখানে (category-দিগের মাঝখানে) অনাহূতা আসিয়া উপস্থিত; পুষ্পকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া সৌরভ যেন চলিয়া আসিল পদব্রজে একাকী। কাণ্ট্ বলেন, সংবিতের একতা বস্তুশূন্যা হইলেও—যোগাত্মিকা; তাঁহার ত্রিনেত্র রহিয়াছে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে উন্মীলিত। পক্ষান্তরে স্বয়ংবস্তু (thing-in-itself) নিতান্তই দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য ভোলা। ঢুলঢুলুচক্ষে আছেন তিনি ভালো জনশূন্য শ্মশানে বা অগম্য কৈলাসশিখরে—সেইখানেই থাকুন্। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভার মাঝখানে বসানো হইতে পারে না। কাণ্টের পুরাণ-কাহিনী এ-যেমন একটি—এই তেম্নি আর-একটিঃ—কালী (অর্থাৎ কালের মুহূর্ত্তপরম্পরা) নৃত্য করিতেছেন (কিনা ভাঙিতেছেন-গড়িতেছেন) যোগিনী সমভিব্যাহারে [কিনা যোজনা-

শক্তিকে (Synthesisকে) সঙ্গে করিয়া]। কালীর স্বামী যিনি (অর্থাৎ কালের ভিত্তি-মূল যিনি) শঙ্কর মহাকাল (Eternity),তিনি মৃতবৎ পড়িয়া আছেন পদতলে। কালীর বিচিত্রলীলা'র সহিত মহাকালের যেন কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ দোঁহে দোঁহার অর্দ্ধাঙ্গ। কান্টের পুরাণে, যোজনাশক্তি-সমভিব্যাহারিণী সংবিতের সহিত স্বয়ংবস্তু'র (thing-in-itselfএর) কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ উভয়ে পরস্পরের এপিট-ওপিট।

পূর্ণাঙ্গ সত্য।

এই সকল ভেদবুদ্ধি সংশয়বাদের গোড়া'র কথা। প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা আমরা বহুপূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; পাঠককে তাহা আরেকবার স্মরণ করাইয়া দিই :—

সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ (বা জ্ঞান), এ তিনটি মৌলিক পদার্থ এরূপ হরিহরব্রহ্মা যে, তিনের কোনোটি অপর-দুইটির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালও একাকী থাকিতে পারে না—যেমন কাগজের এপিট-ওপিট এবং স্থূলতা। এপিট যেমন ওপিটের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, ভাতি তেমনি অস্তি'র সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না। স্থূলতা যেমন এপিট ওপিটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, শক্তি তেমনি অস্তি-ভাতির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না। শুধুই কেবল সত্তা নহে, শুধুই কেবল শক্তি নহে, শুধুই কেবল প্রকাশ নহে; পরন্তু অনুলোমক্রমে সত্তা হইতে শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পর্য্যন্ত এবং প্রতিলোম-ক্রমে প্রকাশ হইতে শক্তির মধ্য দিয়া সত্তা পর্য্যন্ত—সবটা লইয়া এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্য নিত্য-বর্ত্তমান। সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, এই তিনটি মৌলিক-পদার্থের একাত্মভাবের কথা এ যাহা বলিতেছি, এ কথার যাথার্থ্য একদিকে আমরা বিস্পষ্টভাবে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, আর-এক দিকে সংক্ষিপ্তভাবে হাতের কাছে দেখিতে পাই। বিস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে, সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে। এখনকার কালের নূতন নূতন বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ব্রহ্মাণ্ডের অনেকানেক নিগূঢ় তত্ত্ব অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এখনো চক্ষু ফোটে নাই—যদিচ পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের এই দীন হীন-মলিন হতশ্রীক দেশের ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সেই বিষয়টির রীতিমত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহারি মধ্যে কতকগুলি অভাবিতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছেন। সে বিষয়টি সংক্ষেপে এই :—

যাহা বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে; যাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহে দোঁহার পর নহে—পরন্তু একেরই এপিট-ওপিট। খুব সংক্ষেপে বলিলাম;—শুনিবামাত্রই অনেকে অনেকপ্রকার ভুল বুঝিতে পারেন। অতএব তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রতিলোমক্রম কিরূপ; (২) বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রতিলোম-

ক্রম কিরূপ; (৩) উভয়ের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ; এই তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আর-কিছু না—জীবাত্মা। জীবাত্মা এক বটে, কিন্তু তিন লইয়া এক—(১) আত্মসত্তা, (২) আত্মশক্তি এবং (৩) আত্মজ্ঞান, এই তিন লইয়া এক। পাশ্চাত্য দর্শনের আদিগুরু বলিয়াছেন—"আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি।" দেকর্ত্তার এই মূলবচনটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, যেমন দূর হইতে তরঙ্গক্রীড়া দেখিলে সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিন্তা'র প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে আত্মার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। তা বই, উহার অর্থ কেহ যদি এরূপ বোঝেন যে, চিন্তার উপরেই আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তরঙ্গক্রীড়ার উপরেও সমুদ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে না—চিন্তার উপরেও আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোনো মনুষ্যই চিন্তা করিয়া পৃথিবীতে আসেন নাই, চিন্তা করিয়া বাঁচিয়া থাকেন না, চিন্তা করিয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হ'ন না। "আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি"—এ কথাটির অর্থ শুদ্ধকেবল এই যে, চিন্তাতে আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তিতে আত্মসত্তা অভিব্যক্ত হয়। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, এই তিনের কোনোটি অপর দুইটিকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনকারেরা সাক্ষাৎ-উপলব্ধিকে খাটো করিয়া চিন্তাকে বেশীমাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাঁহাদের কথা-বার্ত্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কাণ্ট্ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ-উপলব্ধি ব্যতিরেকে চিন্তা ফাঁকা। কিন্তু হইলে কি হয়—তিনিও ইউরোপীয় ভেদদৃষ্টির কঠিন বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনিও ভাবিতেছি'র মুলুকেই আটক পড়িয়া রহিয়া সংশয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছেন—জানিতেছি'র মুলুকে পৌঁছিতে পারেন নাই। দেকর্ত্তা যে জায়গায় বলিয়াছেন যে, "আমি ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি," আমাদের দেশের একজন গ্রন্থকার সেই জায়গায় বলিয়াছেন—"আমি জানিতেছি, অতএব আমি আছি।"

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সংশয়, জ্ঞানসাধনের প্রথম সোপান, তাহাতে আর ভুল নাই—কিন্তু তাহাই কিছু আর জ্ঞানের সারসর্ব্বস্ব নহে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে মনে হয় যে, সমুদ্র তরঙ্গেরই ক্রীড়াক্ষেত্র; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দিলে সে ভুল অচিরে ঘুচিয়া যায়; তখন মনে হয় যে, সমুদ্র প্রশান্তির আলয়। "আমি আছি"—এই প্রশান্ত জ্ঞানটি আত্মার গভীরে নিরন্তর জাগিতেছে—তাহাই আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষপ্রমাণ; তদ্ব্যতীত, আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য ভাবিতেছি'কে সাক্ষী মান্য করা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ। এ একপ্রকার—সোনার গাত্রে সোনালি রঙ্ মাখানো—প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের গাত্রে গোলাপজল মাখানো। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মাকে ধ্রুবরূপে জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার তরঙ্গক্রীড়া থামানো আবশ্যক—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক। আর, আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল তাহারই প্রণালীপদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্চে সাধন-

রূপী জ্ঞানের (অর্থাৎ চিন্তা'র) মূলে যেখানে সিদ্ধরূপী জ্ঞান (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান) রহিয়াছে, সেইখানে মনকে লইয়া যাওয়া।

ইউরোপীয় দর্শনকারেরা "অসীম অসীম" করিয়া ক্রমাগতই গণ্ডগোল করেন। শেষে কলরবে ক্ষান্ত দিয়া বলেন যে, অসীমকে চিন্তা দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁহাদের জানা উচিত যে, যে-অসীমকে তাঁহারা চিন্তাদ্বারা বন্ধন করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাঁহাদের চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই ঘরে রহিয়াছে ষোল-আনা মজুদ্।

তোমার আত্মার অস্তিত্ব তো আর তোমার চিন্তার ফল নহে—তাহা তোমার চিন্তার মূল। যাহার-দৌলতে তুমি চিন্তা করিতে পারিতেছ—তাহাকে তুমি চিন্তাদ্বারা ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ; এ তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না তো আর কি? এ বিষয়ে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা বলেন, তাহা অতীব পরিষ্কার। তাঁহাদের কথা এই যে—

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে জাগাইয়া তুলিতেছে যে সাক্ষাৎজ্ঞান, সেই সাক্ষাৎজ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহা-পণ্ডিতেরা প্রজ্বলিত ইন্ধনকাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে অগ্নি ইন্ধনকে দগ্ধ করিতেছে, সেই অগ্নিকে তাঁহারা ইন্ধন দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।

আমাদের বক্তব্য কথা সংক্ষেপে এই:— আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান গোড়াতেই একীভূত রহিয়াছে। গোড়াতে আত্মা যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাই তিনি আপনি; আর, আপনার সত্তা এবং প্রকাশের মাঝখানে ইচ্ছা এবং শক্তি যাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহাও তিনি আপনি। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, সমস্ত লইয়া এক আত্মা। আত্মসত্তা চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—আত্মজ্ঞান চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশমান—আত্মশক্তি চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই স্ফূর্ত্তিমান্। যাহা চিন্তার মূলে আছে, তাহাই যদি চিন্তার ফলে দাঁড়ায়, তবেই চিন্তা সার্থক চিন্তা হয়। পক্ষান্তরে, এরূপ যদি হয় যে, চিন্তার মূলে আছে একরূপ—ফলে দাঁড়াইতেছে আর-একরূপ—তবে তাহা চিন্তার একপ্রকার কৃত্রিম কারীকরি তাহা যথার্থ ভাবের চিন্তা নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের ক্রম দুইরূপ—(১) অনুলোম এবং (২) প্রতিলোম। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে অনুলোমক্রম এইরূপ:—

প্রথমে আত্মসত্তা; তাহার পরে চিচ্ছক্তির স্ফূর্ত্তি বা চিন্তা; তাহার পরে আত্মার প্রকাশ বা আত্মজ্ঞান।

প্রতিলোকক্রমে এইরূপ:—

প্রথমে আত্মপ্রকাশের উপলব্ধি—তাহার পরে চিচ্ছক্তির উপলব্ধি, তাহার পরে আত্মসত্তার উপলব্ধি।

অনুলোম-পদ্ধতি'র পর পর সিঁড়ি'র ধাপ হচ্চে—কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম। প্রতিলোম-পদ্ধতির পর পর সিঁড়ির ধাপ হ'চ্চে—জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা। আত্মা শুদ্ধকেবল একটা ফাঁকা একত্ব নহে পরন্তু জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া, সমস্তেরই সমাধিস্থান বা কেন্দ্রস্থান; অথবা যাহা একই কথা আত্মা—সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একাধারে।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু, সমস্তই

বৃহৎব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, এটা যখন স্থির; এটা যখন স্থির যে, আমরা চিন্তা খাটাইয়া আপনার সত্তাকেও আনয়ন করি নাই, আপনার শক্তিকেও আনয়ন করি নাই, আপনার প্রকাশকেও আনয়ন করি নাই, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, তিনেরই মূলাধার বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব যেমন জীবাত্মা—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ সর্ব্বজগতের) সারসর্ব্বস্ব তেমনি পরমাত্মা। অতএব এ কথা স্বতঃ-সিদ্ধ যে, জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনেরই মূলাধার পরমাত্মা।

এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যখন আমার সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমি যেমন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমার চিন্তার বলে আমি তাহা দেখিতেছি তেমনি, আমি যখন আমার আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি, তখন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমি আমার চিন্তার বলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা আত্মাকেই উপলব্ধি করি, আর বহির্বস্তুকেই উপলব্ধি করি—সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা যে বস্তুকেই যখনই উপলব্ধি করি, তাহা ঐশ্বরিক শক্তির বলেই উপলব্ধি করি, নিজের বলে নহে। পুনশ্চ, ঐশ্বরিক শক্তির বলে যাহা কিছু আমরা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি—তাহা জাগ্রত-জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করি; পক্ষান্তরে, চিন্তাদ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি করি, তাহা সেই মূল-গ্রন্থের একপ্রকার যৎসামান্য অনুবাদ; তাহাও আবার অনেক সময়ে প্রকৃত অনুবাদ নহে—পরন্তু অপভ্রংশ। আত্মাকে যিনি যখন সাক্ষাৎ-জ্ঞানে জাগ্রত জীবন্তভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি তখন পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের যোগে জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ উপলব্ধি করেন। এরূপ সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধুকেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে—কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—যেহেতু উভয়ে পরস্পরের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত। এবারে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—বারান্তরে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

(দ্বিতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

সামগ্র্য অবস্থা হইতে (concrete নিষ্কর্ষ-অবস্থায় (abstract) স্থূলতথ্য হইতে সূক্ষ্ম-তত্ত্বে কিরূপে উপনীত হওয়া যায়?—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা উপনীত হওয়া যায়, যাহাকে সূক্ষ্মসারগ্রহ বলে,—কেবলীকরণ বলে,—(abstraction)—প্রত্যাহৃতি বলে—নিষ্কর্ষণ বলে। ইহা-ত সোজা কথা। কিন্তু এই প্রত্যাহৃতির আবার দুই প্রকার ভেদ আছে,—এক্ষণে সেই ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। মনে কর, বিশেষ-বিশেষ অনেকগুলি পদার্থ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। যে সকল লক্ষণে উহারা লক্ষণাক্রান্ত সেই সকল লক্ষণগুলিকে এক পাশে রাখিয়া, তন্মধ্যে যে লক্ষণটি উহাদের মধ্যে সাধারণ—সেই লক্ষণটিকে যখন তুমি কেবলীকৃত করিয়া অর্থাৎ অন্য

হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা কর, তখন তুমি কি কর?—না, সেই লক্ষণটিকে তুমি অন্যান্য লক্ষণ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া লও। এই প্রত্যাহৃতির প্রকৃতি ও নিয়ম একবার আলোচনা করিয়া দেখ। এই প্রত্যাহরণ-ক্রিয়া, তুলনার দ্বারা সাধিত হয়; বিবিধপ্রকার বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। একটা দৃষ্টান্ত:—বর্ণ সম্বন্ধীয় সাধারণ ও সূক্ষ্মসার (abstract) ধারণা আমাদের মনে কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই এরূপ একটা সাদা রঙের জিনিস আমার চক্ষের সম্মুখে রাখা যাক্। এই সাদা রঙের জিনিস্‌টি দেখিবামাত্রই কি সাধারণ-বর্ণ-সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মিবে? প্রথমেই কি আমি শুভ্রতাকে এক দিকে এবং বর্ণকে অপর দিকে রাখিতে সমর্থ হইব? তোমার অন্তরের মধ্যে কিরূপ প্রক্রিয়া হয় তাহা একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। উহার যে শুভ্রতা তুমি উপলব্ধি করিতেছ, ঐ শুভ্রতার মধ্যে যে নিজত্বটুকু আছে তাহা যদি উঠাইয়া লও, দেখিবে—সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি শুভ্রতাকে উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র বর্ণকে প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক পৃথক্ রাখিতে,—অর্থাৎ কেবলীকৃত করিতে, কিছুতেই সমর্থ হইবে না। কেন না, একটি মাত্র বর্ণ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, আর সেটি শুভ্রবর্ণ। তুমি যদি শুভ্রবর্ণটিকে উঠাইয়া লও, তাহা হইলে বর্ণ সম্পর্কে আর কিছুই থাকে না। এই সাদা রঙের জিনিসের পর, একটা নীল রঙের জিনিস আসুক, তার পর একটা লাল রঙের জিনিস আসুক,—ইত্যাদিক্রমে অন্যান্য রঙের জিনিস আসুক, তখন তুমি ঐ বিভিন্ন বর্ণগুলিকে উপলব্ধি করিয়া, তাহাদের বৈষম্য-সমূহকে উপেক্ষা করিতে পার; এবং উপেক্ষা করিয়া, সেই সকল চাক্ষুষ অনুভূতির মধ্যে—অর্থাৎ বর্ণগুলির মধ্যে—যাহা সাধারণ তাহাই তুমি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে পার। এইরূপেই বর্ণসম্বন্ধে তোমার একটা সূক্ষ্মসার (abstract) ও সাধারণ ধারণা জন্মে।

আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। তুমি যদি পদ্ম-ছাড়া আর কোন ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া না থাক, তাহা হইলে, গন্ধ-সম্বন্ধে তোমার কি একটা সাধারণ ধারণা জন্মিতে পারে?—না, তাহা কখনই পারে না। এস্থলে, পদ্মের গন্ধই তোমার নিকট একমাত্র গন্ধ, তাহা-ছাড়া তুমি আর কোন গন্ধ খুঁজিতে যাইবে না—আছে বলিয়া সন্দেহও করিবে না। কিন্তু যদি পদ্ম-গন্ধের পর, গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ কর, এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে—এরূপ আরো অনেক গুলি ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ কর, তবেই তাহাদের মধ্যগত সাম্য বৈষম্য উপলব্ধি করিয়া, সাধারণ গন্ধ-সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা জন্মিবে। একটা পুষ্প-গন্ধের সহিত আর একটা পুষ্প-গন্ধের সাম্য কোথায়?—উভয়ের মধ্যে সাধারণ জিনিসটি কি?—উভয় গন্ধই একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং একই ব্যক্তির দ্বারা আঘ্রাত—ইহা-ভিন্ন উহাদের মধ্যে সাধারণত্ব আর কি থাকিতে পারে? এস্থলে, সামান্যীকরণ প্রক্রিয়া—ব্যাপ্তিগ্রহ-প্রক্রিয়া (generalization) যে সম্ভব হয়—আঘ্রাণকারী পুরুষের অর্থাৎ বিষয়ীর একত্বই তাহার একমাত্র হেতু। সেই বিষয়ী স্মরণ করে—সে একই ব্যক্তি হইয়া, বিভিন্ন অনুভূতির দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াছে। বিবিধ পুষ্পের আঘ্রাণ-রূপ কতকগুলি অনুভূতি বিষয়ীর না হইলে,

বিভিন্ন বিকারের দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও, সে যে একই ব্যক্তি—এ জ্ঞান তাহার জন্মিতে পারে না; এবং আঘ্রাত বিষয়টির বিবিধ লক্ষণের মধ্যে, কোন্‌টি সদৃশ ও কোন্‌টি বিসদৃশ—সে জ্ঞানও তাহার জন্মিতে পারে না। এইরূপ স্থলে—একমাত্র এইরূপ স্থলেই,—বিষয়ী তুলনা করিয়া দেখিতে পারে, কেবলীকরণ বা সূক্ষ্মসারগ্রহ (abstraction) করিতে পারে, সামান্যীকরণ বা ব্যাপ্তিগ্রহ (generalization) করিতে পারে।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বরূপ সূক্ষ্মসারে (abstract) উপনীত হইতে হইলে এ সমস্ত ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। এস্থলে, কারণ-তত্ত্বটির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্‌। মনে কর, তুমি ছয়টি বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টান্ত-হইতে, কারণ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছ। কিন্তু তুমি যদি শুধু একটা দৃষ্টান্ত-হইতে এই তত্ত্বটি উদ্ধার করিতে, তাহা হইলেও ফলের কোন তারতম্য হইত না। কোন দৃষ্ট কার্য্যের কোন অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে—এই কথা বলিবার জন্য, অনেকগুলি ঘটনা-পারম্পর্য্য দর্শনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নাই। এই যে কার্য্যকারণের সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হইয়াছি, তাহার মূলতত্ত্বটি যেমন প্রথম দৃষ্টান্তে—সেইরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেও সমগ্র ভাবে বিদ্যমান। এই তত্ত্বটির বিষয়গত পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু আমার অন্তরে, ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সংখ্যা অনুসারে, ইহার হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। আমাদের সম্বন্ধে ইহার যদি কোন ইতর-বিশেষ হয়, তাহা এইজন্যই হয় যে, উহাকে লক্ষ্য না করিয়াই আমরা উহার প্রয়োগ করি, অথবা উহাকে বিযুক্ত না করিয়াই উহাকে লক্ষ্য করি, অথবা উহার বিশেষ প্রয়োগ-স্থল হইতে উহাকে বিযুক্ত করি না। যাহা কিছু ঘটিতে আরম্ভ হয়, তাহারি একটা অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে—এই তত্ত্বটি অব্যবহিত ভাবে, সূক্ষ্মভাবে, সাধারণ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, যে বিশেষ-আকারে ঘটনাটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়, শুধু তাহার সেই বিশেষ ভাবটুকু বাদ দিলেই, উহা উপলব্ধি করা যায়। তা, সেই ঘটনা—পত্রের পতনই হোক্‌, অথবা নরহত্যাই হোক্‌—তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। এস্থলে, আমি যে সূক্ষ্মসার ও সাধারণ ধারণায় উপনীত হই, তাহার কারণ ইহা নহে যে আমি সেই সম্বন্ধেই একই ব্যক্তি ছিলাম কিংবা অনেকগুলি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাবে উপরঞ্জিত হইয়াছিলাম। মনে কর, একটা পাতা পড়িল:—তখনি আমার মনে হইল—আমার বিশ্বাস হইল—আমি বলিয়া উঠিলাম: এই পতনের একটা কারণ আছে। মনে কর, একটা নরহত্যা হইয়াছে: অমনি আমি বিশ্বাস করিলাম, বলিয়া উঠিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের একটা কারণ আছে। উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা—কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা আছে এবং তা ছাড়া এমনও কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক—যাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রতীতিটি এই যে, ঐ উভয় ঘটনারই কোন কারণ না থাকা অসম্ভব। এস্থলে, যেমন আমরা প্রথম ঘটনাটি-সম্বন্ধে, বিশেষ-হইতে সার্ব্বভৌমিককে বিযুক্ত করিতে পারি, সেইরূপ দ্বিতীয় ঘটনাটি-সম্বন্ধেও আমরা পারি। কেন না, দ্বিতীয়টির মধ্যে যে সার্ব্বভৌমিকতা আছে, সেই সার্ব্বভৌমিকতা প্রথমটির মধ্যেও আছে। ফলতঃ, যদি প্রথম ঘটনাটির মধ্যে

সার্ব্বভৌমিকতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদিক্রমে সহস্র ঘটনার মধ্যেও সেই সার্ব্বভৌমিকতা থাকিবে না। কেন না, অনন্তের নিকট—নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমিকতার নিকট—এক সংখ্যা সহস্র সংখ্যা হইতে কিছুমাত্র নিকটতর নহে। এ কথা, অবশ্যম্ভাবিতা-সম্বন্ধেও খাটে,—বরং আরো বেশী করিয়া খাটে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ: যদি প্রথম ঘটনার মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে যে উহা সহসা আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্যম্ভাবিতা খণ্ড খণ্ড-ভাবে কিংবা পর-পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপন্ন হয় না। কোন হত্যাকাণ্ড প্রথম দেখিবামাত্রই যদি আমি এই কথা না বলিতে পারি যে, এই হত্যার অবশ্য কোন কারণ আছে, তাহা হইলে, অনেকগুলি হত্যার কারণ সপ্রমাণ হইবার পর, সহস্রবারের হত্যাকালে আমার শুধু এইকথা মনে করিবার অধিকার জন্মিবে যে, খুব সম্ভব এই নূতন হত্যাকাণ্ডের কোন কারণ আছে। কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার আমার কস্মিন্‌কালেও জন্মিবে না যে,—ইহার অবশ্যম্ভাবী কোন কারণ আছে। কিন্তু যেহেতু, অবশ্যম্ভাবিতা ও ও সার্ব্বভৌমিকতা একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ঐ তত্ত্বদ্বয় উদ্ধার করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের সত্তা আমরা সিদ্ধ করিয়াছি। আমরা উহাদের সূত্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি; আমরা দেখাইতেছি—প্রথমে উহারা বিশেষ-বিশেষ তথ্যের আকারে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়; এবং ইহাও দেখাইয়াছি,—কি প্রকরণের দ্বারা,—কিরূপ কেবলীকরণ-প্রণালী দ্বারা,—মানব বুদ্ধি, বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট বস্তুগত আকার হইতে উহাদিগকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া থাকে;—সেই সকল আকার যাহা উহাদের প্রকৃত উপাদান নহে, পরন্তু যাহার দ্বারা উহারা পরিবৃত। এখন মনে হইতে পারে, আমাদের অভিপ্রেত কার্য্য বুঝি সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকের মতবিরুদ্ধ, আমাদের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তটির পক্ষসমর্থন করা এক্ষণে আবশ্যক। কেন না, দর্শনশাস্ত্রে যিনি একজন প্রমাণ বলিয়া ন্যায্যরূপে পরিগণিত, তাঁহার মতবাদে মুগ্ধ হইয়া তোমরা বিপথে নীত হইতে পার। আমাদের ন্যায় শ্রীযুক্ত মেন্ দে-বিরাঁ, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদের একজন প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ। তিনি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি উহাদের যেরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মতে সমীচীন নহে; উহাতে-করিয়া, এমন কি, মূলতত্ত্বের সত্তাই বিপন্ন হইয়া পড়ে; এবং উহা, পাকচক্রাকারে আবার আমাদিগকে পরীক্ষাবাদেই উপনীত করে।

এই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলিকে প্রতিজ্ঞার আকারে স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—উহার মধ্যে অনেক গুলি অবয়ব সন্নিবিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত:—ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়; গুণমাত্রেরই গুণের আধার-বস্তু আছে বলিয়া অনুমিত হয়; এই দুই তত্ত্বের মধ্যে যে ঘটনার প্রতীতি (idea) ও গুণের প্রতীতি রহিয়াছে, তাহারি পাশাপাশি আবার কারণের প্রতীতি ও বস্তুর প্রতীতিও রহিয়াছে। এই কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতির উপরেই উক্ত তত্ত্ব দুটি প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি প্রতীতি উহাদের মূল-উপাদান বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দে-বিরাঁ বলিতে

চাহেন, ঐ দুই প্রতীতির মধ্যে যে দুই তত্ত্ব নিহিত, সেই দুই প্রতীতি উক্ত তত্ত্বদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতু আমরা নিজেই কারণ ও বস্তু, অতএব কারণ ও বস্তুর পরিস্থানে, ঐ কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতি, আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রথমেই নিঃশেসিত হইয়া যায়। ঐ প্রতীতিদ্বয় আমাদের অন্তরে একবার প্রতিভাত হইলে পর, তখন অনুমান ন্যায়ের সাহায্যে উহাদিগকে আমাদের বাহিরেও আমরা লইয়া যাই। তখন, যেখানেই কোন ঘটনা বা গুণ প্রত্যক্ষ করি, অমনি আমরা সেই ঘটনার কারণ আছে—সেই গুণের আধার-বস্তু আছে বলিয়া অনুমান করিয়া লই। কারণ তত্ত্ব ও বস্তু তত্ত্বের তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বন্ধুবর আমাকে মার্জ্জনা করিবেন,—আমি তাঁহার এই ব্যাখ্যাটিকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ তত্ত্বের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে শুধু কারণ প্রতীতির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিলে যথেষ্ট হয় না। কেন না, উহার প্রতীতি ও উহার মূলতত্ত্ব—এক নহে—উহা স্বরূপতঃ বিভিন্ন। আমি শ্রীযুক্ত দে-বিরাঁকে এই কথা বলি ;—তুমি এই কথাটি সিদ্ধ করিয়াছ যে, কারণ-প্রতীতি, কার্য্যোৎপাদনী ইচ্ছাশক্তির অনুভূতির মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরা কতকগুলি কার্য্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং তদনুসারে ঐ কার্য্যগুলি উৎপন্ন হইতেছে। তুমি বলিতেছ, উহা হইতেই আমাদের কারণ প্রতীতি জন্মিয়া থাকে ; এবং উহা-হইতেই,—আমরা নিজে যে বিশেষ-কারণ, —সেই বিশেষ-কারণের প্রতীতিও জন্মিয়া থাকে। ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু, "যে কোন ঘটনা আবির্ভূত হয় তাহারি অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে"—এই স্বতঃসিদ্ধ সূত্রটি এবং উক্ত তথ্য—এই উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

তোমার বিশ্বাস, ব্যাপ্তিগ্রহ বা অনুমান-ন্যায়ের দ্বারা ঐ ব্যবধানটি তুমি লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বলিতেছ, একবার কারণ-প্রতীতিটি আমাদের অন্তরে উপলব্ধি হইলে পর,—যেখানেই কোন নূতন ঘটনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই আমরা অনুমান-ন্যায়ের প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা শব্দজালে প্রতারিত হইয়ো না। এই অদ্ভুত অনুমান ন্যায়টিকে একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখা যাক্। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস-সহকারে, শ্রীযুক্ত দে বিরাঁর যুক্তির সমক্ষে এই উভয় সঙ্কটের সমস্যাটি স্থাপন করিতেছি :—

যে অনুমানের কথা তুমি বলিতেছ তাহা কি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী? তাহা যদি হয়—তবে-ত উহা একই জিনিসের বিভিন্ন নাম মাত্র। আমরা যে অনুমান-বলে, ঘটনা-প্রতীতির সহিত কারণ-প্রতীতির সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, তাহাকেই-ত কারণের মূলতত্ত্ব বলে। তুমি যদি বল,—উহা সার্ব্বভৌমিকও নহে, অবশ্যম্ভাবীও নহে, তাহা হইলে উহা কারণ-মূলতত্ত্বের স্থান অধিকার করিতে পারে না। যে জিনিসের তুমি ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছ, ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই সেই জিনিসের উচ্ছেদ হইতেছে। স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত না করিলেও—এই অদ্ভুত দার্শনিক গবেষণার প্রকৃত ফল এইরূপ দাঁড়ায় ;—ব্যক্তিত্ব-মূলক ও ইচ্ছাশক্তিমূলক কারণের প্রতীতি জন্মিবার পূর্ব্বে, কারণ-ঘটিত মূলতত্ত্বের কোন ক্রিয়া হয় না।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

(কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোকের রচনা।)

মানুষ সকল জীব হইতে এমন শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে কেন? মানুষের যেমন বুদ্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান, স্বাধীন ভাব, এমন অন্য কোন জীবে নাই কেন? মানুষ বুদ্ধি-বলে কত কাণ্ডই না করিতেছে! দেখ, জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহ তারা নক্ষত্র কত আছে এবং পরস্পর কতদূরে আছে, কে কাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, কবে ধূমকেতু উদয় হইবে এই সব গণনার দ্বারা নিরূপণ করিয়া দিতেছেন, একি কম বুদ্ধি বিদ্যার ক্ষমতা। মনুষ্য হইয়া দূর দূরান্তরের ব্যাপার জানা একি কম কথা! আবার দেখ মানুষই বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিয়া, দুরারোহ পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া, কত অগম্য পথ সুগম করিয়া দেশ দেশান্তরে যাইবার সুবিধা করিয়াছে; অমন যে সমুদ্র যাহার গর্জ্জন শুনিলে এবং তরঙ্গভঙ্গ দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহার উপরেও আগ্নেয় পোত ভাসাইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতেছে এবং এমন ভয়াবহ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভ হইতে কলকৌশলে কত না রত্ন উদ্ধার করিতেছে। মানুষ উদ্যানের কত শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, ছোট ফুলকে বড় করিতেছে, বড় ফুলকে ছোট করিতেছে, বড় ফলকে ছোট করিতেছে এবং ছোট ফলকেও বড় করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে এবং প্রকৃতি দেবীর সহিত যোঝাযুঝি করিতে মানুষ যেমন সক্ষম এমন অন্য কোন জীবই নহে। আবার দেখ, পৃথিবীর নীচে মাটির ভিতর কি সব পদার্থ আছে তাহার তথ্য নির্ণয় করিতেও মানুষ ছাড়ে নাই। কত শত বৎসর পূর্ব্বে কি কি রকম জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল অধ্যবসায়ের সহিত এক এক স্তর মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহারও চিহ্ন বাহির করিতেছে এবং ভূগর্ভ হইতে নানা প্রকার ধাতু বাহির করিয়া নিজেদের কার্য্যের সুবিধা করিয়া লইতেছে এবং নিজেদের সাজসজ্জা ও অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। মানুষ কিসে না সক্ষম! বিদ্যা বুদ্ধির বলে সকল বিষয়েই পারগ। কিন্তু মানুষ এত যে উচ্চপদ, সকল জীবের অপেক্ষা এত যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে ইহা কাহার বলে কাহার অনুগ্রহের ফলে? যিনি মহান, যিনি দয়াময়, তাঁহারই করুণায় মনুষ্যের এই শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁহার অনুগ্রহ না থাকিলে এত অসাধ্য সাধন এই ক্ষুদ্র মানুষের দ্বারা সম্ভব হইত না। এই ত গেল মানুষের বাহ্য বিষয়ের ক্ষমতা। আবার অন্তরে মানুষ কত না শ্রেষ্ঠ, সে দয়াধর্ম্ম স্নেহ মমতা প্রভৃতি কত না স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ। এক এক জন ধার্ম্মিক লোকের প্রভাবে কত লোক ধার্ম্মিক হইতেছে, তাহাদের কর্ত্তব্য কাজ করিতেছে এবং ঈশ্বরকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা এরূপ ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন যে তাঁহারা সংসারের সকল প্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শিষ্যদিগকে ঈশ্বর বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। তাঁরা যেমন নিজে ঈশ্বরের সহবাসজনিত পরমানন্দ উপভোগ করিতেন সেইরূপ আবার অন্যদিগকে সেই আনন্দ বণ্টন করিয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না। সকল বিষয়েই যখন মানুষ এত শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে তখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ উপভোগ করিতে পাই না কেন? আমাদের মধ্যে দুঃখ কষ্ট শোক তাপ

উপস্থিত হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর এই, এটা কি কেবল উপভোগের স্থান, শিক্ষার স্থান নহে ? মধ্যে মধ্যে বিপদ আসিয়া আমাদের জানাইয়া দেয় যে, এখানকার সকলি ক্ষুদ্র, সকলি অনিত্য, আজ তুমি যাহাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেছ কাল হয় ত তাহাদের সহিত তোমার আর দেখা হইবে না, আজ যে বস্তু তোমার খুব প্রিয় কাল হয় ত তোমাকে তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, যে দ্রব্য তুমি এত যত্নের সহিত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছ যাহা তোমার ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে এমন ঘটনা হইতে পারে যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে হয় ত অগ্নিতে সেই সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। এখানকার সকলই ক্ষুদ্র, অনিত্য। সহ্য কর, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, এই ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎ আছে, অনিত্যর মধ্যে নিত্য আছে, নিরানন্দের মধ্যে পরমানন্দ আছে; এইরূপ হয় ত বিপদের উপর বিপদ আসিয়া শোকে তাপে তোমার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে এবং তুমি শিক্ষা পাইয়া ধর্ম্ম-সোপানে উত্থিত হইবে। ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত থাকিলে কি হইবে! তাহাতে মনের শান্তি নাই আরাম নাই। যাহারা মূঢ় তাহারাই বিপদে অভিভূত হয়, তাহারা শোক তাপে এমন মুহ্যমান হইয়া পড়ে যে, পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি ছিল সে সব চলিয়া যায় এবং প্রায় মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। ঈশ্বরকে জানিয়া, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য্য ধর, সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ কর, মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর, নহিলে মনুষ্য ও ইতর জীবে প্রভেদ কোথায় ?

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১২।/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৬৬৩৸/০
সমষ্টি	...	১৯৭৬ ৶০
ব্যয়	...	৩১৭ /০
স্থিত	...	১৬৫৯ /০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছ'কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
১৫৯/০

১৬৫৯/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০০৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭৸০
পুস্তকালয়	...	১০॥/০
যন্ত্রালয়	...	৫৭৲
গচ্ছিত	...	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন	...	২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		২২॥০
সমষ্টি	...	৩১২।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৮॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮।০
পুস্তকালয়	...	৫।৶০
যন্ত্রালয়	...	৭৬৸/৩
গচ্ছিত	...	২।৶৬
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৫॥ ৯
সমষ্টি	...	৩১৭ /০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৪৬ সংখ্যা ১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০৬। ১ আশ্বিন রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } ব্রাহ্ম আদিসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৪৬ সংখ্যা

১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ৩১ শ্রাবণ, বুধবার।

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি।

"মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবো ভব"

আমরা সেই পরম মাতা, সেই পরম পিতার উপাসনার জন্য, অদ্য এই রজনী-মুখে তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমরা এ অধিকার কোথা হইতে পাইলাম। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল? কে স্তন্য দিয়া তখন ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি করিল? কে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কায়-মনোবাক্যে আমাদের শরীর রক্ষা করিল? কে আমাদের বিদ্যা অর্থ ও ধর্ম্ম লাভের উপায় করিয়া দিল? কে অসৎসংসর্গ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে চরিত্রবান্ করিল? কে ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইবার পথ প্রদর্শন করিল? এ কি আমাদের এখানকার মাতা-পিতা নহেন? পরমেশ্বরের নীচেই যদি কেহ থাকেন, তাঁহারা কি সেই পিতা-মাতা নহেন? শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াছেন। এ প্রকার দেবতার পূজায় আমরা যদি বিরত থাকি, তাঁহাদের সেবায় যদি নিযুক্ত না থাকি তবে আমরা পশু অপেক্ষাও অধম। আমাদের সমান নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্ন আর কে আছে? ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় অন্ন-জল দিতে না পারিলে—সন্তানের মুখ মলিন ও চক্ষে জল দেখিলে, তাঁহাদের মনে কি দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়! যে পুত্র তাহা ভাবিয়া না দেখে, তাহার হৃদয় কি পাষাণসমান কঠিন! যাহারা ধন-মদে বিদ্যা-মদে পদমদে মত্ত হইয়া পিতৃ-মাতৃ হেলন করে, তাহাদের সমান কৃপাপাত্র আর কোথায় আছে? যে মাতা অতি স্নেহের সহিত সন্তানকে মৃদুস্বরে কথা কহিতে শিখাইল, আজি যদি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে সেই মাতার হৃদয়ে বজ্রসমান কঠিন কথায় আঘাত দেয়, তবে সে কেমন পুত্র! আজি যদি সে স্বোপার্জ্জিত ধনে নিজ উদর পূর্ণ করিয়া সুখানুভব করে, আর বৃদ্ধ অসহায় পিতা মাতা জঠরজ্বালায় অশ্রুপাত করে, তবে সে কেমন কুলাঙ্গার সন্তান। যে গৃহে এমন ঘটনা ঘটে, সে গৃহ শ্মশান অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আমরা ব্রাহ্ম বলিয়াই পরিচয়

দিই, বা মনুষ্য বলিয়াই আপনাকে বুঝি, আমাদের কি ব্রাহ্মোচিত বা মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য নাই ? আমরা কি স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থে তাঁহাদের সেবা করিব না ? মৃদু ও কোমল বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিব না ? তাঁহারা না বলিলেও তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া, তাঁহাদের অভাব মোচন করিব না ? তিনিই কুলপাবন সৎ পুত্র, যিনি সর্ব্বপ্রযত্নে পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারি জন্ম সার্থক, মাতা যাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ ও পৃথিবী যাঁহাকে পাইয়া পবিত্র হয়েন। আমি কতকগুলিন কুলপাবন সৎ পুত্র ও সাধ্বী কন্যার দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছি। রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হেনিবল্ অত্যুচ্চ আল্পস্ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইলে রোমান্-সেনাপতি করনিলিয়স্ সিপিও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য টিসিনস্ নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। তিনি বড়শাঘাতে অচেতন হইয়া ঘোটক হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া পলায়নপর হইল। তখন তাঁহার যুবক পুত্র সিপিও নিজের প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুমণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পিতার উদ্ধারসাধন করিলেন। নাইলের যুদ্ধের সময়, এক দিকে মহাবীর নেপোলিয়ন অন্য দিকে তৎসমযোগ্য নেল্সন্ ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রকাণ্ড যুদ্ধ-জাহাজ ওরিয়েণ্টে লুই ক্যাসাব্যাঙ্কা নামে কাপ্তেন বা এ্যাডমিরাল ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার দশ বৎসরের এক পুত্র ছিল। ইহার সাহস ও পিতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। নেল্সনের অগ্নিবর্ষী ও ভীমনাদী কামানে যখন ওরিয়েণ্ট জাহাজ হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তখন কয়েকজন ইংরাজ নাবিক ওরিয়েণ্টস্থ ফরাসী সৈনিকদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাহার নিকটস্থ হইল। সৈনিকগণ সম্মত হইয়া কাপ্তেনের পুত্র ক্যাসাব্যাঙ্কাকে বলিল "তুমি শীঘ্র জাহাজ হইতে নামিয়া আমাদের সঙ্গে নৌকায় আইস" তাহাতে সে বলিল, "না আমি যাইব না, আমার পিতা আমাকে যেখানে থাকিতে বলিয়াছেন, আমি সেইখানেই থাকিব।" তখন সপ্ততি জন লোক ইংরাজের নৌকায় যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। বালক যেখানকার সেই স্থানেই রহিল। পরে সে স্বীয় মুমূর্ষু পিতাকে জাহাজের মাস্তুলের এক আড়াতে বাঁধিয়া সমুদ্র-জলে ভাসাইয়া আপনি তাহার পরিচালক হইল। পরে ইংরাজ নাবিকেরা ওরিয়েণ্ট হইতে নির্গত আলোকের সাহায্যে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। নিকটে যাইয়া দেখিল, বালক ক্যাসাব্যাঙ্কা আর নাই। সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ধন্য পিতৃভক্তি ! !

একদা কোন রোমীয় সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুলকামিনীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বিচারপতিগণ তাহাকে কারাধ্যক্ষের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারাগারেই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ তাহার বংশমর্য্যাদার জন্য তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করেন নাই। তিনি বরং তাঁহার কন্যাকে কারাগার মধ্যে মাতৃদর্শন হেতু যাতায়াত করিতে অনুমতি দিতেন। পাছে কোন খাদ্যদ্রব্য লইয়া যান, তাহার জন্য তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অনাহারে তাহার মৃত্যু হউক তথাপি যেন ঘাতকহস্তে তাহার প্রাণবিয়োগ না হয়। এইরূপে কিছুদিন যায়, কারাধ্যক্ষ দেখিলেন, বন্দীর ত এখনো মৃত্যু হইল না। তখন তিনি গোপনে লুকায়িত থাকিয়া দেখিলেন, কন্যা

প্রতিদিন মাতাকে স্তন্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন। এ অপরাধ প্রকাশ হইলে, তাহার গুরুদণ্ড হইবে জানিয়াও সে মাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত। তখন কারাধ্যক্ষ বিচারপতিদিগকে এই সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। বিচারপতিগণ আশ্চর্য্য হইয়া সন্তোষের সহিত অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, এবং তদ্ব্যতীত উভয় মাতা ও কন্যাকে যাবজ্জীবনের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, এবং যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথায় মাতৃভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এক কীর্ত্তি-মন্দির স্থাপিত করিয়া দিলেন।

মহাত্মা জন্‌সন্ বাল্যকালে একদা পিতার নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, জ্ঞানোদয়ে সেইজন্য তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত বৃষ্টির সময় নগ্নপদে নগ্ন মস্তকে অনাবৃত স্থানে শোকে মগ্ন হইয়া ভিজিতে থাকিতেন।

রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি জগৎবিখ্যাত। দুর্ব্বলচেতা স্ত্রৈণ ভ্রান্ত কুসংস্কারাপন্ন রাজা দশরথ রাক্ষসী কৈকেয়ীর কথায় যখন তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিলেন, তখন তিনি কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্যালসঙ্কুল মশক-দংশ-পরিপূর্ণ বন মধ্যে গমন করিলেন। অতুলনীয় পিতৃভক্তি! এই আদর্শ অদ্যাপি আমাদের দেশে সকলেরই হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে।

পরিশেষে মহাত্মা দেবব্রত ভীষ্মের পিতৃভক্তির কথা বলিতেছি। একদা রাজা শান্তনু যমুনা-পুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পরমাসুন্দরী ধীবর-কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিলেন। পরে কন্যার পিতা দাস রাজার নিকট যাইয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। দাসরাজ বলিল, মহারাজ! যদি এই কন্যাকে আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করেন এবং ইহার গর্ভজাত সন্তানকে, ভবিষ্যতে সিংহাসন প্রদান করেন, তবে আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারি। রাজা তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ন থাকিতেন। দেবব্রত তদ্দর্শনে পিতাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতাও সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দেবব্রত তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ মন্ত্রী ও অপরাপর রাজগণ সমভিব্যাহারে দাসরাজের নিকটে যাইয়া পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দাসরাজা বলিলেন, আপনি যদি ভবিষ্যতে সিংহাসন গ্রহণ ও দারপরিগ্রহ না করেন, তবে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে পারি। দেবব্রত তাহাতেই আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইলেন। পরে তদীয় বিমাতা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয়। রাজা ও এই দুই পুত্রের মৃত্যু হইলে, সত্যবতী ভীষ্মকে বংশরক্ষা ও সিংহাসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহাতে পিতৃভক্ত দেবব্রত কহিলেন, "যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করে, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করে, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" এই সকল অমৃতময় বাক্য তাঁহার অসীম পিতৃভক্তির নিদর্শন। আমরা যেন এই সকল দেবোপম আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করিয়া পিতৃ-মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করিতে পারি। আর এই পিতা মাতার গুণ স্মরণ করিয়া যেন সেই পরমপিতা পরম মাতার স্নেহ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে পারি। কারণ তিনিই স্নেহের আকর। পিতা মাতার স্নেহ সেই স্নেহের ছায়া মাত্র।

হে অখিল মাতা! পরমপিতা! এখন আর আমাদের দেশে—বঙ্গভূমিতে—সোনার ভারতে পূর্ব্বের ন্যায় পিতৃ-মাতৃভক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। কি ঘন বিষাদের অন্ধকারেই ইহা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তুমি এ শ্মশানসম দেশকে নন্দনকাননে পরিণত কর। এই আমাদের তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়।" সংক্ষেপে এ যাহা বলা হইয়াছিল, ইহার ভিতরে দুইএকটি কথা আছে এরূপ, যাহার ভাবার্থের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে ভ্রম অনিবার্য্য। এই যে একটি কথা বলা হইয়াছিল যে, "সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে," ইঁহার অর্থ এ নহে যে, সাক্ষাৎ-উপলব্ধির সঙ্গে চিন্তা'র কোনো সম্পর্কই নাই;—সম্পর্ক খুবই আছে—শক্তরকমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; তাহা যদি না থাকিবে, তবে চিন্তাবেচারী সাক্ষাৎ-উপলব্ধির আঁচল ধরিয়া রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইবেই বা কেন, আর, সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতে দূরে পড়িলে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেই বা কেন? চিন্তা কিছু-আর সাক্ষাৎ উপলব্ধির পর নহে; ঠিক্ তাহার বিপরীত। চিন্তা সাক্ষাৎ-উপলব্ধির স্নেহের ললনা। তুমি হয় তো বলিবে—"তবে কেন চিন্তা'কে নিরোধ করিতে বলিতেছ?" নিরোধ করিতে বলিতেছি এইজন্য—যেহেতু চিন্তা নিতান্তই চঞ্চলপ্রকৃতি বালিকা। একটি কচি মেয়ে যদি মাতার হস্তের অবলম্বন ছাড়িয়া-দিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যায়, তবে পার্শ্ববর্ত্তী হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তিনি তদ্দণ্ডে মেয়েটিকে বলপূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করেন। আমি তাই বলিতেছি যে, এলোমেলো পাগ্‌লী চিন্তাকে বিপথের কণ্টকবন হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে সমর্পণ করা শুভান্বেষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইহারই নাম চিন্তাকে নিরোধ করা। চিন্তাকে রোধ করিলে চিন্তাকে বধ করা হয় না;—হয় কেবল চিন্তাকে বিপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনা; অমূলক কল্পনা এবং অসম্বদ্ধ জল্পনা'র পথ হইতে বাস্তবিক-সত্যের পথে ফিরাইয়া আনা। এই গেল চিত্ত-নিরোধ। এতদ্ব্যতীত, বিগত প্রবন্ধে ঐ কথাটির লেজুড় টানিয়া আর-একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; যেহেতু উভয়ে উভয়ের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত।" তুমি হয় তো বলিবে যে, হইতেছে চিন্তা-নিরোধের কথা—মাঝে হইতে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আনিয়া তাহার গুরুভার ঐ ক্ষুদ্র বেচারিটির স্কন্ধে চাপাইয়া-দেওয়া হইতেছে কেন? তাহা যদি বলো—তবে নিম্নে প্রণিধান কর:—

ছয়টি মন্তব্য কথা।

(১) সত্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য পাত্র তৈয়ারি করিতেছেন অনবরত।

(২) সে পাত্র মনুষ্য বা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড।

(৩) সত্য আপনাকে আপনি যেরূপে প্রকাশ করেন, তাহাই সত্য।

(৪) সত্যের হস্ত হইতে টাট্‌কা-টাট্‌কি সত্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য;—ইহারি নাম সাক্ষাৎ-উপলব্ধি বা (Intuition)।

(৫) তাহা না করিয়া (সত্যের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্যগ্রহণ না করিয়া) চিন্তা খাটাইয়া আপনার বলে সত্য গড়িয়া তুলিতে যাওয়া নিতান্তই পাগ্‌লামি। সে-রূপ গড়িয়া-তোলা সত্য একপ্রকার ব্যাসের কাশী অথবা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

(৬) অতএব চিন্তাকে থামাও—কল্পনাকে থামাও—যাহা-কিছু পড়িয়াছ-শুনিয়াছ, সব ভুলিয়া যাও—মনের সমস্ত সংস্কার ধুইয়া-পুঁছিয়া মন'কে ধব্‌ধবে পরিষ্কার কর—মন'কে নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত কর—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা'র ন্যায় একাগ্র এবং স্থিরীভূত কর—সত্য আপনাকে আপনি কিরূপে প্রকাশ করেন, তাহারই প্রতি চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাক। যাবৎপর্য্যন্ত সত্য আপনার বলে এবং আপনার রকমে প্রকাশিত না হ'ন—তাবৎপর্য্যন্ত তুমি কোনো কথা মুখে উচ্চারণ করিও না; বলিও না যে, সত্য নিরাকার বা সত্য সাকার বা সত্য জ্যোতি বা সত্য অন্ধকার, ইত্যাদি। আপনার একটা পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার লইয়া সত্যের সম্মুখে আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না। সত্যকে আগে প্রকাশ পাইতে দাও; স্বয়ং প্রকাশ পাইতে দাও; তাহার পরে তৎসম্বন্ধে তোমার যাহা বলিবার, তাহা বলিও; তাহার পূর্ব্বে কোনো-প্রকার পুঁথিগত বিদ্যা খরচ করিতে যাইও না—কোনোপ্রকার শেখা-কথা তোতাপাখীর মতো আওড়াইতে থাকিও না।

বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অবতারণা।

উপরি-উক্ত রূপে চিন্তাকে নিরোধ করিলে, করা হয় একপ্রকার অতলস্পর্শ মহাসাগরে নিমজ্জন—অনাকাশ এবং অকালের মহাসাগরে নিমজ্জন। যেখানে পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ, উপরনীচে নাই—ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান নাই—সেই অকূল মহাসাগরে নিমজ্জন। সেই অতলস্পর্শ গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে—প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে—যে-এক বিশ্ব-বিধরণী মহতী শক্তি—যে-এক অটল প্রতিষ্ঠা—যে-এক জ্ঞান—যে-এক জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহাই তুমি সত্য বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিবে। তুমি হয় তো বলিবে—"বেজায় কল্পনা! এক তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই যে, আকাশ এবং কালের অতীত প্রদেশে কল্পনারই কেবল দৌড় চলে, তা ভিন্ন, কোনো মর্ত্ত্য জীবেরই সেখানে গতিবিধি নাই; তাহাতে আবার, যদি বা তোমার দেখাদেখি কল্পনার বায়ুর জোরে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার পরপারে অপার শান্তির গন্ধর্ব্বনগর পত্তন করিবার আশা আমার মনোমধ্যে সতেজে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বাড়িয়া উঠিতে-না-উঠিতেই দুরন্ত কল্পনা প্রশান্ত অন্ধকারের মধ্য হইতে জ্যোতি জাগাইয়া-তুলিয়া আশা বেচারিটি'র মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিল। রক্ষা এই যে, সে আশাও যেমন, আর সে বজ্রও তেমনি, দুইই বাতাস। বাতাসের অস্ত্রের চোট বাতাসের উপর দিয়াই ক্ষপিত হইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে; এখন তবে আমি বিদায় হই।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "অত ব্যস্ত হইও না—একটু স্থির হও! স্বীকার করি-

লাম যে, যাহা-কিছু আমি বলিলাম, সমস্তই আগাগোড়া নিছক কল্পনা। কিন্তু সুপ্তি এবং জাগরণ প্রত্যহ যাহা তোমার ঘটিতেছে, তাহা কি ? তাহাও কি কল্পনা ? প্রতি রজনীতে তুমি যে অগাধ প্রশান্তির সাগরগর্ভে তলাইয়া যাইতেছ, তাহাও কি কল্পনা ? আবার প্রাতঃকালে যে, সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহাও কি কল্পনা ? দুয়ের কোনোটিই যদি কল্পনা না হয়, তবে যাহার জন্য এত সাধ্যসাধনা—সাগরে ডুব-দেওয়া দিগ্নি—তাহা হাতের কাছে অনাহূত আসিয়া উপস্থিত ; কি ? না, পরমাত্মার প্রকাশ—জাগ্রত-জীবন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই তো চিন্তা-নিরোধের কথা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নিরবচ্ছেদে সীধা চলিয়া বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারোপান্তে আসিয়া পড়িলাম। এইখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত সাতটি বিষয় ক্রমান্বয়ে দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) অব্যক্তের অন্ধকারগর্ভ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়ে—এটা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু প্রাত্যহিক ঘটনা।

(২) যদি কোন কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবৃত্তান্ত মনে ভাবিতে যা'ন, তবে তিনি ঐ প্রাত্যহিক ঘটনাটিকেই অনির্দেশ্য অতীতকালে চালাইয়া-দিয়া তাহার প্রতি কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রেরণ করেন ; এবং তাহাকেই কাব্যালঙ্কার দিয়া মাত্রাতীত মহান্ এবং সুন্দর করিয়া সাজা'ন—তাহার অধিক কিছুই করেন না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রলয়ের অন্ধকার সুষুপ্তির অন্ধকার হইতে কোনো অংশে বেশীও নহে, কমও নহে। সুষুপ্তির অন্ধকারের মধ্য হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে আশ্চর্য্যময় প্রকাশ, এ প্রকাশ মান্ধাতার আমলেও যেমন ছিল এখনো তেমনি রহিয়াছে। পরিমাণঘটিত ছোটো-বড় এবং মাত্রাঘটিত কম বেশীর কথা এখানে হইতেছে না। প্রকাশ জিনিস্টা কি এবং অপ্রকাশই বা জিনিস্টা কি, তাহাই এখানে একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং একমাত্র বিবেচ্য।

(৩) বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ পরস্পরের প্রতিযোগিতাগুণেই প্রকাশ এবং অপ্রকাশ। ছবিতোলা যন্ত্রের প্রথম উদ্যমের আতপাঙ্ক অন্ধকারের ঘোমটা'র মধ্যে কেমন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় ! ফট্‌ফ'টে আলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারেই অপ্রকাশ হইয়া যায়। প্রকাশের কারণ তবে কি অন্ধকার বা অপ্রকাশ ? ইহার উত্তর এই যে, আলোকও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে, অন্ধকারও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে। প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ হ'চ্চে—আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগিতা। আলোক কেবল প্রকাশের আট-আনা কারণ ; অন্ধকারও তাই।

(৪) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার প্রথম মুহূর্ত্তে দর্শকের চক্ষে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাতে—(১) এপিটে প্রকাশ, (২) ওপিটে অপ্রকাশ, এবং (৩) দুয়ের মাঝখানে শক্তির সঙ্কোচ-বিকোচ বা স্পন্দন, এই তিনটি ব্যাপার গা-ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হয়। ওপিটের ঐ যে অপ্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয় নাম তমোগুণ, এপিটের এই যে প্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম সত্ত্বগুণ ; মাঝের সেই যে স্পন্দনক্রিয়া, তাহার শাস্ত্রীয় নাম রজোগুণ। তিন গুণের সবটা একসঙ্গে ধরিয়া ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি।

(৫) সমগ্র প্রকৃতিকে আমরা বলিতেছি—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ আমরা প্রতিজনে) সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত; এবং পরমাত্মা সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

(৬) হংসশাবক যেমন অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তেমনি, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অচেতন-অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া বাহির হইবামাত্র বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি উন্মুখ হয়। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব স্পষ্ট। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র—তাহা অভাবের আলয়; বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যত-কিছু অভাব আছে—সমস্তেরই পূরণ হইতে পারে—পূরণ হওয়া চাই—এবং পূরণ হইতেছে অনবরত—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে। কচি ছেলের অভাবমোচনের জন্য মাতৃক্রোড়ে যেমন সমস্ত ভোগ-সামগ্রী পূর্ব্ব হইতেই সাজানো রহিয়াছে—শয়নের শয্যা, ক্রীড়ার দোলা, হৃদয়ের স্নেহ, জ্ঞানের উন্মেষণী মাতৃভাষা, সমস্তই পূর্ব্ব হইতে সাজানো রহিয়াছে; ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের অভাবমোচনের জন্য বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডেও অবিকল সেইরূপ। কাজেই সূর্য্যমুখীফুলের ন্যায় ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি স্বভাবতই উন্মুখ।

(৭) আমাদের সুষুপ্তিকালে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা একচুলও বিলুপ্ত হয় না—পরন্তু ষোলো-আনা মজুত থাকে। কিন্তু তৎকালে—না আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাহা প্রতিভাত হয়, না আমাদের অন্তরে তাহা প্রতিভাত হয়। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মসত্তাও অন্তরে প্রতিভাত হয় না এবং বহির্বস্তুর সত্তাও সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ যে-মাত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখীন হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের বাহিরে এবং ভিতরে—উভয়ত্র এপিট-ওপিট ভাবে—সমগ্র বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশমান হইয়া উঠে। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ—ইহাকে যখন এক প্রকাশ, বা এক শক্তি, বা এক সত্তা বলিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট যে, সে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ, তাহা চেতনের নিকটে চেতনের প্রকাশ, আত্মার নিকটে আত্মার প্রকাশ, জীবাত্মার নিকটে পরমাত্মার প্রকাশ। যেহেতু প্রকৃতি এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান নাই।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে, অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা এখনো বলিবার আছে;—তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রথমে আমি বলিয়াছিলাম—"মন হইতে সমস্ত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া দিয়া সত্যের হস্ত হইতে সত্য গ্রহণ কর—সত্যের সম্মুখে আপনি আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না।" এটা আমি বলিয়াছিলাম শুদ্ধকেবল জমি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। ঐ সোজা কথাটির অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, মনের ঐরূপ সংস্কারশূন্য অবস্থার নামই সত্যের উপলব্ধি। তখনই বলিব সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইল, যখন দেখিব যে, সেই তৈয়ারি-করা জমি'তে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল এবং প্রশান্ত অন্তঃকরণে—বাস্তবিকই সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটিল। তুমি হয় তো বলিবে এই যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মার প্রকাশ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না;—পরমাত্মার প্রকাশের সঙ্গে তুমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ জুড়িয়া দিতেছ, সেইটিই হ'চ্চে

গোলোযোগের মূল। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পরমাত্মা স্বয়ং যখন নির্ম্মলচিত্ত সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'ন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকুক্ বা না থাকুক্ —সাধকের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, পরমাত্মা আপনার প্রকাশ'কে দূরে সরাইয়া-রাখিয়া শুধুই কি আপনার সত্তামাত্র সাধকের অন্তঃকরণে উদ্বোধিত করেন, অথবা সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একযোগে উদ্বোধিত করেন? অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা সাধকের তৈয়ারিকরা জমিতে—নির্ম্মল অন্তঃকরণে—আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবির্ভূত হ'ন; কেন না, পরমাত্মার সত্তামাত্র বিনা-সাধনেই লোকের মনে (মনুষ্যমাত্রেরই মনে) পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত রহিয়াছে; তাহার জন্য শিক্ষারও প্রয়োজন নাই—গুরূপদেশেরও প্রয়োজন নাই—যুক্তি-তর্কেরও প্রয়োজন নাই—সাধনেরও প্রয়োজন নাই—চিত্তশুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, সযত্নে তৈয়ারি করা সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে আবির্ভূত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হ'ন; যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নামই পরমাত্মার প্রকাশ এবং পরমাত্মার প্রকাশের নামই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাত্মা কি সাধকের অন্তঃকরণে নূতন কোন একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন—অথবা আবহমান-কালের এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—এই চিরন্তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন? ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাধকের জন্য নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এক-তো বাড়া'র ভাগ, তা ছাড়া, একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই হইতে পারে না। বেদের এ কথা বেদবাক্য যে, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে প্রকাশ—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—ইহাই পরমাত্মার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া"—ইহা ব্যতীত আর-একটা নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা—যেমন ব্যাসের কাশী বা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ—নিতান্তই অস্বাভাবিক। ইহার বিরুদ্ধে তুমি হয় তো বলিবে যে, "এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি ছার পদার্থ;—ইহা পরমাত্মার প্রকাশ নহে—ইহা পরমাত্মার আবরণ।" তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "আবরণ কাহার নিকটে? যাহার অন্তঃকরণ মোহ-কুজ্ঝটিকার ঘন-আবরণে আবৃত, তাহার নিকটে সবই আবরণ। পক্ষান্তরে, যাঁহার অন্তঃকরণ কুজ্ঝটিকামুক্ত, নির্ম্মল, স্থির এবং প্রশান্ত, তাঁহার নিকটে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকাশ পরমাত্মারই প্রকাশ। এইজন্য বলিতেছি যে, অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া-দিয়া অন্তঃকরণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত কর, এবং এই অভাবপূর্ণ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আপনার অভাবের পূরণকামনায় স্বভাবতই যে মাতৃমুখের প্রতি উন্মুখ হয়—সেই মাতৃমুখের দিকে—বিশ্বপ্রকাশের দিকে—সুবিমল মনোদর্পণ বাগাইয়া ধর, তাহা হইলেই সেই এক প্রকাশেই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশেই—পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনেরই যুগপৎ প্রকাশ হইবে।

এই যে কথাগুলি বলিলাম, ইহার

ভিতরে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা চাপা-চুপি দেওয়া রহিয়াছে; সেগুলি ভাঙিয়া বলা আবশ্যক। বারান্তরে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

(দ্বিতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

যে মতবাদটিকে আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা আরো দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে হয়, যখন আমরা ভাবিয়া দেখি—এমন আরো কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহাদের ক্রিয়া তৎসম্বন্ধীয় প্রতীতির পরে আরম্ভ না হইয়া, পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। আমাদের প্রতিপক্ষ যে বলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতীতি হইতেই এই সকল তত্ত্ব উৎপন্ন, তাহা ঠিক নহে। কি করিয়া আমাদের কাল ও দেশ সম্বন্ধীয় প্রতীতি জন্মে? আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্য কোন-একটা স্থানে অবস্থিতি করে এবং ঘটনা কোন একটা সময়ে সংঘটিত হয়;—এই তত্ত্বটির সাহায্য-ব্যতীত আর কিছুতেই দেশ কালের প্রতীতি আমাদের জন্মিতে পারে না। প্রথম উপদেশে আমরা দেখাইয়াছি,—এই তত্ত্বটির সাহায্য না পাইলে, এবং ইন্দ্রিয়বোধ ও আত্মচৈতন্যে পরিণত না হইলে, আমাদের নিকট দেশকাল বলিয়া কিছুই থাকে না। অনন্তের প্রতীতিটি কি আমরা এই তত্ত্বটি হইতে প্রাপ্ত হই নাই যে, যাহা কিছু অন্তবৎ তাহা হইতেই অনন্ত অনুমিত হয়? যে-কোন অন্তবৎ ও অপূর্ণ পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করি, আমাদের অন্তরে অনুভব করি,—তাহা আপনাতে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা আর একটা কিছু আকাঙ্ক্ষা করে—যাহা অনন্ত, যাহা পূর্ণ। এই তত্ত্বটি অপসারিত কর, তাহা হইলে অনন্তের প্রতীতিটিও অন্তর্হিত হইবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই তত্ত্বটির প্রয়োগ হইতেই উহার প্রতীতিটি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তত্ত্বটি—প্রতীতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাক্। এখন এই কথাটি জানা আবশ্যক, আত্মারূপ বিষয়ীর (Subject) প্রতীতি ও আধার-বস্তুর প্রতীতি—সেই-সেই তত্ত্ব-ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী? কোন্ হেতু-সূত্রে, বস্তু-প্রতীতি, "গুণমাত্রেরই আধারবস্তু আছে"—এই তত্ত্বটির পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে? কারণের ন্যায় আধার-বস্তুও যদি আন্তরিক পর্য্যবেক্ষণের বিষয় হয়—তাহা হইলে শুদ্ধ সেই হেতু-সূত্রেই উহা তত্ত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে। যখন আমি কোন কার্য্য উৎপাদন করি, তখন আপনাকেই তাহার কারণ বলিয়া সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। এইস্থলে কোনও তত্ত্বরূপ মধ্যস্থতার আবশ্যক হয় না; কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধে সেরূপ হয় না—সেরূপ হইতে পারে না। কেন না, আমাদের চৈতন্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়—আমাদের গুণধর্ম্ম, আমাদের কার্য্য, আমাদের বৃত্তি-নিচয়—সমস্তেরই একটি আধার বস্তু আছে। এই আধার-বস্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় নহে;—ইহা সংকল্পিত (Conceive) হয় মাত্র। আত্মচৈতন্য—ইন্দ্রিয়বোধকে, ইচ্ছাকে, চিন্তাকে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, কিন্তু উহাদের আধার-বস্তুকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে না। আত্মার আধার বস্তুকে কি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম-

বস্তুকে উপলব্ধি করিবার জন্য, এরূপ কোন-একটি তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করা কি আবশ্যক হয় না, যাহার কাজ—অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যকে—পারমার্থিক সত্তার সহিত ব্যবহারিক সত্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করা? সেই তত্ত্বটিই বস্তুতত্ত্ব। সুতরাং, বস্তু-প্রতীতি—বস্তুতত্ত্ব-প্রয়োগের পরবর্ত্তী; সুতরাং বস্তু-প্রতীতি হইতে বস্তুতত্ত্ব উৎপন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না। ভাল-করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বস্তু-তত্ত্বটি আমাদের মনে এরূপ ভাবে অবস্থিতি করে যে, কোন ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাতে আপনাকে প্রয়োগ করিবার জন্য তত্ত্বটি যেন পূর্ব্ব-হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা শুধু এই কথা বলি যে, কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবামাত্র সেই সঙ্গে তাহার একটি আধার-বস্তুও যে আছে—এইরূপ সংকল্পন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। অর্থাৎ—কি ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা, কি আত্মচৈতন্যের দ্বারা, কোন ব্যাপারকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত, সেই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত ও সহজাত আধার-বস্তুটিও সংযুক্ত। ঘটনাগুলি এইরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে:—ব্যাপার-সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উহাদের আধার বস্তুর সংকল্পন (Conception)—এই দুই ক্রিয়া পর-পর হয় না, পরন্তু এক-সঙ্গেই হইয়া থাকে। এই অপক্ষপাতী বিশ্লেষণের ফলে, সদৃশ ও বিসদৃশ—দুই প্রকার ভ্রমই একসঙ্গে নিরাকৃত হয়; তন্মধ্যে একটি ভ্রম এই,—কি বাহ্য কি আভ্যন্তরিক—পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হইতেই তত্ত্বগুলি উৎপন্ন হয়। অপর ভ্রমটি এই:—তত্ত্বগুলি—অভিজ্ঞতার পূর্ব্ববর্ত্তী।

ফল কথা, প্রতীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলিকে প্রতীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস। যদি এরূপ অনুমান করা যায়—যে সকল প্রতীতি তত্ত্ব-সমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই প্রতীতি গুলি তত্ত্ব-সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে—কি করিয়া এই সকল তত্ত্ব, প্রতীতি-সমূহ হইতে নিষ্কর্ষিত হইল। এইটিই প্রথম প্রতিবন্ধক,—এইটিই গোড়ার প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, এ কথাও ঠিক্ নহে যে, প্রতীতি—সকল স্থলেই তত্ত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী; প্রত্যুত দেখা যায়, তত্ত্বই প্রতীতির পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু প্রতীতি-সমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী হউক বা পরবর্ত্তী হউক, তত্ত্বগুলি সকল স্থলেই আত্ম-পর্য্যাপ্ত; সার্ব্বভৌমতা ও অবশ্যম্ভাবিতা—এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত হওয়ায়, তত্ত্বগুলি সামান্য প্রতীতির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই উপদেশটি যেরূপ কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য এক-একবার মনে হয়, তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন-সকল দার্শনিক ভাবেই আলোচিত হওয়া বিধেয়; এই আলোচনার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করা আমাদের অধিকারায়ত্ত নহে। বিষয়-ভেদে ভাষাভেদ। তত্ত্ব-বিদ্যারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সকল প্রকার আনুমানিক সিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা, তথ্যের উপর অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করা,—ইহাই যেরূপ তত্ত্ববিদ্যার মূল-নিয়ম, সেইরূপ নিক্তির ওজনে যাথাযথ্য রক্ষা করিয়া ভাষাপ্রয়োগ করাই তত্ত্ববিদ্যার বিশেষ গুণ। এই নিয়মটি আমরা ধর্ম্মশাসনের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছি। সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের সূত্রস্থান অনুসন্ধান করিবার সময়, আমরা এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি যে, পদ্ধতিক্রমে

ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্যাখ্যার আসল বিষয়টিকে নষ্ট করিয়া না ফেলি। সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি—সমস্তই আমাদের বিশ্লেষণ-বিচার হইতে বাহির হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলি পর-পর যেরূপ আকার ধারণ করে,—আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি; এবং ইহাও দেখাইয়াছি,—উহাদের ক্রিয়া স্বতঃ-উৎপন্নই হউক, বিশেষ-বিশেষ বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, উহ'দের আসল প্রকৃতিটিকে ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত করিয়া, চিন্তার দ্বারা অবধারণ করিবার চেষ্টাই হউক, অথবা নিষ্কর্ষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা উহাদের সার্ব্বভৌমতা ও অবশ্যম্ভাবিতা নির্দ্ধারণ করাই হউক—উহাদের যতই অবস্থান্তর ঘটুক না কেন,—উহারা একই ভাবে রহিয়াছে—উহাদের প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উহারা চির-ধ্রুব। এই ধ্রুবত্বের গোড়া নাই—সূত্রস্থান নাই। অমুক দিন হইতে এই ধ্রুবত্বের আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা কাল-সহকারে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এরূপ বলা যায় না; কেন না, উহার ক্রমপর্য্যায় নাই : আমরা একটু-একটু করিয়া ক্রমশঃ কারণ-তত্ত্বে, বস্তুতত্ত্বে, কালতত্ত্বে, দেশতত্ত্বে, অনন্ত-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমরা অল্প অল্প আরম্ভ করিয়া—পরে সমস্তটা বিশ্বাস করি—এরূপ নহে। ঐ তত্ত্বগুলি প্রথম দিন হইতে, শেষ দিন পর্য্যন্ত সমান-ভাবে প্রবল, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। উহাদের সম্বন্ধে যে ধ্রুববিশ্বাস উৎপন্ন হয় তাহাতে "যদি কিন্তু" নাই; উহা অনন্যাপেক্ষী ও বিকল্পরহিত; তবে, সকল সময়ে সেই বিশ্বাসের সহিত আত্মচৈতন্যের সাহচর্য্য থাকে না, এই মাত্র।

কারণ-তত্ত্বে, পণ্ডিতবর লাইব্‌নিজের (Leibnitz) যেরূপ ধ্রুববিশ্বাস, একজন অজ্ঞ ব্যক্তিরও সেইরূপ বিশ্বাস। এইমাত্র প্রভেদ যে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি ঐ তত্ত্বটিকে নিত্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করে, অথচ চিন্তা করিয়া দেখে না—ঐ তত্ত্বের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে, লাইব্‌নিজ ঐ শক্তির প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হয়েন—উহার অনুশীলন করেন; উহার ব্যাখ্যায় এই মাত্র বলেন, উহা মানব-মনের স্বধর্ম্ম—উহা একটি প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ, সাধারণ লোকদিগের তৎসম্বন্ধে যে অজ্ঞতা, সেই অজ্ঞতাকে তাহার ঊর্দ্ধতম সূত্রস্থানে লইয়া যান এইমাত্র। ঈশ্বরের কৃপায়, এই সকল তত্ত্বসম্বন্ধে, চাষা ও তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে এই একমাত্র প্রভেদ। এই তত্ত্বগুলি—যাহা মনুষ্যের ভৌতিক যৌক্তিক ও নৈতিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—উহারা কোন-না-কোন প্রকারে মনুষ্যের নিকট আত্ম-প্রকাশ করে;—এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট এই সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে, মনুষ্যের নিকট এমন কিছু প্রকাশ করে—যাহা সার্ব্বভৌমিক, যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা অনন্ত।

দ্বিতীয় উপদেশ সমাপ্ত।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

কর্ত্তব্য।

১। অন্যের সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা হইতেই আমাদের কর্ত্তব্য-সকল অবধারিত হয়। অমুক ব্যক্তি কি তোমার পিতা?—তাহা হইলে এই বুঝায়, তোমাকে তাঁর সেবা করিতে হইবে, সকল বিষয়ে তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে, তাঁর ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তিনি

অসৎ পিতা হয়েন, তাহা হইলে কি হইবে? কেবল সৎ পিতারই সহিত তোমার সম্বন্ধ হইবে—এরূপ কি কোন প্রকৃতির নিয়ম আছে?—না; প্রকৃতির নিয়ম শুধু এই—কোন-এক পিতার সহিত তুমি সম্বন্ধসূত্রে নিবদ্ধ হইবে।

তোমার ভাই তোমার ক্ষতি করিতেছে। করুক;—তাহার প্রতি তোমার যে সম্বন্ধ তাহা তুমি রক্ষা করিয়া চল। সে কি ব্যবহার করিতেছে, তাহা খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কি ভাবে চলিলে তুমি নিজে স্বভাবের নিয়ম পালন করিতে পার, তুমি শুধু তাহাই দেখিবে। তুমি যদি নিজে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারে না;—তুমি যদি মনে কর তোমার ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার বাস্তবিক ক্ষতি।

২। এইরূপে তুমি যদি সম্বন্ধগুলি প্রণিধান করিয়া দেখিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশীর প্রতি, আর আর সকলের প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য—তাহা সহজেই অবধারিত হইবে।

সোঽকাময়ত ইত্যাদি তৈত্তিরীয়।

ব্রহ্ম নাই, ইহার হেতু যাহা থাকে তাহা বিশেষরূপে গৃহীত হয়, যেমন শশশৃঙ্গাদি। কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধ হন না, এই বিশেষরূপ অগ্রহণ হেতু ব্রহ্ম নাই।

না এ কথা বলিতে পার না। এই যে আকাশাদি কার্য্য দেখিতেছ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। যে বস্তু হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় অবশ্য সে বস্তু থাকে। যেমন ঘটটা আছে তাহার কারণ মৃত্তিকাও আছে। অঙ্কুর আছে তাহার কারণ বীজও আছে। এই জন্য বলিতেছি আকাশাদি কার্য্য আছে বলিয়া তৎকারণ ব্রহ্ম অবশ্য আছেন। ইহা অপ্রসিদ্ধ কথা যে কারণ নাই অথচ কার্য্যোৎপত্তি হইয়াছে। যে বস্তু নাই অর্থাৎ অসৎ তাহা হইতে যদি এই নামরূপাদি কার্য্য হইয়া থাকে তাহা হইলে নিরাত্মক পদার্থের কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে কিন্তু নামরূপের উপলব্ধি হইতেছে সুতরাং ব্রহ্ম আছেন। শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারেও বুঝিতে হইবে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম আছেন।

এখন বলিতে পার ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজাদির ন্যায় কারণ হন তাহা হইলেও তো তিনি অচেতন। না এরূপ বলিও না। "সোঽকাময়ত" তিনি কাময়িতা। কামনা অচেতন কার্য্য হইতে পারে না। আমরা বলিব ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। এই সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই তিনি কাময়িতা। এখন তুমি বলিবে ব্রহ্মের যখন কামনা আছে তবে আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ আমরা যেমন সময়ে সময়ে বিফলকাম হই তিনিও তাহাই। না এরূপ বলিও না। কামনার উপর ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য আছে। যেমন কামাদি অন্যকে অস্বাধীন বা পরবশ করিয়া তাহার প্রবর্ত্তক হয় উহা সেইরূপে ব্রহ্মের প্রবর্ত্তক নয়। তবে কিরূপ? না সত্য জ্ঞানাদির ন্যায় উহা ব্রহ্মের একটি স্বরূপ ভাব! এই স্বরূপভূত বলিয়াই কামাদি তাঁহার পক্ষে বিশুদ্ধ * তদ্দ্বারা

---

* ব্রহ্ম মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগতের কারণ হইয়াছেন এবং মায়াপরিণাম কাম দ্বারা তিনি কাময়িতা বলিয়া ব্যপদিষ্ট। এই পরিণাম অবিদ্যা দ্বারা অনভিভূত-চৈতন্যব্যাপ্ত বলিয়া তাহাতে ব্রহ্মের তাদাত্ম্য আছে সুতরাং বিশুদ্ধ।

তিনি কদাচ প্রবর্ত্তিত হন না। প্রত্যুত ব্রহ্ম তাহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং কামাদিতে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য আছে। এই হেতু এবং সাধনন্তর নিরপেক্ষ এই হেতুও তিনি অনাপ্তকাম হইতে পারেন না। তাই শ্রুতি কহিয়াছেন 'সোঽকাময়ত' সেই আত্মা কামনা করিলেন। কিরূপ? আমি বহু হইব। একমাত্র অদ্বিতীয়ের বিষয়ান্তরে প্রবেশ অসম্ভব তবে বহু হওয়া তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে ঘটে? তাই বলিলেন 'প্রজায়েয়' উৎপন্ন হইব! এইস্থলে পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় বহু হওয়ার অর্থ নয়, তবে কি? না, আত্মস্থ অনভিব্যক্ত নামরূপের অভিব্যক্তি দ্বারা বহু হওয়া। যখন আত্মস্থ অনভিব্যক্ত নামরূপ প্রকটীকৃত হয় তখন ব্রহ্মের সহিত অভেদে দেশকাল সর্ব্বাবস্থায় তাহা হইয়া থাকে। এই নামরূপের অভিব্যক্তি ব্রহ্মের বহু হওয়া। নচেৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের বহুত্ব বা অল্পত্ব ঘটিতে পারে না। যেমন আকাশের বহুত্ব বা অল্পত্ব বস্ত্বন্তরকৃত ইহা সেরূপ নয়। নিরূপিত প্রকারেই আত্মার বহুত্ব। আত্মা হইতে ভিন্ন অনাত্ম পদার্থ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন কালেই নাই। কাজেই এই নামরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃকই আত্মবান, ব্রহ্ম তদাত্মক নহেন। এই নামরূপ রূপ উপাধি বশাৎ যাঁহার পক্ষে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় জ্ঞান ইত্যাদি শব্দার্থের সম্যক্ ব্যবহার চলিতেছে তিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা।

এই আত্মা তপস্যা করিলেন। এস্থলে তপ অর্থে জ্ঞান। শ্রুতিতে আছে 'যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' যাঁহার তপ জ্ঞানময়। যিনি আপ্তকাম, তাঁহার পাইবার কিছু নাই। এই হেতু তপও তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। তিনি তপস্যা করিলেন ইহার অর্থ সৃজ্যমান জগৎ রচনাদি বিষয়ক আলোচনা করিলেন। তিনিই আলোচনা করিয়া প্রাণিকর্ম্মাদি নিমিত্ত অনুরূপ, সর্ব্বাবস্থ সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক অনুভূয়মান এই জগৎ দেশ কাল নাম রূপের সহিত সৃষ্টি করিলেন। এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? সেই জগতে অনুপ্রবেশ করিলেন।

এখন কথা হইতেছে স্রষ্টা নিজেই প্রবেশ করিলেন কি অন্য দ্বারা? যদি বল, যিনি স্রষ্টা তিনিই অনুপ্রবেশ করিলেন। না, এ কথা তুমি বলিতে পার না। ব্রহ্ম যদি মৃদ্বৎ কারণ হন তাহা হইলে কার্য্য তদাত্মক হইবে। ইহার হেতু এই, কারণই কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের প্রবেশ কৈ হইল? আর কার্য্যোৎপত্তির পরে পৃথক কারণের প্রবেশ স্বীকার ইহা একটা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। বলিতে পার ঘটপরিণাম ব্যতিরেকে মৃত্তিকার ঘটে প্রবেশ হইতে পারে না। যেমন ঘটে চূর্ণ ভাবে মৃত্তিকার অনুপ্রবেশ হয় সেইরূপ এই নামরূপ কার্য্যে আত্মার অন্য আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত অনুপ্রবেশ হইবে। শ্রুতি, 'অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য।' না তুমি এ কথা বলিতে পার না। কারণ ব্রহ্ম একই। মৃত্তিকার অনেকত্ব ও সাবয়বত্ব হেতু চূর্ণ ভাবে ঘটে অনুপ্রবেশ ঘটিতে পারে। কারণ মৃৎচূর্ণের খানিকটা স্থানে প্রবেশ ও খানিকটা স্থানে অপ্রবেশ থাকে। এই অপ্রবিষ্ট-দেশতা থাকায় তাহার অনুপ্রবেশ ঘটে কিন্তু আত্মার নহে। আত্মা এক ও নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্টদেশতা নাই। সুতরাং মৃদ্বৎ তাঁহার অনুপ্রবেশ হয় না। এখন তবে কিরূপে প্রবেশ হইতে পারে? শ্রুতিতে যখন আছে 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' তখন ইহা কিরূপে সম্ভব।

যদি বল তবে আত্মা সাবয়ব। এই সাবয়ব বলিয়া মুখে যেমন হস্ত প্রবেশ হয় সেইরূপ এই নামরূপ কার্য্যে জীবাত্মার সহিত তাঁহার অনুপ্রবেশ সম্ভব হইবে। না এ কথা বলিতে পার না, কারণ অন্য দেশই নাই। কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নামরূপ কার্য্যই দেশ, তদ্ব্যতিরেকে অন্য প্রদেশই নাই যাহাতে জীবাত্মার সহিত প্রবেশ সম্ভব হইবে। যদি বল কার্য্যাকারে পরিণত কারণে কার্য্য বিশেষ প্রবেশ করিবে। না, ইহাও বলিও না। এই কার্য্যাকার কারণে প্রবেশ করিলে জীবাত্মতা ত্যাগ হয়। ঘট মৃত্তিকাতে প্রবেশ করিলে আর কি ঘটত্ব থাকে? সুতরাং কারণে অনুপ্রবেশ ঘটে না। শ্রুতিতে

আছে 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' তৎ শব্দে ব্রহ্ম লক্ষিত, শ্রুতি তাঁহারই প্রবেশ নির্দ্দেশ করিতেছেন। তোমার এই সিদ্ধান্তে শ্রুতি-বিরোধও ঘটে। যদি বল জীবাত্মরূপ কার্য্য নামরূপে পরিণত কার্য্যান্তরকে পাইবে। না ইহাও হয় না, ইহাতে বিরোধ ঘটে। ঘট কিছু ঘটান্তরকে পায় না। এই কার্য্যা-ন্তর প্রাপ্তিতে জীবের মুক্তিও অসম্ভব হয়। যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে সেইটীরই প্রাপ্তি? কি আশ্চর্য্য! বদ্ধ চৌরের আবার শৃঙ্খল!!

যদি বল কারণ ব্রহ্ম শরীরাদি আধার তদন্তর্গত জীবাত্মা ও ধ্যেয় রূপে পরিণত হইয়াছেন। তাহাও হইতে পারে না। ইহাতে ব্রহ্মের বহিঃস্থ যে কোন বস্তুর প্রবেশই সঙ্গত হয়। যে যাহার অন্তস্থ সেই প্রবিষ্ট হইয়াছ এ কি কথা! অনুপ্রবেশ শব্দার্থ দ্বারাও বহিঃস্থেরই প্রবেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন দেবদত্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ভাল এখন বলিতে পার জলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ববৎ এই প্রবেশ স্বীকার করিব। না, তাহাও হয় না। ব্রহ্ম অপ-রিচ্ছিন্ন ও অমূর্ত্ত। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্ত পদার্থেরই স্বচ্ছ জলাদিতে প্রতিবিম্বোদয় হইয়া থাকে আকারাদির কারণ আত্মার অমূর্ত্তত্ব ও ব্যাপকত্ব হেতু তাহা ঘটিবে না। আর যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িবে তাহা বিপ্র-কৃষ্ট বা দূরস্থ হওয়া চাই। দেখাইতে পার কি কোন্ প্রদেশটী ব্রহ্ম হইতে দূর? তবে প্রতিবিম্বপাত কিরূপে ঘটে। তবে তো দেখিতেছি আত্মার কার্য্যপ্রবেশ হয় না, এখন প্রবেশ শ্রুতির উপায়? কিন্তু অবশ্য শ্রুতি আমাদিগের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মাই-বার হেতু। কিন্তু যত্নবান লোকেরও এই প্রবেশ শ্রুতি হইতে কোনই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তবে কি এখন অন্ধের মণিপ্রাপ্তির ন্যায় এই শ্রুতি নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে? না, তাহাও নয়, ইহা অন্যার্থপর। এই শ্রুতি বাক্যের বিবিক্ষিত প্রকৃত অর্থ আছে সেইটী এখন স্মরণ করিতে হইবে। 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত, যিনি গুহানিহিত ইহাঁকে জানেন' এই সমস্ত শ্রুতিতে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানটী বিবক্ষিত হইয়াছে এবং সেই বিজ্ঞানই শ্রুতিতে প্রকৃত বা প্রক্রান্ত। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধির নিমিত্ত আকাশাদি হইতে অন্নময় পর্য্যন্ত কার্য্য প্রদ-র্শিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মানুগতিও আরব্ধ হইয়াছে। পরে ঐ শ্রুতিতে 'অন্নময় আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত অভ্যন্তরস্থ আত্মা প্রাণময়, তদভ্যন্তরস্থ মনোময়, বিজ্ঞানময় ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। পরে এই বিজ্ঞান বা বুদ্ধি গুহাতে প্রবেশিত আনন্দময় বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন বুঝ এই পরমানন্দময় আত্মার অধিগম দ্বারা আনন্দ বিবৃদ্ধি মাত্র অবসান সর্ব্ব বিকল্পাস্পদ ব্রহ্ম এই বিজ্ঞান গুহাতেই প্রাপ্তব্য এই অভি-প্রায় করিয়া এই প্রবেশ বাক্য কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ এই হেতু বুদ্ধি-গুহা ব্যতীত অন্যত্র উপলব্ধ হইতে পারেন না, বিশেষ সম্বন্ধই তদুপলব্ধির হেতু। যেমন চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধ নিবন্ধন রাহুর উপলব্ধি সেইরূপ অন্তঃকরণ সম্বন্ধই ব্রহ্মের উপল-ব্ধির কারণ। কারণ, অন্তঃকরণ তৎসন্নি-কৃষ্ট ও অবভাসাত্মক। যেমন আলোক বিশিষ্ট ঘটাদির উপলব্ধি হয় সেইরূপ বুদ্ধি-প্রত্যয়রূপ আলোক বিশিষ্ট আত্মার উপ-লব্ধি হইয়া থাকে এইজন্য ব্রহ্মউপলব্ধি হেতু গুহাতে নিহিত ইহাই প্রকৃত।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৪৭ সংখ্যা ১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২ কলিগতাব্দ ৫০০৬। ১ কার্ত্তিক বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ্যের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সম্মুখে দুর্গোৎসব, এই সময়ে কর্ম্মচারীগণের বেতনাদি হিসাবে সমস্ত চুকাইয়া দিতে হইবে তন্নিমিত্ত কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এতকাল জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ-দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ২১ ভাদ্র, বুধবার।

বৈরাগ্য।

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ।"

বাল্যকাল হরিলে হে ক্রীড়াপ্রসঙ্গে,
যৌবন ভুষিলে সদা কাম-রস-রঙ্গে।
বৃদ্ধকাল হরিলে হে চিন্তার তরঙ্গে,
প্রেম করিবে কবে ব্রহ্ম-রত্ন সঙ্গে।

বিফলে গেলরে জীবন, উঠ জাগ; "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" জাগিয়া—মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া জীবননাথকে দেখ। তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইয়া ডাক, বিমলানন্দ ভোগ কর, এবং অশ্রুবারি দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত কর। তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হও, শরীর মন আত্মা তিনই শীতল হইবে "হও ব্রহ্মরসে মগ্ন, হবে দুঃখ ক্লেশ ভগ্ন"। মিছে এ অসার সংসারের মায়ায় ভুলিও না। "মায়া-হ্রদে ডুবো না।- পাপ রসে সুখাভাসে ভুল না। সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা।" ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই, সংসার ক্ষুদ্র পদার্থ, এখানে যাহারি জন্ম তাহারি মৃত্যু, এখানে যাহা এই আছে, পরক্ষণে তাহা আর নাই; এখানে, যেখানে সুখ সেই স্থানেই দুঃখ। তৃপ্তি, সেই তৃপ্তিস্থান ব্যতীত আর কোথাও মিলিবে না। এখানকার চঞ্চল বিষয় সকলের মধ্যে বৃথাই সুখ অন্বেষণ করিতেছ, "বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরই আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায়। কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল ফণি দংশিবে তোমায়। দুঃখ যেন দুর্দ্দিন, সুখ খদ্যোতিকা হেন, মনরে নিশ্চয় জেনো সংসার কান্তারে।" এখানকার সকলই ক্ষণভঙ্গুর, সকলই অসার, সকলই অনিত্য অস্থায়ী; সকলই কিছুদিন পরে অতৃপ্তিকর। বিষয় ভোগ কর, আজি যাহা ভাল লাগিবে, কালি তাহা আর ভাল লাগিবে না। যেমন স্বর্ণবলয় পরিধান করিতে করিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভোগের পদার্থ ভোগ করিতে করিতে তাহার আর স্বাদ পাওয়া যায় না। এমন কি, অতি পবিত্র বিষয় ভোগ করিতে করিতে তাহার প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মে। এই হেতু ব্রাহ্মধর্ম্ম মধুরস্বরে উপদেশ দিতেছেন,

"সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানোবীতরাগাঃপ্রশান্তাঃ।"

"ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন।" এই প্রকৃতি কি আমাদিগকে বিষয়ে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে না? সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছে না? ঈশ্বরের প্রেমে—সেই ভূমা ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইতে বলিতেছে না? ঐ দেখ সরোবরে সরোজিনী প্রাতে সূর্য্যের আলোকে প্রস্ফুটিত হইয়া রূপের ছটায় জল উজ্জ্বল করিতেছে, সন্ধ্যাকালে সে আর নাই! তাহার দল সকল মলিন ও বিবর্ণ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। রাত্রিতে কুমুদিনী কৌমুদীর শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া জগৎকে শোভাময় করিতেছে, প্রাতে সে আর কোথায়! কোথায় আর তার হৃদয়-আকর্ষণী শোভা! ঐ যে চন্দ্রমা রজনীতে এত শোভাশালী ও আহ্লাদদায়ী, প্রাতে সে কি শ্রীহীন ও মলিন! এইরূপ সংসারের সকলই। এই যে তোমার সাধ্বী কুললক্ষ্মীর অঙ্কে আজি সোনার চাঁদ পুত্র আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, যাহার মুখমণ্ডলে তোমার মুখচ্ছবি দেখিয়া তোমার গৃহিণী আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইতেছে, হায় সে হয় ত কালি এ সংসার হইতে অদৃশ্য হইবে। না হয় ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তোমাদের হৃদয়ে কঠিন মর্ম্মবেদনা দিবে। ঐ যে তোমার স্ত্রী, যাহাকে তুমি তোমার শরীরের অর্দ্ধেক বলিয়া জান, তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে হয় ত তোমাকে কোন একদিন, হৃদয়ে বজ্রপতনেরযাতনা সহিতে হইবে। ঐ ধন যাহার গর্ব্বে তুমি সকলকেই তৃণতুল্য দেখ, সেই ধনই হয় ত তোমাকে একদিন বিপজ্জালে জড়িত করিবে। এখানে বন্ধুর সহিত মিলিত হও, সে হয় ত, একদিন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য স্থানে লইয়া যাও, সে হয় ত দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিবে। অতএব কোথায় আর হৃদয়কে বিন্যস্ত করিবে? যে দিকে চাও সেই দিকেই জ্বালা, সেই দিকেই কণ্টক, সেই দিকেই দুঃখের শত শত বাণ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, এখনও কি কোথায় হৃদয় রাখিতে হইবে বলিয়া দিতে হইবে? আপনার হৃদয়কে সংযত কর—পবিত্র কর। আর হৃদয় মধ্যে সেই হৃদয়নাথকে দর্শন কর; দুঃখের মধ্যে এই একমাত্র শান্তি। আর ত কিছুই দেখিতে পাই না। কাতর প্রাণে ডাকিলে কেন তিনি তোমায় দর্শন দিবেন না? কেন হৃদয়কে বশীভূত করিবার শক্তি দিবেন না? এ সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করা বড় কঠিন; কিন্তু কাতর প্রাণে তুমি তাঁহাকে ডাক তিনি তোমার আসক্তি দূর করিয়া দিবেন। তুমি তাঁর জন্য কাতর হইলে না? ব্যাকুল হইলে না? উদাস হইয়া তাঁর জন্য একবিন্দু প্রেমাশ্রুপাত করিলে না, তাই বল, সুখ কোথায়, আনন্দ কোথায়? তিনিই বা কোথায়? ঈশ্বরহীন যে সংসার, তাহাকে ছুড়ে ফেলিয়া দাও। এ সংসার তোমায় কখন সুখী করে নাই এবং কখন সুখী করিবেও না। এই সকল দুঃখে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তুমি সুখধাম অন্বেষণ কর। তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হও। তিনি তোমায় দেখা দিবেন, তিনি সকল দুঃখ নিবারণ করিবেন। তিনি পরমানন্দে তোমায় নিমগ্ন করিবেন। তিনি অন্তরে বাহিরে তোমায় দেখা দিয়া

তৃপ্ত করিবেন। ঐ যে পবিত্রসলিলা গঙ্গা দুই ধারে বৃক্ষরাজির মালা পরিধান করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তুমি কি কখন তাহার তটে বসিয়া তাহার নির্ম্মল জলে সেই নির্ম্মল পরমেশ্বরকে উপলব্ধি কর নাই? তুমি কি কখন তাহার কল্‌কল্‌ শব্দের ভিতর সেই অশব্দ পরমেশ্বরের সুকোমল কথা শুন নাই? যদি না শুনিয়া থাক তবে তুমি অধ্যাত্ম জগতে নিশ্চয়ই বধির। ঐ যে নির্ম্মল নীলাকাশে গভীর নিশীথে চন্দ্রমা ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার শোভার মধ্যে কখন কি সেই শোভার আকরকে দেখ নাই? সুশীতল বায়ুর স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া কখন কি সেই জগন্মাতার হস্তের স্পর্শসুখ অনুভব কর নাই? কেবল যে স্পর্শসুখ পরিণামবিরস তাহাই অনুভব করিবে? যেমন বাহিরে তাঁহাকে তাঁহার মহিমার মধ্যে দেখিবে, অন্তরে সেই হিরণ্ময় সিংহাসনে আবার তাঁহাকে তাহা অপেক্ষাও অধিক করিয়া দেখিবে। একবার তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন কর, সেই শান্তি-সমুদ্রে ডুবিয়া যাও, একবার আত্মহারা হও। এস একবার সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বলি, কোথা নাথ অনাথ নাথ! প্রাণ যে তোমার জন্যই আকুল, "কাতর আমার প্রাণ সংসারে, ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান, আর কার দ্বারে যাব তোমা ছাড়ি; দাও মোরে শান্তিদান।"

"আমায় এই ভিক্ষা দাও গো পিতা,
রয় যেন মন তোমার পদে।
মোহমদে মত্ত হ'য়ে রই নে যেন
পাপের হ্রদে॥
সংসারেরি সুখ যত, চাই নে হ'তে
তাতে রত।
ও জানি জানি ভাল জানি, ও তায়
দুঃখ ঘটে পদে পদে॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতরে-ভিতরে মনুষ্যমাত্রই সত্যের অন্বেষী। কিন্তু লোকসমাজে বয়স্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মুখে এইরূপ ভাণ করেন যে, "সত্যে আমার কাজ নাই—সত্যের বদলে একমুটা অন্ন পাইলে বর্ত্তিয়া যাই; কেন না, সত্যে পেট ভরে না—অন্নে পেট ভরে।" লোকের এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। যদি জল তুলিতে হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কলস তৈয়ারি করা চাই। সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সত্যের ধারণক্ষম পাত্র তৈয়ারি করা চাই। অন্নাভাবে যাহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, সে ব্যক্তি সত্যগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। প্রাণের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ রহিয়াছে। একতালায় প্রাণ, দোতালায় মন, তেতালায় জ্ঞান। মনুষ্যের প্রাণের উপরে মন, মনের উপরে জ্ঞান উপর্য্যুপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তবে মনুষ্য সত্যের উপযুক্ত বাসস্থান হয়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যশরীরে উদরের উপরে হৃদয়, হৃদয়ের উপরে মস্তক উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সত্য আপনার বাসস্থান আপনিই তৈয়ারি করিতেছেন—সে বাসস্থান মনুষ্য। পশুপক্ষীরা অন্ন পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়; মনুষ্য রাজভোগেও পরিতৃপ্ত হয় না—মনুষ্য চায় সত্য। মনুষ্যের চক্ষু ফুটিয়াছে। মনুষ্য জানিতে পারিয়াছে যে, রাজভোগও যেমন, দেবভোগও তেমনি—সবই ক্ষণস্থায়ী। কাজেই, চিরস্থায়ী পদার্থের অন্বেষণ মনুষ্যের একটা দৈনিক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণ, মন এবং জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমনটি হওয়া চাই, তাহা কার্য্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। পৃথিবীতে সত্যের বাস-

স্থান সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিগঠিত হইয়া দাঁড়ায় নাই। এক কথায়—মানুষ এখনো মানুষ হইয়া ওঠে নাই। প্রকৃতিমাতা মানুষকে মানুষ করিতেছেন নির্নিদ্রনয়নে। তথাপি মানুষের মানুষ হইতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। মানুষ এখনো ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুল্লুক ছাড়াইয়া মানুষের মুল্লুকে পৌঁছে নাই। পৌঁছে নাই বটে, কিন্তু অচিরে পৌঁছিবে, তাহার জোগাড় হইতেছে পৃথিবীময় সর্ব্বত্র; কেন না, প্রকৃতিমাতার স্নেহচক্ষু মনুষ্যের উপরে ক্রমাগতই লাগিয়া রহিয়াছে।

ভিতরে-ভিতরে কিন্তু মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধিই মানুষ। ক্রোড়স্থ শিশুও জ্ঞানের জন্য আঁকুপাঁকু করে। স্তনদুগ্ধের সঙ্গেসঙ্গেই মনুষ্য জ্ঞানামৃত পান করিতে থাকে। নবাগত মনুষ্যের চাহনিই স্বতন্ত্র। শিশুর চাহনির কিছুতেই পেট ভরে না। ক্রোড়স্থ শিশু মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া সকল বিষয়েরই সমাচার জানিতে চায়। শিশুর ভিতরে-ভিতরে জ্ঞান অল্পে-অল্পে উদ্বোধিত হইয়া সত্যের প্রতি হাত বাড়াইতে থাকে—যদিও সত্য আকাশের চাঁদ।

প্রকৃতিমাতার চক্ষে লোকশিরস্থ মহাজ্ঞানী এবং মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মধ্যে অল্পই প্রভেদ। শিশুর জ্ঞানোপার্জ্জনপ্রণালী কিরূপ? মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর যেমন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, মাতার মুখ-চক্ষু হইতে স্নেহভরা সত্য পান করিয়া শিশুর তেমনি জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর নিকটে মাতার মুখচক্ষুই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; সে জানে—মাতার মুখচক্ষুতে সব সত্য একঠাঁই ভরা রহিয়াছে। ইহাই জ্ঞানোপার্জ্জনের আদিম প্রণালী। আদিম ঋষিরা প্রকৃতিমাতার মুখচক্ষু হইতে সত্য পান করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইত; তাঁহাদিগকে পুঁথিপাঁজির দ্বারস্থ হইতে হইত না। স্তনদুগ্ধ যেমন সাক্ষাৎ প্রাণ, তেমনি আদিম ঋষিরা প্রকৃতিমাতার মুখচক্ষু হইতে যে রকমের সত্যামৃত পান করিতেন, তাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞান। এই যে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ-উপলব্ধি—ইহা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান—খাঁটি জ্ঞান। এক্ষণে সাক্ষাৎ-উপলব্ধি যে পদার্থটা কি, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

সাক্ষাৎ-উপলব্ধি।

ধ্বনির স্রোত আমাদের এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া আরেক কান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; আলোকের স্রোত আমাদের চক্ষুর মধ্য দিয়া বহিয়া চলিতেছে। তড়িদ্‌বেগে বহিয়া চলিতেছে বলিলে কিছুই বলা হয় না—সত্য এই যে, তড়িৎ অপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক বেগে বহিয়া চলিতেছে। সাক্ষাৎ-উপলব্ধি ইহার কোন্‌খানটায়? তোমার সম্মুখ দিয়া নদী যখন দ্রুতবেগে বহিয়া চলিতেছে, তখন তুমি তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ—"এই নদী।" যাহাকে বলিতেছ "এই নদী," সে নদী কোথায়? যেই বলিতেছ "এই," অমনি তাহা নেই। তুমি যাহাকে বলিতেছ "এই নদী," সে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া নেই-নদী হইয়া সরিয়া পলাইয়াছে। নদীর স্রোতও যেমন, ধ্বনির প্রবাহও তেমনি, আলোকের রশ্মিও তেমনি—সবই দুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—এক নৌকা হ'চ্চে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত, আর-এক নৌকা হ'চ্চে অতীত মুহূর্ত্ত। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই জীবন্ত মুহূর্ত্ত, অতীত মুহূর্ত্ত মৃত মুহূর্ত্ত। যাহা বর্ত্তিয়া থাকিতেছে, তাহারই নাম বর্ত্তমান। বর্ত্তমান কাল বর্ত্তিয়া থাকিবার কাল—বাঁচিয়া থাকিবার কাল। বর্ত্তমান কাল সজীব কাল—তাই বর্ত্তমান

কাল আমাদের জীবনের উপরে—প্রাণের উপরে—কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, মৃত ব্যক্তিকে যেমন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না—কেবল মনে স্মরণ হয় মাত্র, অতীত কাল সেইরূপ আমাদের মনের স্মরণেতেই যাওয়া-আসা করে, তা বই, বর্ত্তমানের ন্যায় তাহা আমাদের প্রাণের হস্তে ধরা দ্যায় না। বর্ত্তমান কালের দর্শন হ'চ্চে প্রাণের ব্যাপার, অতীত কালের স্মরণ হ'চ্চে মনের ব্যাপার; এই দুই ব্যাপারের উপরে ভর দিয়া বুদ্ধি-ব্যাপার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। বুদ্ধি-ব্যাপার কি? না, "এটা এই"—এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া। আমরা প্রথমে বলি "এটা," তাহার পরমুহূর্ত্তে সেই এটা'র পরিবর্ত্তে যখন তাহার যমক-সহোদর আর-একটা আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই দ্বিতীয়-এটাকে আমরা বলি "এই"; আর তাহা যখন বলি—দ্বিতীয় এটাকে অর্থাৎ আর-একটাকে যখন আমরা বলি "এই",—তখন প্রথম "এটা" আমাদের স্মরণে টাট্‌কা রহিয়াছে যেন সাক্ষাৎ বর্ত্তমান; সেই প্রথম-এটা যাহা আমাদের স্মরণে জাগিতেছে এবং তাহার জুড়ি এই দ্বিতীয়-এটা যাহাকে আমরা এক্ষণে বলিতেছি "এই"—এই দুই এটাকে এক বন্ধনে বাঁধিয়া আমরা বলি "এটা এই।" ইহারি নাম বুদ্ধির নিশ্চয়-ক্রিয়া। (১) প্রাণ বর্ত্তমানকে ধরে, (২) মন অতীত'কে ধরে, এবং বুদ্ধি বর্ত্তমান এবং অতীত উভয়কে একীভূত করিয়া ত্রৈকালিক ধ্রুববস্তুকে উপলব্ধি করে। ইহারই নাম বাস্তবিক সত্তা'র উপলব্ধি। বাস্তবিক-সত্তা'র উপলব্ধিতে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনই একযোগে কার্য্য করে। প্রাণ করে—দর্শন, মন করে—স্মরণ, এবং বুদ্ধি করে—তত্ত্ব-অবধারণ। এই যে তিনটি ব্যাপার—দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, তিনই সমান আশ্চর্য্য। যদি মনে কর যে, দর্শন তো অষ্টপ্রহরই করিতেছি—স্মরণও তাই; তত্ত্বনিরূপণটাই কেবল সব সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না—অতএব তত্ত্বনিরূপণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য, তবে সেটা তোমার বড়ই ভুল। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি বলিতেছি যে, গত কল্য আমি কাশীতে ছিলাম। গতকল্য সত্যসত্যই যে আমি কাশীতে ছিলাম, তা-হার প্রমাণ কি? তোমার নিকটে তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে তাহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। কেন না, আমার স্মরণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম। যদি বলো যে, তোমার এই যে স্মরণ—এ তো তোমার বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তি; বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তিকে অতীত ঘটনা'র সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ কোন্ যুক্তিতে? "ঐখানটিতে ঐ দেয়ালটা রহিয়াছে" এটা যেমন তুমি তোমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছ; গতকল্য "তুমি কাশীতে ছিলে" এটাও কি তুমি সেইরূপে তোমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছ? তাহা তুমি বলিতে পার না—কেন না, যাহাকে তুমি বলিতেছ "ঐখানটি", তাহা তোমার চক্ষের সম্মুখে বাস্তবিকই উপস্থিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে, যাহাকে তুমি বলিতেছ "গতকল্য", তাহা কোনোকালেই তোমার চক্ষের সম্মুখে জাবিতমান ভাবে—অর্থাৎ সত্যসত্যই—উপস্থিত হইতে পারে না। তবে যে বলিতেছ যে, তোমার মনশ্চক্ষে তাহা উপস্থিত—সে কেবল কল্পনাতে। কিন্তু কল্পনাকে বিশ্বাস কি? আমি যদি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতাম যে, "গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম," তবে কি তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম? স্পষ্ট

আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমি গতকল্য কাশীতে ছিলাম, তাই তাহা আমার নিকটে ধ্রুবসত্য। স্মরণ এবং কল্পনা দুইই আমার আপনার, অথচ স্মরণের কথার যাথার্থ্যে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইতেছে ভরপূর—কল্পনার কথার যাথার্থ্যের মূল্য আমার নিকটে কিছুই নহে। এক যাত্রায় এই যে পৃথক্ ফল—ইহা কি কম আশ্চর্য্য! স্মরণ এই তো এক আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দর্শন আবার আর-একতরো আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ বলে আমায় দ্যাখ্—ও বলে আমায় দ্যাখ্। এমন কি, দর্শন এবং স্মরণের মধ্যে যে প্রভেদ কোন্‌খানটায়, তাহার ঠিকানা পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী :—

মনে কর, একটা অঙ্গুলিপরিমাণ আগ্নেয়-নলিকা (যেমন হাউইবাজি'র চোঙা) ক-স্থান হইতে ছুটিয়া ঘ-স্থানে পৌঁছিল। তাহা ঘ-স্থানে পৌঁছিবামাত্র দর্শকের চক্ষে একটি আগ্নেয় বিন্দু ঘ প্রকাশ পাওয়াই উচিত; কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে—শুধু-কেবল সেই আগ্নেয় বিন্দুটি না, পরন্তু ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত সমস্ত ক-খ-গ-ঘ-পথ জুড়িয়া একটা সুদীর্ঘ আগ্নেয় রেখা। হইতেছে একটি আশ্চর্য্যব্যাপার—দৃশ্যমান ঘ-বিন্দুর সঙ্গে স্মৃতিপথের ক, খ, গ, বিন্দুগুলা সংস্কারের আটায় জোড়া লাগিয়া-গিয়া ক-খ গ-ঘ পথের আগাগোড়া সমস্তটা দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানের দর্শন, অতীতের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের কল্পনা, এই তিন স্যাঙাত্ কাঁধ-ধরাধরি করিয়া একসঙ্গে দৌড়িয়া চলিতেছে। দৃষ্টির হ্যাঁপায় পড়িয়া স্মৃতিও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে—কল্পনাও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। এস্থলে (১) সম্মুখে-বর্ত্তমান আগ্নেয় বিন্দু দৃষ্টির বিষয়, (২) অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের আগ্নেয় বিন্দু স্মৃতির বিষয়, এবং (৩) অব্যবহিত ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তের আগ্নেয় বিন্দু কল্পনায় গড়িয়া-তোলা—এই তিন আগ্নেয় বিন্দু, আর সেই সঙ্গে দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, এই তিন মনোবৃত্তি, একেবারেই এক। দর্শনের গায়ে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, স্মরণ এবং কল্পনা মাখা রহিয়াছে—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের গায়ে অতীত-মুহূর্ত্ত এবং ভবিষ্যৎ-মুহূর্ত্ত মাখা রহিয়াছে। বর্ত্তমানকে যেমন অতীত এবং ভবিষ্যতের সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন, দর্শনকে তেমনি স্মরণ এবং কল্পনার সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন।

উপরে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি সাক্ষাৎ-উপলব্ধি, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, তিনের মিলিতাঙ্গ। তাহা শুধুই কেবল দর্শনের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল স্মরণের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল কল্পনার ব্যাপার নহে;—তাহা দর্শন-এবং-স্মরণ সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। অথবা, যাহা একই কথা—প্রাণ-এবং-মন-সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। প্রাণের সহিত দর্শনের এবং মনের সহিত স্মরণের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা যদিচ পূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি—তথাপি তাহা আরেকবার বলি :—

(১) বর্ত্তমানের বিষয়ই দর্শনের বিষয়।

(২) যাহা বর্ত্তিয়া থাকে বা বাঁচিয়া থাকে, তাহাই বর্ত্তমান। যাহা জীবিতমান, তাহাই বর্ত্তমান; প্রাণই বর্ত্তমান। দর্শনের ব্যাপার প্রাণেরই ব্যাপার।

(৩) যাহা অতীত, তাহা মৃত। অতীতেরই স্মরণ হয়—মৃতেরই স্মরণ হয়। দর্শন হয় চক্ষে বা চাক্ষুষ প্রাণে, স্মরণ হয় মনে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের যোগে—প্রাণ এবং মন দুয়ের যোগে—বুদ্ধিতে লক্ষ্যবস্তুর সাক্ষাৎ-উপলব্ধি সঙ্ঘটিত হয়। সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষের প্রতি

অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমি যখন বলি যে, "এটা বটবৃক্ষ," তখন আমার বুদ্ধি করে কি? না, পূর্ব্বদৃষ্ট বটবৃক্ষ যাহা আমার স্মরণে জাগিতেছে, তাহার সহিত দৃশ্যমান বটবৃক্ষকে একীভূত করিয়া বটবৃক্ষরূপী বস্তুতে অবগাহন করে। আমার সম্মুখ দিয়া যখন নদীর প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে, তখন যে জলরাশি সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, তাহা চক্ষুর মধ্য দিয়া আমার প্রাণের উপরে কার্য্য করিতেছে, এবং যে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, তাহা স্মৃতির মধ্য দিয়া আমার মনের উপরে কার্য্য করিতেছে। বুদ্ধি করিতেছে কি? না, যাহা উপস্থিত হইতেছে এবং যাহা চলিয়া যাইতেছে, দুইকে একদৃষ্টিতে দেখিয়া নদীরূপী বস্তুতে অবগাহন করিতেছে। বুদ্ধি যে-নদীকে উপলব্ধি করিতেছে, তাহা শুদ্ধ-কেবল বর্ত্তমানের দৃশ্য নদী নহে—অতীতকালের স্মৃত নদীও নহে, পরন্তু দৃশ্য এবং স্মৃত এই দুই নদীকে লইয়া যে এক নদী, সেই-নদীরূপী বস্তু। দর্শনের ব্যাপার এবং স্মরণের ব্যাপার কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কিন্তু বুদ্ধি যেরূপে বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তা উপলব্ধি করে, তাহার ন্যায় আশ্চর্য্য জগতে আর কিছুই নাই। বিশেষ আশ্চর্য্য যে কোন্‌খানটায়, তাহা বলিতেছি প্রণিধান করুন:—

ঐ বটগাছটিকে দেখিয়া আমি বলিতেছি "এটা বটগাছ।" এ যাহা আমি বলিতেছি এ কথাটি সত্য। কেন না, বটগাছের ভাব যাহা আমার মনে বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত লক্ষ্যবস্তুটির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এই যে মিল, ইহারি নাম সত্য। আর, মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এইরূপ মিল ঘটাইবার যিনি কর্ত্রী, তাঁহারই নাম বুদ্ধি। পুনশ্চ, অন্তঃকরণে ঐরূপ মিলের যে উপলব্ধি (সত্যের যে উপলব্ধি,) তাহারই নাম জ্ঞান। "এটা বটবৃক্ষ" এই জ্ঞানটি জন্মিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদৃষ্ট অনেকানেক বটবৃক্ষের একটা সাধারণ আদর্শ বা নক্সা জ্ঞাতার মনে বর্ত্তমান থাকা চাই; সেই সাধারণ আদর্শটি দৃশ্যমান বটবৃক্ষের সহিত স্মৃত বটবৃক্ষের মিল ঘটাইয়া দ্যায়। পূর্ব্বে আমি বটবৃক্ষ দেখিয়াছি, তাই আমি এক্ষণে বলিতে পারিতেছি যে, "এটা বটবৃক্ষ।" পূর্ব্বে যদি আমি বটবৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে আমি "বটবৃক্ষ" না বলিয়া শুদ্ধকেবল বলি যে, "এটা বৃক্ষ।" পূর্ব্বে যদি আমি বৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে বৃক্ষ না বলিয়া বলি যে, "এটা একটা বস্তু।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বে যদি আমি বস্তুও না দেখিয়া থাকি, তবে আমি সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষটাকে কি বলিব? নবপ্রসূত বালকের মনে যখন সবেমাত্র প্রথমজ্ঞানের উদ্বোধন হইয়াছে, তখন সেই প্রথমজ্ঞানের অবলম্বন শুধুই কি কেবল সম্মুখের দৃশ্যবিষয়, না, তা ছাড়া আরো-কিছু? এটা দেখা চাই যে, সেই জ্ঞানটিই শিশুটির প্রথম জ্ঞান, তাহার পূর্ব্বে তাহার কোনো জ্ঞানই ছিল না; এরূপ স্থলে এ কথা খাটে না যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুসকলের একটা সাধারণ নক্‌সা শিশুর মনে বর্ত্তমান আছে, আর, সেই নক্‌সার সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুর ঐক্য-উপলব্ধি-হওয়া-গতিকে জ্ঞানের উদ্বোধন হইল। কাজেই বলিতে হয় যে, সেই প্রথমজ্ঞানের পূর্ব্বসূত্র একপ্রকার অব্যক্ত সংস্কার, তা বই, তাহা কোনোপ্রকার আঁকিয়া-জুঁকিয়া প্রস্তুত-করা নক্‌সা নহে। সর্ব্বাদিম প্রথমজ্ঞানে দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, এই তিন মনোবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে না একচুলও। আদিম-উদ্ভিদ-সম্বন্ধে (Protoplasm সম্বন্ধে)

যেমন আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা বীজ, বৃক্ষ এবং ক্ষেত্র, তিনই একাধারে; আদিমজ্ঞান সম্বন্ধেও তেমনি আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, তিনই একাধারে। অর্থাৎ আদিমজ্ঞানে দর্শনই স্মরণ, স্মরণই দর্শন এবং তাহাই তত্ত্বনিরূপণ। আদিমজ্ঞানের সম্মুখে বিষয়ের উপস্থিতি এবং পশ্চাতে সংস্কারের গোড়াবন্ধন, দুইই শুদ্ধকেবল ঐশী শক্তি দ্বারা সম্ভাবিত হয়; তা বই, দুয়ের কোনোটিতেই জ্ঞাতার নিজের কোনো হস্ত নাই। ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা শুধুই কি কেবল আদিমজ্ঞানে? নব্যতম পরিপক্ক জ্ঞানে কি ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে কম? এই কথাটি বারান্তরে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখিয়া দেওয়া হইল।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

(তৃতীয় উপদেশ।)

সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের প্রকৃত মূল্য।

সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্তা, উহাদের বর্ত্তমান ও আদিম অবস্থা, আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। এখন উহাদের প্রকৃত মূল্য কি—তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্ত বৈধরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে তাহাও বিচার করিতে হইবে। এইবার আমরা তত্ত্ববিদ্যার অধিকার ছাড়াইয়া, ন্যায়ের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

আমরা, লক্ ও লক্‌প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে, কতকগুলি তত্ত্বের সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবিতা সমর্থন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা ক্যাণ্টের সম্মুখে উপস্থিত। তিনিও আমাদের ন্যায়, এই সকল তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি "বিষয়ী"র (subject) কতকগুলি সীমা কল্পনা করিয়া, সেই সীমার মধ্যে ঐ তত্ত্বগুলির সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ তত্ত্বগুলি "বিষয়ী"-গত (subjective) অর্থাৎ, অন্তর্মুখী, সুতরাং "বিষয়"-সমূহে, অর্থাৎ বহির্বিষয়ে উহাদের প্রয়োগ হইতে পারে না। অর্থাৎ, ক্যাণ্টের ভাষায়, উহারা (subjectiveity) "বিষয়ত্ব"-বিহীন অর্থাৎ বহির্মুখী নহে। (যুক্ত হউক বা অযুক্ত হউক, "বিষয়" ও "বিষয়ী" এই পারিভাষিক শব্দদ্বয়, য়ুরোপীয় দার্শনিক ভাষায় চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।)

এই নবোত্থাপিত তর্কের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি—একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। যে সকল তত্ত্ব, আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে পরিশাসন করে, যাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেরই শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া নেতৃত্ব করে, যাহা আমাদের সমস্ত কার্য্যকে নিয়মিত করে—সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার-সত্য বর্ত্তমান,—না, উহারা শুধু আমাদের চিন্তার নিয়ামক মাত্র? ব্যাপারমাত্রেরই কারণ আছে, গুণমাত্রেরই আধার-বস্তু আছে, বিস্তৃতি-মাত্রই আকাশে অবস্থিতি করে, পারম্পর্য্যমাত্রই কালে সংঘটিত হয়,—এই সমস্ত, বাস্তবিক-সত্য কি না,—এক্ষণে তাহাই জানা আবশ্যক। "গুণমাত্রের আধার বস্তু আছে"—ইহা যদি বাস্তবিক-সত্য না হয়, তাহা হইলে, "আমাদের আত্মা আছে"—ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; যেহেতু, আমাদের আত্মচৈতন্য-প্রতিভাত সমস্ত গুণের আধার-বস্তুই আত্মা। যদি কারণ-তত্ত্ব শুধু আমাদের মনের একটি নিয়মমাত্র হয়, তাহা

হইলে, এই তত্ত্বের দ্বারা যে বাহ্য জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, সেই বাহ্য জগতেরও বাস্তবিকতা বিনষ্ট হয়; তাহা হইলে, হিউম্ যেরূপ বলিতে চাহেন,—এই বাহ্যজগৎ, ব্যাপার-সমূহের পারম্পর্য্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়;—উহাদের মধ্যে কাহারো উপর কাহারো আর কার্য্যকারিতা থাকে না। ইহা স্বীকার করিলে আত্মারও অস্তিত্ব থাকে না,—কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না,—সমস্তই কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল অবভাস-মাত্রে পরিণত হয়; সমস্তই "হইবার" দিকে চিরকাল উন্মুখ,—"হইয়াছে" বলিয়া কিছুই থাকে না। কেন না, "হইয়াছে" বলিলেই কোথাও হইয়াছে, কোনও সময়ে হইয়াছে—এইরূপ বুঝায়। কিন্তু যদি দেশ কালের বাস্তবিকতা কিছুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে ওকথা আর কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আমাদের বুদ্ধি যদি শুদ্ধ মানবের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াই ক্ষান্ত হয়,—তাহা হইলে, যখনি এই সাংঘাতিক রহস্যটি আমাদের বুদ্ধির নিকট প্রকাশিত হইবে যে, কোন-কিছুরই বাস্তবিক-সত্তা নাই,—তখন আর আমরা কিছুরই কারণ অনুসন্ধান করিয়া মনকে ক্লান্ত করিব না;—আমাদের মনের বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুসারে যে সকল সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক,—তখন সেই সম্বন্ধগুলি নির্ণয় করিয়াই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব; পদার্থসমূহের প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য আমাদের আর আগ্রহ থাকিবে না,—উহা আমাদের বুদ্ধির গ্রাহ্য হইবে না। যদি কারণ-তত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, চরম-কারণতত্ত্ব, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি,—এই সমস্তের বাস্তবিকতা কিছুই না থাকে—উহা যদি আমাদের অলীক কল্পনা-মাত্র হয়, তাহা হইলে, এই সকল তত্ত্বের দ্বারা, যে ঈশ্বরের সত্তা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, সেই ঈশ্বরের সত্তাও আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে;—ক্যাণ্টের অর্থাৎ "তত্ত্ববিচার"-গ্রন্থের এক ফুঁয়ে, অন্যান্য সমস্ত পদার্থের ন্যায়, ঈশ্বর-তত্ত্বও উড়িয়া যায়।

রীড্ ও আমাদের ন্যায়, ক্যাণ্টও সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্তা সিদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ক্যাণ্ট, যে প্রত্যক্ষবাদীগণকে তাঁহার প্রতিপক্ষ বলিয়া মনে করেন,—যুগধর্ম্মের প্রভাবে, অনিচ্ছাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে, তাহাদিগেরই তিনি শিষ্য ও সেবক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহাদের নিকট তিনি নিজের মত অনেকটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ক্যাণ্ট বলেন, ঐন্দ্রিয়িক-চেতনার উপর বহির্বিষয়ের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, শুধু সেই প্রতিবিম্বগুলিতেই এই সকল তত্ত্বের প্রয়োগ হয়,—সেই প্রতিবিম্বগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই উহাদের কাজ; কিন্তু এই সকল প্রতিবিম্ব সীমার বাহিরে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বাহিরে, উহারা একেবারেই শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য। ক্যাণ্ট, স্বকীয় মতের এইটুকু যে প্রতিপক্ষদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাতেই জর্ম্মাণ-দর্শনের মহান্ উদ্যম বিনষ্ট হইয়াছে।

সেই যুগের সন্দেহবাদে প্রপীড়িত হইয়া, ক্যাণ্ট মনে করিলেন, সন্দেহবাদের অনুকূলে নিজমত কিছু ছাড়িয়া দিয়া, সন্দেহবাদকে নিরস্ত করিবেন। আমাদের উচ্চতর সংকল্পনগুলি, মানব-মনের গণ্ডি ছাড়াইয়া যায় না—এইটুকু স্বীকার করিলেই—তিনি মনে করিলেন—হিউম্‌কে একেবারে নিরস্ত করা হইবে। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও মনে করিলেন,—সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী যে সকল তত্ত্বের দ্বারা মানব-মন পরিচালিত হয়, সেই তত্ত্বগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায়, মানব-মনের নষ্ট

গৌরব উদ্ধার করা হইল। কিন্তু শ্রীযুক্ত রোয়াইয়ে কলার্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব ঠিক্; তিনি বলেন, "সন্দেহবাদের নিকট আংশিক ত্যাগ স্বীকার করা চলে না; মানব-চিত্তে সন্দেহবাদ একবার একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেই, পরে সমস্তই সে অধিকার করিয়া বসে।"

সতর্কভাবে পরিবীক্ষণ করা—চারিদিক দেখিয়া সাবধানে আলোচনা করা এক কথা—আর, সংশয়বাদকে পোষণ করা আর এক কথা। আমাদের বিভিন্ন বৃত্তির পরিচালনে ও ব্যবহারে, সন্দেহ করিতে বুদ্ধি যে শুধু অনুমোদন করে তাহা নহে—উহা বুদ্ধির আদেশ। কিন্তু আমাদের বৃত্তি-সমূহের বৈধতা ও বাস্তবিকতার উপর যদি সন্দেহ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, বুদ্ধিকে সে আর তখন আলোকিত করে না—প্রত্যুত বুদ্ধিকে অভিভূত করে। স্থূল কথা, বুদ্ধি কি করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে, যখন বুদ্ধিকেই তুমি সন্দেহ করিতেছ। ফলতঃ ক্যাণ্ট যে সিদ্ধান্তটিকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি নিজেই তাহা উল্টাইয়া দিলেন। এবং তিনি জর্ম্মান-দর্শনকে এমন-এক পথে লইয়া গেলেন, যাহা একটা অতলস্পর্শ রসাতলে গিয়া শেষ হয়।

কি প্রতিভা, কি মহৎ সঙ্কল্প, কি চরিত্র—সকল বিষয়েই যিনি মহাপুরুষ-নামের যোগ্য—সেই ক্যাণ্ট খুব নিপুণতা ও পাণ্ডিত্য-সহকারে, হিউমের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ক্যাণ্টই হটিয়া গেলেন, এবং হিউমই স্বকীয় জমির দখল বজায় রাখিলেন।

ফলতঃ, ইন্দ্রিয়-বোধ গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা,—উচ্চতর ধারণায় আমাদিকে ক্রমশঃ উন্নীত করাই যদি ঐ সর্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলির কাজ হয়—অথচ যদি উহাদের বাস্তবিকতা না থাকে—আমাদের নিকট বাস্তবিক বলিয়া শুধু প্রতীয়মান হয় মাত্র, তাহা হইলে ঐ সকল তত্ত্ব মানবচিত্তে থাকিলেই বা কি না থাকিলেই বা কি? ক্যাণ্ট নিজেই ত বলিয়াছেন—তাহা হইলে, মানব চিত্ত মহাজনী কুঠীর সাদৃশ্য ধারণ করে। আসল মূল্যের স্থলে, কুঠিয়াল যেমন শুধু হুণ্ডি গ্রহণ করে এবং সেই হুণ্ডিগুলাই বাক্সোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখে—ইহাও তদ্রূপ। কুঠিওয়ালার ঘরে কতকগুলা কাগজ ভিন্ন আ'র কিছুই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে, মধ্যযুগের সেই সঙ্কল্পনবাদে (conceptualism) আবার আমরা ফিরিয়া যাইতেছি,—যে সঙ্কল্পবাদ, সমস্ত সত্যকে মানব-চিত্তের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া, মানব-জ্ঞানের একটা উপছায়া খাড়া করিয়া তুলিয়াছিল। সেই উপছায়াবৎ জ্ঞান যেমন একদিকে বিশ্ববিজয়ী, তেমনি আবার অন্যদিকে শক্তিহীন; কেননা, সমস্তই তাহা হইতেই উৎপন্ন হয়—অথচ সমস্তই আকাশ-কুসুম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুস্থকায় দর্শনশাস্ত্র, ক্যাণ্টকে শুধু এইটুকু ভৎর্সনা করিয়াই সন্তুষ্ট হন যে, প্রকৃত তথ্য-সমূহের সহিত তাঁহার দর্শন-তন্ত্রের মিল নাই। তথ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশে, ইতর-সাধারণ জনতা হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখাই দর্শনশাস্ত্রের কর্ত্তব্য, এবং দর্শন-শাস্ত্র আপনাকে সেইরূপ পৃথক্ রাখিতেও সমর্থ। একথা বারম্বার বলিলেও বেশী বলা হয় না যে,—যেটা তুমি ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছ, ব্যাখ্যার সেই আসল জিনিসটাকে যেন নষ্ট করিয়া না ফেল। ইহা ভিন্ন, দর্শন

কিছুই ব্যাখ্যা করে না—কেবল কল্পনা করে মাত্র। এস্থলে যে মহান্ তথ্যটির ব্যাখ্যা করিবার কথা, সেটি—মানবজাতির বিশ্বাস। ক্যাণ্ট-তন্ত্র সেই বিশ্বাসকেই ধ্বংশ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

যার যে কাজ।

১। "চিরজীবন অসম্মানিত হইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে। দেশের মধ্যে আমার কোন স্থান নাই আমি দেশের কেউ নই"—এইরূপ ভাবিয়া মনকে কষ্ট দিয়ো না। মান সম্ভ্রমের অপ্রাপ্তিকে তুমি কি অনিষ্ট জ্ঞান কর? পরকৃত পাপাচরণে যেমন তুমি পাপের ভাগী হও না, সেইরূপ পরকৃত কর্ম্মেও তোমার প্রকৃত অনিষ্ট হয় না। তুমি যখন কোন ভোজে নিমন্ত্রিত হও,—রাজ্যের কোন কর্ম্মপদে নিযুক্ত হও,—সে কি তোমার স্বকৃত কাজ? তবে, ইহাতে অসম্মানের কথা কি আছে? "আমি দেশের কেউ নই"—একথা তুমি কি করিয়া বল? যে সকল বিষয় তোমার নিজায়ত্ত, যাহাতে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা দেখাইতে পার, শুধু সেই সকল বিষয়েই তুমি "দেশের কেউ" বলিয়া পরিচিত হইতে পার।

২। "আমার বন্ধুদের আমি কোন উপকার করিতে পারি না"। একথা কেমন করিয়া বল? বন্ধুদের উপকার করা? তাহারা তোমার নিকট হইতে অর্থ পাইবে না—পদ-মান পাইবে না, একথা সত্য। এ সমস্ত কি আমাদের নিজায়ত্ত? যাহার যাহা নাই, সে কি তাহা অন্যকে দিতে পারে?

৩। "যদি না থাকে ত অর্জ্জন কর," লোকে এইরূপ বলে। এই সমস্ত অর্জ্জন করিতে গিয়া আমি যদি আমার ধর্ম্ম, আমার ভক্তি, আমার মহত্ব, সমস্ত না হারাই, তাহা হইলে বল, কি উপায়ে উহা অর্জ্জন করিতে হইবে,—আমি তাহাই করিব। কিন্তু যে সকল জিনিস আদৌ ভাল নহে, তাহা অর্জ্জন করিতে গিয়া, যে সকল ভাল জিনিস আমার আছে—তোমার কথা-অনুসারে, আমি যদি সে সমস্ত হারাই, তাহা হইলে তোমাকে কি আমি অন্যায্যবাদী ও অবিবেচক বলিয়া মনে করিব না? আচ্ছা, বল দেখি, তুমি এ-দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি চাও। অর্থ চাও?—না, চিরবিশ্বস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ বন্ধুকে চাও? যদি তোমার বন্ধুর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে এমন কিছু তাহাকে করিতে বলিও না—যাহা করিতে গিয়া ঐ সমস্ত গুণ সে হারাইয়া ফেলে।

৪। "কিন্তু আমি যে তাহলে দেশের কোন কাজ করিতে পারিব না।" দেশের কাজ কাকে বলে? তোমার অর্থবল নাই যে তুমি একটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিবে কিংবা একটা নূতন ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিবে। দেশ, তোমার নিকট হইতে এই সমস্ত পাইবে না, সত্য। কিন্তু তাহাতে কি? দেশ ত কামারের নিকটে জুতার প্রত্যাশা করে না, কিংবা মুচির নিকট অস্ত্রের প্রত্যাশা করে না। যাহার যে কাজ সে যদি তাহা সুসম্পন্ন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। যদি তুমি দেশের একজনকেও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবৎ-ভক্ত করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে কি তোমার দেশের কাজ করা হইল না? অতএব "আমি দেশের কোন কাজ করিতে পারিব না"—একথা কোন কাজের নহে।

৫। "তাহলে, দেশের মধ্যে, কোন্ পদ তোমাকে দেওয়া যাইতে পারে?" যে পদেই আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিও, যেন তাহাতে আমার ধর্ম্ম, আমার ঈশ্বরভক্তি, লোপ না পায়। কিন্তু দেশের কাজ করিব মনে করিয়া যদি ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করি, যদি দেশকে অধর্ম্মে ও পাপে নিমগ্ন করি, তাহা হইলে আমা হইতে দেশের কি-কাজ হইল?

সংযম ও বৈরাগ্য।

ধর্ম্মের পথ অতি দুর্গম। একটু ব্যতিক্রমেই তাহা হইতে পতন অনিবার্য্য। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। তদ্ব্যতীত সমস্তই অন্ধকার। এই সংসারে সংযোগের সহিত বিয়োগ অনুস্যূত। যে মুহূর্ত্তেই জন্ম সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর অধিকার। তুমি জীবন-পথে যতই অগ্রসর হইতেছ সে রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে। কোন্ সময় যে সে আক্রমণ করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ফলত জীবন এইরূপ অস্থায়ী ও চঞ্চল। এখানকার স্নেহমমতা আশা ভরসা হয় তো কিছুই চরিতার্থ হইল না তুমি মৃত্যুর আহ্বানে কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্য পথে যাত্রা করিলে। কি ভীষণ অবস্থা! কিন্তু ঐ সময়ে ধর্ম্মই তোমার সঙ্গী। উহাই তোমায় ঐ বিষাদ ও নিরাশার অন্ধকারে আলোক ও শান্তি দেয়। এবং উহাই ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই বন্ধু। এখন এমন সহায়কে কিরূপে স্থায়ী করিতে পারি ইহাই বিচার্য্য।

মনুষ্যের গন্তব্য পথ দুইটী—প্রেয় ও শ্রেয়। প্রেয়ের পথে ভোগ আর শ্রেয়ের পথে যোগ। কিন্তু সংযম ও বৈরাগ্য না থাকিলে প্রায়ই এই প্রেয়ের পথ লোকের প্রিয় হয়। ইহা অধোগতির পথ। ধর্ম্মসাধনের ইহা বিশেষ প্রতিপন্থী। এই জন্য বাল্য হইতেই সংযম ও বৈরাগ্য অভ্যাসের চেষ্টা চাই। কিন্তু ইহা বড় কঠিন ব্যাপার। কঠিন ব্যাপার বলিয়া এককালে পরাঙ্মুখ হইলেও চলিবে না। ব্যক্তিগত ও সমাজগত যা কিছু মঙ্গল তাহা ইহাতেই নির্ভর করে।

প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই সংযম। আর বিচার দ্বারা ভোগ্য বস্তুর নশ্বরতা দেখিয়া তাহার উপর এককালে বিতৃষ্ণা বৈরাগ্য। ফলত সংযম অভ্যাস না থাকিলে বৈরাগ্য ঘটে না। সুতরাং বাল্য হইতেই সংযম আবশ্যক। আর বৈরাগ্য নিতান্ত অসুলভ পদার্থ, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত ইহা কাহারই ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু ধর্ম্মসাধনে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা। এদিকে আমরা ঈশ্বরের প্রসাদে ভোগায়তন দেহ পাইয়াছি। আর নানারূপ ভোগ্য বিষয়ও আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। এই অবস্থায় ঐকান্তিক ভোগনিবৃত্তি বা বৈরাগ্য কতদূর সম্ভব তাহা একটা ভাবিবার কথা। তুমি বলিতে পার পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে যাহা এই বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু তৎসমুদায় এখন কোথায়? ফলতঃ বৈরাগ্য জৈবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ এই জন্যই তত্তৎসম্প্রদায় একরূপ লুপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহার একটি নিদর্শন। বুদ্ধ অবশ্য কঠোর বিরাগী ছিলেন। ইহাঁর যা কিছু সাধন তাহা বিরাগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই বিরাগ প্রকৃতি-বিরোধী বলিয়াই শিক্ষাসাপেক্ষ। কিন্তু যে প্রণালীতে ইহা শিক্ষা হইতে পারে তদভাবে তিনি শিষ্যপরম্পরায় ইহা বদ্ধমূল করিয়া যাইতে পারেন নাই। চৈতন্য দেবও

অকৃতকার্য্য। তাঁহার সম্প্রদায় এখন নামমাত্রে বিরাগী কিন্তু পূর্ণমাত্রায় ভোগী। সেই জন্য এই সমস্ত বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্ম আজ জীবনশূন্য ও কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট।

তুমি বলিবে শ্রুতিতে বৈরাগ্যের প্রভূত স্তুতি আছে তাহা কি তবে নির্ব্বিষয় ও নিরর্থক। না তাহাও নয়। বুদ্ধের বিরাগ ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায় বেদবিহিত কর্ম্মদ্বেষী এই জন্য বুদ্ধের শিষ্যপরম্পরায় প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব আদৌ দাঁড়ায় নাই। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে এই বৈরাগ্য সুলভ হইতে পারে প্রাচীন স্মৃতি ও শ্রুতি তাহার পথপ্রদর্শক। স্মৃতি শ্রুতিমূলক। স্মৃতি বা সংহিতাকারদিগের মধ্যে মনুই মনুষ্যপ্রকৃতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই জন্যই এই ভারতে সমাজসংস্কারকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রধান স্থান। তিনি গার্হস্থ্যের প্রাধান্য দিয়া মধ্যে কহিয়াছেন বৈরাগ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যখন যে কোন আশ্রমে বৈরাগ্যোদয় হইবে তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। মনুর এই গার্হস্থ্যের প্রাধান্য আবার বৈরাগ্যের প্রাধান্য ইহা অবশ্য বিসম্বাদী ব্যাপার। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার একটু বিশেষ অভিপ্রায় আছে। তিনি জানিতেন বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রসাদ ভিন্ন সহসা লাভ করা যায় না। কারণ ইহা জৈব প্রকৃতি বিরোধী। তাই তিনি এই বৈরাগ্য সাধনের জন্য আশ্রমোচিত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কর্ম্মব্যবস্থা সংযম ও কঠোর বৈরাগ্যকে মনুষ্যপ্রকৃতির সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এখন হয় তো এই কর্ম্মের নাম শুনিবামাত্র অনেকে ক্ষেপিয়া উঠিবেন। কারণ তাঁহাদের সংস্কার কর্ম্মের ফল স্বর্গের সুরা অপসরা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। শাস্ত্রের স্বর্গসুখ কর্ম্মের প্ররোচক মাত্র। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বুঝা যাইবে। মনে কর পীড়িত বালক কোনও রূপে ঔষধ খাইতে চায় না। কিন্তু তাহার মাতার পীড়াশান্তির জন্য ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক। এই জন্য তিনি নানারূপ স্বাদু খাদ্যের লোভে ফেলিয়া বালককে ঔষধ খাওয়াইয়া দেন। এস্থলে মাতার পীড়া উপশম করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখদ খাদ্য দান উদ্দেশ্য নহে, উহা তাঁহার প্রলোভন বাক্যমাত্র। সেইরূপ শাস্ত্রকারেরা স্বর্গাদি ফল কামনায় যে কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রলোভন মাত্র। ঐ প্রলোভনে অজ্ঞ লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইবে। ফলত কর্ম্মের প্রকৃত ফল সংযমাদি অভ্যাস। কর্ম্মমুখে না হইলে ইহা একরূপ দুর্ঘট হয়। শাস্ত্রে তাই কর্ম্মব্যবস্থা।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই এই কর্ম্মের সূত্রপাত হইত। এই ব্রহ্মচর্য্য কোমলতার সহিত কঠোরতার ঘোরতর সংঘর্ষমাত্র ছিল। একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সংযম ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিত। এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম সকল প্রতিপালন করা বড় সহজ কথা ছিল না। ইহাতে আহারের দেহরক্ষা মাত্রেই উপযোগিতা ভোগস্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য নয়। এতদ্ব্যতীত বাত-বৃষ্টি-সহিষ্ণুতা কাঠভারবহন শিলাপট্টে শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সকলও বালকের পক্ষে বড় সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু সহজসাধ্য না হইলেও তৎসমুদায় বালককে সংযমাদিতে অভ্যস্ত করিবার সম্পূর্ণই অনুকূল।

এই ব্রহ্মচর্য্যের পরই গার্হস্থ্য। এই আশ্রমেও নানারূপ উদ্দাম প্রবৃত্তি দমনের জন্য অনেক কার্য্যব্যবস্থা আছে। ঐ সকল ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ ক্রমশ স্বার্থ

ত্যাগ সহকারে পরার্থপর হইতে থাকে। ভোগপ্রবৃত্তির উপর স্বাতন্ত্র্যই যদি সংযমের অর্থ হয় আর ভোগবিরতিই যদি বৈরাগ্যের লক্ষণ হয় তাহা হইলে দেখিতেছি ভারতের প্রাচীন গার্হস্থ্যের কার্য্যবিধানে তাহারই সমস্ত সদুপায় আছে। ভোগ্য বস্তু আমার করায়ত্ত কিন্তু আমি শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিয়মিত। আমি কিছুতেই তাহা অতিক্রম করিয়া ভোগাসক্ত হইতে পারি না। এই তো সংযম। ফলতঃ পূর্ব্বতন এই গার্হস্থ্যের নিয়ম সকল সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও অতি পরিপাটী ছিল। ইহার প্রধান শিক্ষা স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা। তখনকার প্রবাদ বাক্য ছিল, যে নিজের জন্য পাক করে সে পাপ আহার করিয়া থাকে। ফলত দৈব পৈত্র্য কার্য্য অতিথিসপর্য্যাদি গৃহীর পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় ছিল। এমন কি, আকীট পতঙ্গও তাঁহার উদার সদাব্রতে পরিতৃপ্ত হইত। এই সমস্ত দৈনিক কার্য্য গার্হস্থ্যের বিধিবিহিত। ইহার অননুষ্ঠানে প্রত্যবায়। গৃহী ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থে এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইহা অবশ্য কঠোর সাধনসাপেক্ষ। ব্রহ্মচর্য্যের কাল হইতে গার্হস্থ্য এবং তদূর্দ্ধেও এই কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে হইত, তবেই এই সাধনে সিদ্ধি লাভ। ফলত প্রাচীন গার্হস্থ্যে যাঁহারা এইরূপ কর্ম্মমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক সাধনপথে অগ্রসর হইতেন তাঁহারাই সংযম ও পরিণামে অস্খলত বৈরাগ্যলাভে কৃতার্থ হইতে পারিতেন। কিন্তু এই পথ বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে এই জন্য বিরাগী সম্প্রদায় এদেশে আর দেখা যায় না। বৌদ্ধেরা একরূপ দেশত্যাগী। শাঙ্কর সম্প্রদায়ে জ্ঞান আছে কিন্তু প্রকৃত আশ্রমোচিত কর্ম্মের অভাবে বৈরাগ্যের অভাব। যাঁহারা প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটকাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই সকল নামমাত্র বিরাগী ভণ্ড তাপসদিগের কলুষিত চরিত্রের চিত্র দেখিয়া বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। বহুকাল হইতে ইহাদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং মদ্য মাংসাদি সেবায় স্বধর্ম্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের দেশের কথা ছাড়িয়া দেও, ইউরোপের খ্রিষ্ট ধর্ম্মও এই বৈরাগ্যমূলক কিন্তু ঐ দেশের অনেকেরই ইহা নামমাত্রে পর্য্যবসান। আগামী কল্যের জন্য ভাবিও না খ্রিষ্টের এই মহামন্ত্র তথায় এখন একরূপ নির্ব্বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রাচীন গার্হস্থ্য প্রণালী ভারতে আর নাই। সুতরাং লোকসমাজে সাধনাপেক্ষী সংযম ও বৈরাগ্যও দুর্ঘট। কিন্তু দেখিতেছি কোনও ধর্ম্ম সংযম ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা কিছুতেই টেঁকে না। পূর্ণমাত্রায় বিষয়ভোগ ও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ এই উভয়ের কিছুতেই সমন্বয় হয় না। কিন্তু এদিকে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ও জাতিগত সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। ধর্ম্ম না থাকিলে সমস্তই উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়। এখন কি উপায়ে এই ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে ইহা বিবেচ্য। আমরা এতক্ষণ যে সকল ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিয়া আইলাম তাহাতে কর্ম্মসাধন অপরিহার্য্য। ইহা বর্ত্তমানে অনেকেরই অনুমোদনীয় হইবে না। ইহা কাহারও অবলম্বিত ধর্ম্মের বিরোধী। কাহারও বা জঠরজ্বালায় অষ্টপ্রহর হনুমন্ত পরিশ্রম। সুতরাং কর্ম্মসাধন তাঁহাদের কিরূপে ঘটে। কিন্তু আমরা বলি সংযম ও বৈরাগ্য যখন ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক তখন যে কোন উপায়েই হউক কর্ম্মআশ্রয়ের চেষ্টা পাইতে হইবে। পূর্ব্বে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে সংযমাদি অভ্যাসে যত্নবান হইত। সে কোমলতার

সহিত কঠোরতার ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখন সম্ভব নয়। গোচারণ কাষ্ঠভারবহন জলপূর্ণ কলস আনয়ন ভিক্ষাটন সময়োচিত হইবে না। ভাল, সময়োচিত না হউক কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্যটি বুঝিয়া আজ কাজ করিতে হানি কি? শরীর মন সুদৃঢ় না হইলে কি বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কোনও কালে কোনও রূপে মানুষ কর্ম্মিষ্ঠ হয় না। বিশেষত যে সাধনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করিতে হইবে তাহা ক্ষীণ দেহের কাজ নয়। আর বাল্য হইতে আরম্ভ না করিলেও বয়ঃপরিণতিতে ইহা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বালকেরা কোন ঋষির আশ্রমে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জনের সহিত এই সমস্ত সাধন করিত। এখন প্রথম বয়স হইতেই যাহাতে তাহারা সকল প্রকার ক্লেশসহিষ্ণু ও নির্লোভ হয় পিতামাতার তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। এই নিয়মটি ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান হওয়া আবশ্যক। বিদ্যাশিক্ষা কি ধর্ম্ম শিক্ষা কিছুতেই ধনী সন্তানের জন্য কোনও রাজকীয় পথ নাই। ইহা ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান। আমরা দেখিতে পাই বালকেরা অনেক সময়ে কোনও লোভনীয় বস্তু পাইবার জন্য পিতামাতাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। এই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি দমন রাখিবার জন্য তাহাদিগকে উহা না দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। এই অপ্রদান ক্রোধের সহিত তাড়নার সহিত নয় কিন্তু হৃদয়ের কোমলতা অকপট স্নেহ ও যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা করিতে হইবে। ফলত ভোগাদির প্রবৃত্তি দমনই সংযম। কেবল এইটিই নয় তাহার অন্যান্য মানসিক দোষ উপশমের জন্যও শিক্ষা দিবে পরিমিত আহার ও ব্যায়ামাদি দ্বারা যাহাতে তাহার দেহ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্রমশ বলীয়ান হইতে থাকে তদ্বিষয়েও সাবধান হইতে হইবে। শরীর মন ও আত্মা এই তিনের উন্নতি লইয়াই শিক্ষা নির্ভর করে। নচেৎ শিক্ষা অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যে এই তিনের উন্নতি লইয়াই শিক্ষা হইত। এখন তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এইরূপ প্রণালীক্রমেই বালকদিগকে মানুষ করিতেছেন তাহা সাধারণের অনুকরণীয়।

এই গেল ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা। পরে গার্হস্থ্য। গৃহী যুবার নানা রকম প্রবৃত্তি স্বভাবতই দুর্দ্দমণীয় হয়। বাল্যের সংযমশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। সংযমেই ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং সে ঐ সংযমের বলে প্রবৃত্তির স্রোতে নীয়মান না হইয়া শরীর মন ও আত্মা এই তিনটীকেই বিপথ হইতে রাখিতে পারিবে। যৌবন মনুষ্যের কার্য্যের কাল, উপার্জ্জনের কাল। মনে করিতে পার অর্থ সংযম ও বৈরাগ্যের প্রতিপন্থী, তাহার কথা আসিতেছে কেন; তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শনই আবশ্যক। এইটি বিষম ভ্রম। ন্যায়ত অর্থোপার্জ্জন কর, ইহা দ্বারা নিজের ভোগের আয়োজন করাই দোষ কিন্তু তাহা না করিয়া এক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন গৃহীর অনুসরণ আবশ্যক। তাঁহারা অত্যন্ত দানশৌণ্ড ছিলেন। এই দানের প্রভাবে সময়ে সময়ে একজন রাজাধিরাজও মৃৎপাত্রাবশেষ হইয়া পড়িতেন। এই দানের ফল পারলৌকিক ভোগ সাধন নয়। এবিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের ভিন্নরূপ অভিপ্রায় ছিল। তাঁহারা বুঝিতেন সঞ্চয়ে অনেক দোষ। ধনী প্রায়ই নির্ধনের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে, ইহাতে সমদর্শিতা থাকে না, ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে সমতা মৈত্রী বিশেষ অর্জ্জনীয় পদার্থ। সকল

প্রকার অনুদারতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ধন অনেক স্থলেই নানাসূত্রে মনুষ্যকে সাধারণ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র করিয়া তুলে। এই স্বতন্ত্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৃহীর পক্ষে দানের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে তোমার ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থা নাই কিন্তু অন্যের সাহায্যই যাহাদের অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায় সেই সমস্ত অভাবগ্রস্তকে দান কর, দেশের শিক্ষাবিস্তারে তোমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাক্, বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের দুর্দ্দশা দূর কর, ইহা জগতের কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বত্র মুক্তহস্ত হও ধন দ্বারা তোমার সাধন পথে কোনই বিঘ্নাচরণ হইবে না। অর্থ দ্বারা নিজের ভোগ চরিতার্থ করা পুরুষার্থ নয়, পরার্থে নিয়োগেই তাহার সার্থকতা। এইরূপে স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতা অভ্যাস কর, পার্থিব বিষয় প্রধ্বংসী, আইসে ও যায়, মনে মনে ইহা চিন্তা কর, বিচার কর দেখিবে ক্রমে তোমার সংযমের উপর বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তখন তুমি ভোগের নানারূপ উপকরণ সত্ত্বেও আসক্তিশূন্য। এই অনাসক্তিই পূর্ণ বৈরাগ্য। ইহা ভারতের প্রাচীন গৃহীর অনুকরণ ও অনুসরণে ঘটাই সম্ভব। শিক্ষাবল বল, বুদ্ধিবল বল ধর্ম্ম ব্যতীত নিজের ও সমাজের সকল প্রকার দুর্দ্দশা মোচন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনকল্পে কাহারই বল নাই। সেই ধর্ম্ম সংযম ও বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ ইহা কিছুতেই স্থায়ী হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশত্তম সম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৩৯॥/৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৬৫৯ /০
সমষ্টি	...	২২৯৮॥৵৯
ব্যয়	...	৫৫৫৸ ৬
স্থিত	...	১৭৪২৸৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
২৪২৸৵৩

১৭৪২ ৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০০৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৫৸০
পুস্তকালয়	...	১৪।৵৬
যন্ত্রালয়	...	৩৬৮॥৶৩
গচ্ছিত	...	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন	...	৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		১৫৲
সমষ্টি	...	৬৩৯॥/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৭।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৬৶৯
পুস্তকালয়	...	২॥/৬
যন্ত্রালয়	...	১০৫॥৵০
গচ্ছিত	...	২৲
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক	...	১৬০৲
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৩১।/৩
সমষ্টি	...	৫৫৫৸৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৪৮ সংখ্যা

১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০৬। ৯ অগ্রহায়ণ শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।
৭৪৮ সংখ্যা
১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার।

পাপচিন্তা।

"তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মানং পুনঃ পুনঃ॥"

"পুরুষ দৃঢ়ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়।"

যখন পাপচিন্তা মনে উদিত হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দমন করিবার উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিবার প্রতি মনোযোগ করিবে। হিতাহিতজ্ঞান আসিয়া যখন পাপীদিগকে সৎপরামর্শ দেয়, তাহারা তাহা দূর করিবার জন্য কত পরিশ্রম কত যত্নই না করে, কত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা তাহাদিগকে ভুলিতে চেষ্টা করে। আমোদ প্রমোদের সঙ্গীদিগের ক্রীড়া কৌতুক ও কোলাহলের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানের স্বর ডুবাইয়া দেয়। পূর্ব্বকৃত পাপের স্মরণ দূর করিবার জন্য তাহারা কত অগণ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। পাপচিন্তা যাহাতে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে, বা প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাড়াইতে পারে, তাহার জন্য যদি তাহারা তেমনি করিয়া চেষ্টা করে, তবে এমন সাধু কার্য্যে কেন না তাহারা তুল্যরূপ কৃতকার্য্য হইবে? যখনই জানিতে পারিবে, প্রবল পাপচিন্তা হৃদয়ে ফুটিবার উপক্রম করিতেছে, তখনি অন্যান্য সাধুচিন্তা, সাধু ভাব হৃদয়ে আহ্বান করিবার চেষ্টা করিবে। শীঘ্র অন্য দিকে চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া দিবে। মনকে শান্ত ও স্থির করিবার জন্য যাহা কিছু প্রবল শক্তিসম্পন্ন তাহারি চিন্তায় মগ্ন হইবে। সাহায্যের জন্য চিন্তাসাপেক্ষ অধ্যয়ন, প্রার্থনা ও ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে। আর যদি নির্জ্জনে থাকিলে পাপ-প্রলোভন উদ্দীপ্ত হয়, এমন বুঝিতে পার, তবে তৎক্ষণাৎ সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিবে বা সাধুসজ্জনের সহিত মিলিত হইবে। এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা তুমি উদীয়মান্ পাপচিন্তার গতিরোধ করিতে ক্ষমবান্ হইবে। পাপরূপ বিষ হৃদয়ে পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তুমি এইরূপ নিবারক ঔষধ গ্রহণ করিবে।

যখনি কোন রিপু প্রথমে তোমার মনে উদয় হইতে আরম্ভ করিবে, তখনি তুমি

তাহাতে বাধা দিবে। যে সকল বিষয় তোমার সম্মুখে থাকিলে তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হইবে, যাহা তুমি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছ, তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যেমন দেখিবে যে ঝড় উঠিবার উপক্রম হইতেছে, অমনি নিরাপদ উপকূলে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সৎপ্রবৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিবে। অতি সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ও যদি হৃদয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে, তাহাকেও তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। সামান্য অপবিত্র বাসনাও সময় পাইলে একদিন হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিতে পারে। এমনও ঘটে এই পাপচিন্তা প্রথমে যেন সাধু নির্দ্দোষ চিন্তার ন্যায় নিঃশব্দে চৌরের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু যত অগ্রসর হয় ততই তোমাকে কঠিন কঠিন দুঃখরূপ ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে। যাহাকে এখন তুমি আদরের বস্তু বলিয়া বুঝিতেছ তাহাই আর এক ভবিষ্য সময়ে তোমার গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিবে। এবং পরিশেষে তাহাই জীবনে এমন ভার বোঝা হইয়া উঠিবে—যাহা নামাইবার জন্য আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিবে। অনেক রিপুকেই প্রথমে রিপু বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের প্রারম্ভই বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের প্রসার বোধগম্য নহে। এবং যতক্ষণ না তাহাদের রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ তাহাদের শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। পাপরূপ বারি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র চিড় হইতে উৎপন্ন হয়, মনে করিলে এক সময়ে ইহার গতি অতি সহজে রোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অবহেলা করিলে পরে ইহা প্রশস্ত স্রোতস্বতীর রূপ ধারণ করে। ইহা উদ্বেলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সমস্ত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

পুনঃ পুনঃ পাপাচার করিয়া আপন মনবুদ্ধিকে নষ্ট করিবেক না; মনবুদ্ধি নষ্ট হইলে নিজের যন্ত্রণার যন্ত্র নিজের হৃদয়েই রহিবে। মনকে পবিত্র কর ও মধুময় কর। এমন করিয়া ইহাকে মধুময় কর যেন ইহা কাহারও পীড়াদায়ক না হয়। মন ভাল হইলে সকলের সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইতে পারিবে, মুখে মধুময় বাক্য উচ্চারিত হইবে। সাধু চিত্তের মনুষ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সত্তেও অন্যের নিকট বিনয়া ও অবনত থাকেন। তিনি সামান্য বিষয় লইয়া অন্যের সহিত বিবাদবিসম্বাদ করেন না। এবং অপরিহার্য্য বিবাদের সময়েও আপনার চিত্তকে সংযত করিয়া রাখেন। এই প্রকার মন আনন্দ উৎপাদনের প্রধান কারণ এবং মনুষ্যজাতি মধ্যে শৃঙ্খলা ও সমাজের শান্তি সুখের ভিত্তিভূমি। আত্মম্ভরী বিবাদপ্রিয় কর্কশ লোক সমাজের পক্ষে বিষতুল্য এবং প্রকৃতি যাহা কিছু অল্প সুখসম্পদ মনুষ্যকে ভোগ করিতে দিয়াছেন, তাহাও তাহারা নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ করিতে যাইয়া তাহারা অন্যের শান্তি অপেক্ষা নিজেদের শান্তিই অধিকতর ভঙ্গ করিয়া ফেলে। প্রবল ঝটিকা তাহাদের আপন হৃদয়েই প্রথমে উদিত হয়, পরে তাহাকে পৃথিবীতে ছড়াইয়া দেয়। যে ঝড় তাহারা আপনারাই তুলে তাহাতেই তাহারা হারাইয়া যায়, এবং ইহা দ্বারাই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ, সরল, যিনি অন্যের কার্য্যকলাপ অপক্ষপাতে দৃষ্টি করেন তাঁহারি মন শান্তিপূর্ণ থাকে। যাহার মন সন্দিগ্ধ, যে পরের সকল কার্য্যের মূলে মন্দ অভিপ্রায় আরোপ করে, এবং সকল

চরিত্রকে কলুষিতনেত্রে দেখে তাহার মন কখন শান্তিসুখ অনুভব করে না। যদি আপনাকে আপনি ভোগ করিতে চাও, যদি অন্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সুখী হইতে চাও তবে ঈর্ষা, দ্বেষ, পরপীড়ন পরিত্যাগ কর। লোকের সামান্য সামান্য দোষ দেখিলে তাহাকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করিও না। তাহা হইলে তুমি সকলকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে পারিবে। কাহাকেও আর শত্রু বলিয়া মনে হইবে না। মন পাপ হইতে মুক্ত হইবে, শান্তি ও পবিত্রতাতে তাহা পূর্ণ হইবে। রে অশান্ত মন! বল এই পবিত্র উপাসনার সময় বল—

"আমার গতি কি হবে।
যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে।
ওহে পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথায় শান্তিদাতা, শান্তি কর দান।
তোমার হাতে মোলে, এ মহাপাতকী
নব-জীবন পাবে।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, নবপ্রসূত বালকের মনে জ্ঞান যখন সবেমাত্র নূতন উন্মেষিত হয়, তখনকার সেই আদিম জ্ঞান কেবলমাত্র ঐশী শক্তিরই ব্যাপার, তা বই তাহাতে জ্ঞাতার নিজের কর্ত্তৃত্ব বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। জ্ঞান কি? না, "এটা এই" এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া; কিন্তু যাহাকে বলা হইতেছে "এটা," তাহার ন্যায় আর দশ-পাঁচটা যদি পূর্ব্বে কোনোসময়ে জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর হইয়া না থাকে, তাহা হইলে "এটা" যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞানে প্রতিভাত হইতে পারে না, কাজেই "এটা এই" এরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। নবপ্রসূত শিশুর আদিম জ্ঞানে যখন প্রথম আলোক উদ্ভাসিত হইল, তখন পূর্ব্বে কোনো সময়ে সেরূপ কোনো আলোক তাহার জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় নাই; তাহা যখন হয় নাই, তখন সেই নূতন আলোকের উদ্ভাসনকালে অভিনব জ্ঞাতা কেমন করিয়া বলিবে যে, "এটা আলোক" বা "এটা এই।" জ্ঞানের রূপই হ'চ্চে "এটা এই"; তা বই শুদ্ধকেবল "এটা" জ্ঞানশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কাগচের যেমন দুই পিট—এ-পিট এবং ও-পিট, জ্ঞানেরও তেমনি দুই পিট—এটা এবং এই, অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষণ। একপিঠিয়া কাগচও যেমন—একপিঠিয়া জ্ঞানও তেমনি, দুইই বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ একান্তপক্ষেই অসম্ভব। কাজেই বলিতে হয় যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিম জ্ঞানের "এটা"র ভিতরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো-প্রকার "এটা এই" লুকানো রহিয়াছে। সে "এটা এই" যে ব্যাপারটা কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আবশ্যক;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আদিম জ্ঞানালোক ফুটিয়া বাহির হইল। বিশেষ একটা ব্যাপার ফুটিয়া বাহির হইল। যখন বলিতেছি "বিশেষ একটা ব্যাপার," তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আদিম জ্ঞানালোক কোনো-না-কোনো-প্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত। কিন্তু একটা বিষয় আর-একটা বিষয় হইতেই বিশেষিত হইতে পারে; তা বই, একাকী একটা বিষয় বিশেষিত হইতে পারে না।

আদিম জ্ঞানালোক তো এক, তাহার প্রতিযোগী আর এক কে? আদিম জ্ঞান তো এ-পিট, তাহার প্রতিযোগী ও-পিট কে? ও-পিট হ'চ্চে অজ্ঞান-অন্ধকার। আদিম জ্ঞানালোক অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে বিশেষিত। আদিম জ্ঞান অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত—অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থিত। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত ছিল—এক্ষণে তাহাই ব্যক্ত হইল। এ নহে যে, পূর্ব্বে তাহা নাস্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অস্তি হইল। শাল এবং তাল দুইই যেমন বৃক্ষ, ব্যক্ত বস্তু এবং অব্যক্ত বস্তু দুইই তেমনি বস্তু। তাল-গাছ দেখিয়া যখন আমরা বলি যে, "এটা বৃক্ষ," তখন সে কথার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বদৃষ্ট শালগাছও যেমন বৃক্ষ, দৃশ্যমান তালগাছটিও তেমনি বৃক্ষ। তবেই হইতেছে যে, দৃশ্যমান তালগাছকে বৃক্ষ বলিলে পূর্ব্ব-দৃষ্ট শালগাছকেও প্রকারান্তরে বৃক্ষ বলা হয়। তেমনি ব্যক্ত-বস্তুকে বস্তু বলিলে, পূর্ব্বে যখন তাহা অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত-বস্তু-কেও প্রকারান্তরে বস্তু বলা হয়। শালগাছও বৃক্ষ, তালগাছও বৃক্ষ। শাল এবং তাল দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষ-প্রত্যয়, আর, সেই উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি শাল এবং তাল দুয়েরই বিশেষণ। তেমনি "ব্যক্ত এই" এবং অব্যক্ত এই" এ দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়, আর সেই বস্তুপ্রত্যয়ই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুয়েরই বিশেষণ। তালগাছের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই যেমন শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তেমনি আদিম প্রকাশের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষপ্রত্যয়; ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়। আদিম জ্ঞানালোক পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইল; সুতরাং ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে একটা ঐক্যভূমি রহিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ নাই কখন্? না, অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইল, তখন্। আদিম জ্ঞানে "ব্যক্ত ইতি" এই বিশেষ্যের সহিত ব্যক্তা-ব্যক্তের উভয়সাধারণ বস্তুপ্রত্যয় আপনা হইতেই আসিয়া জোটে। আর সেই বস্তু-প্রত্যয়ই আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ। বস্তুপ্রত্যয়ের রূপ কি, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই :—

প্রকাশ নূতন, কিন্তু বস্তু নূতন নহে—বস্তু পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান;—এইটি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়ের রূপ। আদিমজ্ঞানে যখন "এটা" বলিয়া প্রথম বিশেষ্য বা প্রথম লক্ষ্যবস্তু উপস্থিত হয়, তখন "এটা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান" এই বিশেষণটিও সেই সঙ্গে উপস্থিত হয়, তবে কিনা—অতীব অপরিস্ফুট নিগূঢ় ভাবে।

বিগত প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে বলা হইয়াছিল যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিম জ্ঞানে জ্ঞাতার নিজের কোনো কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কেমন করিয়া? জ্ঞাতা নিজে এবং সেই সঙ্গে তাহার জ্ঞান যখন অব্যক্ত ছিল, তখন জ্ঞানকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করিয়া তোলা কেমন করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছায় বা নিজের শক্তিতে বা নিজের কর্ত্তৃত্বে সম্ভবসাধ্য হইবে? তা ছাড়া, আর-একটি কথা আছে, তাহা এই :—

বৃক্ষের বিশেষণ এক নহে—বৃক্ষের বিশেষণ অনেক; বৃক্ষ স্থাবর, বৃক্ষ সজীব, বৃক্ষ উদ্ভিদ্, বৃক্ষ নশ্বর—এইরূপ নানা বিশেষণ।

নানা বিশেষণের যোগে এক বৃক্ষকে আমরা নানাভাবে দেখিতে পারি। বৃক্ষকে চাই আমরা স্থাবর বলিয়া অবধারণ করি, চাই সজীব বলিয়া অবধারণ করি, চাই উদ্ভিদ্ বলিয়া অবধারণ করি—সে আমাদের ইচ্ছা; সুতরাং তাহার উপরে আমাদের কর্তৃত্ব চলে। পক্ষান্তরে, আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ একটি মাত্র—কি? না, অস্তি-প্রত্যয় বা বস্তুপ্রত্যয়। কাজেই আদিম-জ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুতে অভিনব জ্ঞাতা সেই অবিকল্পিত একই ধাঁচা'র বিশেষণটি আ-রোপ করিতে অগত্যা বাধ্য। সুতরাং শেষোক্ত স্থলে জ্ঞাতা এরূপ বলিতে পারে না যে, "উপস্থিত বিষয়টাকে—চাই আমি বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—চাই আমি আর-কিছু বলিয়া অবধারণ করি—সে আমার ইচ্ছা।" লক্ষ্য বিষয়টাকে বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেই হইবে। কেন না—লক্ষ্য বিষয়কে তুমি যে, বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেছ, করিতেছ তাহা ঐশী শক্তির বলে—তোমার নিজের ইচ্ছার বলে নহে।

আদিম জ্ঞান যখন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইতে প্রকাশে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে বিকাশের মঞ্চে আরূঢ় হয়, তখন তাহার ভিতর হইতে নি-জের কর্তৃত্ববোধ ফুটিয়া বাহির হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞাতার সেই যে নিজের কর্তৃত্ব, তাহা ঐশী শক্তিরই প্রতিধ্বনি। বৃক্ষের শাখা যদি বলে যে, "আমি বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমার ফুল আমারই ফুল—তা বই, তাহা বৃক্ষের ফুল নহে; আমার পল্লব আমারই পল্লব, তা বই—তাহা বৃক্ষের পল্লব নহে; তবে শাখাটাকে বৃক্ষ হইতে উন্মূ-লিত করিয়া দুইদিন পরে তাহাকে যদি বলি যে, "তোমার ফুল কোথায়—তোমার পল্লব কোথায়?" তবে শাখাটা বলিবে যে, "মড়া'র উপর খাঁড়ার ঘা দিও না।" ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, শাখার যে ফুল তাহা বৃক্ষেরই ফুল, শাখার যে পল্লব তাহা বৃক্ষেরই পল্লব। তেমনি, মনুষ্যের জ্ঞানবিকাশের মধ্যে তাহার নিজের কর্তৃত্বশক্তি যাহা-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐশী শক্তিরই মূর্ত্তিভেদ। বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে যেমন করিয়া মনুষ্য ভূতরাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য এবং জীবরাজ্য মাড়াইয়া সর্ব্ব-সমভিব্যাহারে মানবরাজ্যে উপনীত হই-য়াছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি মনুষ্যের আত্মা প্রাণরাজ্য এবং মনোরাজ্য মাড়াইয়া প্রাণ-মন-সমভিব্যাহারে জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। দুই ঘটনাই একই ঐশী শক্তির প্রভাবে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে—তাহার উপরে কোনো জীবেরই কোনো কর্তৃত্ব চলে না। মনুষ্যের জ্ঞানের প্রকাশ এবং বিকা-শের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বশক্তির প্রকাশ এবং বিকাশ হয়, ইহা সকলেরই দেখা কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি যাহা সর্ব্বজগতে কার্য্য করিতেছে, সেই ঐশী শক্তিই মনু-ষ্যের কর্তৃত্বশক্তির সারসর্ব্বস্ব।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

(তৃতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

মূলতত্ত্বসমূহের মূল্য।

ফলতঃ, যখন আমরা সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের সত্যতার কথা বলি, তখন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না যে, উহারা শুধু আমাদের পক্ষেই সত্য; প্রত্যুত আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে, উহারা পর-

যার্থতঃ সত্য;—এমন কি, উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারে এরূপ কোন মনও যদি না থাকে, তথাপি উহারা সত্য। আমরা মনে করি, উহারা আমাদের হইতে স্বতন্ত্র; আমাদের মনে হয়, –উহাদের নিজের অভ্যন্তরে যে সত্য অবস্থিত, সেই সত্যেরই নিজস্ব বলে, উহারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতএব, আমাদের মনোভাব যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে হইলে, ক্যাণ্টের সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিতে হয়। ক্যাণ্ট বলেন; এই তত্ত্বগুলি, আমাদের মনের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; আমাদের মনের বাহিরে উহাদের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। কিন্তু আমরা এইরূপ বলি;—এই তত্ত্বগুলির অনন্য-নিরপেক্ষ একটি নিজস্ব মূল্য আছে; সেই জন্যই উহাদিগকে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

তা ছাড়া, এই যে বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতা (যে অস্ত্রে নব-সংশয়বাদীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন)—ইহা, তত্ত্বগুলির প্রয়োগ পক্ষে একটা অপরিহার্য্য নিয়ম নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সিদ্ধ করিয়াছিঃ—বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বুঝায়,—সেই বিশ্বাসের পূর্ব্বে, একটা বিচার ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, অস্বীকার করিবার অক্ষমতাও অনুভূত হইয়াছে। বস্তুত, কোন প্রকার বিচার বিবেচনার পূর্ব্বেই, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সত্যকে আপনা হইতেই গ্রহণ করে। এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধিতে কোন প্রকার অবশ্যম্ভাবিতার ভাব নাই, সুতরাং সেই বিষয়ি-মুখিতারও লক্ষণ নাই, যাহা জর্ম্মান দার্শনিকদিগের এতটা ভয়ের বিষয়।

সত্যের এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একবার আলোচনা করা যাউক। ক্যাণ্ট তাঁহার সুচিন্তিত (কিন্তু যাহাতে একটু টুলো ধরণের পাণ্ডিত্য প্রকটিত) জ্ঞান চক্রের মধ্যে, ইহাকে স্থান দেন নাই।

একথা কি সত্য, যে কোন সিদ্ধান্ত হউক না কেন,—ভাব-পক্ষের আকারে পরিব্যক্ত হইলেও—উহার সহিত একটা অভাবপক্ষ জড়িত থাকেই থাকে?

সহসা এইরূপ প্রতীয়মান হয় বটে যে, যাহা ভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত তাহাই আবার অভাব পক্ষের সিদ্ধান্ত। কেননা, কোন-একটা জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। আবার, অভাব-পক্ষের সিদ্ধান্ত মাত্রই একই সঙ্গে ভাব পক্ষের সিদ্ধান্ত; কেন না, কোন-একটা জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, তাহারা অনস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এইরূপই যদি হয়—তবে, কি ভাবপক্ষ কি অভাবপক্ষ, যে কোন আকারেই ব্যক্ত হউক না, সিদ্ধান্ত মাত্রেরই গোড়ায়, উপস্থাপিত প্রশ্নের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, কোন প্রকার চিন্তা-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—সিদ্ধান্ত মাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ বুঝায়; এবং সেই সংশয় ও চিন্তাক্রিয়ার পর, আমাদের মন বাধ্য হইয়াই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইভাবে দেখিলে, সিদ্ধান্তটি স্বকীয় অবশ্যম্ভাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইরূপই প্রতীয়মান হয়; এবং তখন সেই প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপক্ষটি আবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেটি এইঃ—এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই যদি তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই প্রশ্নের সত্যতার প্রতিভূ একমাত্র তুমি নিজে ও তোমার নিয়মবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি;—তাছাড়া উহার অন্য কোন

প্রতিভূ নাই। এস্থলে,—বিষয়ী পুরুষ স্বকীয় নিয়মগুলিকেই আপনার বাহিরে লইয়া যায়; স্বকীয় চিত্ত-প্রতিবিম্বগুলিকেই বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে;—আসলে বিষয়ী স্বকীয় বিষয়িত্বের গণ্ডি হইতে কদাপি বাহির হয় না।

ইহ'র উত্তর দিতে হইলে, এই দুরূহ প্রশ্নের একেবারে মূলে যাইতে হইবে। আমাদের সকল সিদ্ধান্তই যে অভাব পক্ষের একথা সত্য নহে। একথা আমরা স্বীকার করি, বিচারের অবস্থায় ভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত মাত্রেই আবার অভাব পক্ষের সিদ্ধান্ত—এই-রূপ বুঝায়। কিন্তু সকলের গোড়ায়, এমন কোন ভাবপক্ষের কথা কি থাকিতে পারে না, যাহার সহিত কোন প্রকার অ-ভাব মিশ্রিত নাই। আমরা ত অনেক সময়ে কোন প্রকার পূর্ব্বচিন্তা না করিয়াই কাজ করি; তাছাড়া সেই সময়ে আমাদের স্বাধীন চেষ্টাও প্রকটিত হয়;—সেই স্বাধীনতার ভাবটি চিন্তা-মূলক নহে; এমন কি, আমাদের জ্ঞান, অনেক সময়ে সংশয়ের ভূমি না মাড়াইয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে। আমাদের চিন্তাক্রিয়া অহংজ্ঞানের নিকটেই ফিরিয়া আইসে, অথবা এমন কোন মনো ব্যাপারের নিকট ফিরিয়া আইসে যাহা চিন্তাক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। অতএব, গোড়ার ব্যাপারে চিন্তাক্রিয়া যে বিদ্যমান থাকে—একথা গ্রাহ্য নহে। এই চিন্তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত আবদ্ধ থ'কে—সেরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বুঝায় যে, তাহার গোড়ায় আর কোন একটা সিদ্ধান্ত ছিল যাহাতে চিন্তার ক্রিয়া আদৌ বিদ্যমান ছিল না। এই প্রকারে আমরা এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যাহা চিন্তা-নিরপেক্ষ;—এমন একটি ভাবপক্ষের তত্ত্বে উপনীত হই যাহাতে অ-ভাবের কোন মিশ্রণ নাই। উহা অব্যবহিত সাক্ষাৎ উপলব্ধি; কবির অন্তঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বের ন্যায়, বীরের অশিক্ষিত পটুত্বের ন্যায়, এই প্রকার উপলব্ধি প্রকৃতির স্বাভাবিকী শক্তি হইতে বৈধরূপে প্রসূত। ইহাই জ্ঞানবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়া। যদি আমরা এই প্রাথমিক তত্ত্বের প্রতিবাদ করি, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি নিজের কাছেই আবার ফিরিয়া আসে;—আপনাকে আপনি পরীক্ষা করে;—স্বকীয় উপলব্ধ সত্যকে সংশয় করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সংশয় করিতে পারে না,—তাহার চেষ্টা বিফল হয়; সে, প্রথমে যাহা প্রতিপাদন করিয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাই প্রতিপাদন করে; স্বকীয় উপলব্ধ-সত্যকে সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে;—অধিকন্তু সংস্কার-বদ্ধ একটা নূতন ভাব আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়;—এবং সেই সত্যের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়াই, এই সংস্কারটি হইতে কিছুতেই সে আপনাকে বিনির্মুক্ত করিতে পারে না। তখনই—কেবল তখনই উহাতে সেই অবশ্যম্ভাবিতার লক্ষণ,—সেই বিষয়ি মুখিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে অবশ্যম্ভাবিতাকে প্রতিপক্ষগণ মূল-সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষগণ মনে করেন, মনের আরো গভীরদেশে প্রবেশ করাতেই যেন—সংশয়কে পরাভূত করাতেই যেন—সত্যের মূল্য হ্রাস হইল;—অহং চৈতন্যের প্রমাণে, প্রমাণের যেন খর্ব্বতা হইল; যেন, এই অবশ্যম্ভাবিতার ভাবটি সত্যের একমাত্র রূপ—গোড়াকার রূপ। ক্যাণ্টের সংশয়বাদকে যখন ঠেলিয়া একটা সংকীর্ণ কোণে লইয়া যাওয়া যায়, (তাঁহার সুবুদ্ধি ন্যায়-বিচারের বিরোধী নহে) তখন তিনি বাধ্য হইয়া জ্ঞানের দুইটি ভেদ স্বীকার করেন:—একটি, স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি; আর একটি চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান।

জ্ঞান যেখানে আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করে, সন্দেহের সহিত—মিথ্যা যুক্তির সহিত—ভ্রান্তির সহিত যুঝাযুঝি করে, চিন্তাক্রিয়াই তাহার সেই যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু চিন্তাক্রিয়ার ঊর্দ্ধে এমন-একটি জ্যোতির্ম্ময় শান্তিময় দিব্যলোক আছে—যেখানে জ্ঞান, আপনাতে ফিরিয়া না আসিয়াও, সত্যকে উপলব্ধি করে; সত্য বলিয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে। কেন না, ঈশ্বর যেমন দেখিবার জন্য চক্ষু দিয়াছেন, শুনিবার জন্য কর্ণ দিয়াছেন, সেইরূপ সত্য-উপলব্ধির জন্য প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন।

এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধিকে যদি অপক্ষপাতিতা-সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ ত দেখিতে পাইবে,—ইহা নিজে অহং না হইয়াও, অহং-এর সহিত সংমিশ্রিত। আমাদের তাবৎ জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে অহং এর প্রবেশ অনিবার্য্য; কেন না, অহং ই জ্ঞানের বিষয়ী। আমাদের জ্ঞান সত্যকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিলেও, কোন-না কোন প্রকারে অহং-এ ফিরিয়া আসিয়া আপনার পুনরাবৃত্তি করে। এইরূপেই আমাদের জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অহংচৈতন্য আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার সাক্ষী—বিচারকর্ত্তা নহে। এস্থলে একমাত্র প্রজ্ঞাই বিচারকর্ত্তা; এই প্রজ্ঞাই,—জর্ম্মাণ দর্শনের ভাষায়, বিষয়মুখী ও বিষয়ীমুখী—উভয়ই; প্রজ্ঞা, সার-সত্যকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করে;—উহাতে আমাদের নিজ-ব্যক্তিগত ভাবের কোন মধ্যবর্ত্তিতা নাই; তবে কিনা, ব্যক্তিত্ব গোড়ায় না থাকিলে, কিংবা সংযোজিত না হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকটিত হইতে পারে না।

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই নৈসর্গিক ন্যায়শাস্ত্র। যাহাকে প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র বলে—চিন্তামূলক জ্ঞান তাহার ভিত্তিভূমি। স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি আপনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত;—অর্থাৎ সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যেখানে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া—সত্যকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। যে ভাবপক্ষের কথা সম্পূর্ণরূপে সংশয়রহিত তাহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের রূপ। যে ভাবপক্ষের কথা চিন্তামূলক তাহাই চিন্তিত জ্ঞানের রূপ;—অর্থাৎ যাহা অস্বীকার করা অসম্ভব এবং যাহা প্রতিপাদন করিতে আমরা বাধ্য হই। অভাব পক্ষের কথা সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এই ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত যে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা,—তাহার প্রত্যেকটি দুইটি অভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞার দ্বারা বহুকষ্টে নিষ্পন্ন হয়। যে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা, নৈসর্গিক ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহার উপর সহজ প্রত্যয়ের একটা ছাপ থাকে; তাহা স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন,—স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারাই বিধৃত ও পরিপোষিত।

এখন ক্যাণ্ট ইহার উত্তরে এই কথা বলেনঃ—আমাদের প্রজ্ঞা যতই কেন বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত হউক না,—চিন্তাক্রিয়া হইতে, ইচ্ছাশক্তি হইতে, যাহা কিছু পুরুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—তৎসমস্ত হইতে, যতই কেন বিনির্ম্মুক্ত বলিয়া কল্পিত হউক না—তথাপি উহা পুরুষ-সংশ্লিষ্ট, উহা ব্যক্তিগত; কেন না, উহা আমাদের অহংচৈতন্যে প্রতিভাত হয়; সুতরং উহা "বিষয়ীর"ভাবে উপরঞ্জিত। এই তর্কের উত্তরে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই, শুধু আমরা এই কথা বলি;—ইহাতে যুক্তির দৌড় ও যুক্তির অভিমান এত বেশি যে এই আতিশয্যই উহার আত্মবিনাশের হেতু হইয়াছে।

ফলতঃ, প্রজ্ঞা বিষয়ীমুখী নহে—এই কথা প্রতিপন্ন করিতে গেলে যদি বলিতে হয় যে, কোন প্রকারেই আমরা উহার অংশভাগী হই না—এমন কি, উহার প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া আমরা জানিতেও পারি না—তাহা হইলে, এই বিষয়ীমুখিতার কলঙ্ক হইতে প্রজ্ঞার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় থাকে না; তাহা হইলে বলিতে হয়,—ক্যাণ্ট যে বিষয়-মুখী আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক ও উদ্ভট; তাহা আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তির—জ্ঞান নামের যোগ্য সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির বহু ঊর্দ্ধে (কিংবা বহু নিম্নে বলিলেও চলে) অবস্থিত। কেন না, তুমি চাহিতেছ, এই বুদ্ধিবৃত্তি—এই জ্ঞানবৃত্তি আপনাকে আপনি আর জানিবে না; অথচ উহাই বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ। তবে কি ক্যাণ্ট বলিতে চাহেন যে, প্রজ্ঞার বিষয়মুখী শক্তি প্রকৃত পক্ষে থাকিতে হইলে, কোন বিষয়ী-বিশেষের মধ্যে উহার আবির্ভাব হইবে না,—বিষয়ী যে আমি, সম্পূর্ণরূপে আমার বাহিরে উহা থাকিবে? তাহা হইলে আমার পক্ষে উহার কোন অস্তিত্বই নাই; উহা এমন একটা জ্ঞান—যাহা আমার নহে। যে জ্ঞান আমার নহে, তাহা পরমার্থতঃ সার্ব্বভৌমিক, অনন্ত, ও পূর্ণ হইলেও—আমার অহং-এ যদি প্রতিভাত না হয়, তাহা হইলে, আমার পক্ষে উহা না থাকারই সামিল। তুমি যদি চাহ—আমাদের জ্ঞান আর বিষয়ীমুখী থাকিবে না, তাহা হইলে এমন একটা জিনিস চাহিতেছ যাহা ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব। না,—স্বয়ং ঈশ্বরও নিজ-জ্ঞানের জ্ঞাতা। সুতরাং ঐশ্বরিক জ্ঞানেতেও বিষয়ীমুখিতা বিদ্যমান। যদি-বল এই বিষয়ীমুখিতার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, ঈশ্বরকেও বাধ্য হইয়া সংশয়বাদী হইতে হয়; তাহা হইলে মানুষের ন্যায় ঈশ্বরও সংশয়-বাদের জাল হইতে বাহির হইতে পারেন না। কিন্তু ইহা যদি নিতান্তই হাস্যজনক কথা হয়,—ঈশ্বর স্বকীয় জ্ঞান-ক্রিয়ার জ্ঞাতা একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঈশ্বরের মনে সংশয় বাদ আসিয়া না পড়ে; তাহা হইলে, আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার আমরা জ্ঞাতা—অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সহিত বিষয়ীমুখিতা অনুস্যূত—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্য্যরূপে আমাদের মনেই বা কেন আসিয়া পড়িবে?

ফলতঃ, যখন দেখা যায়—জর্ম্মান-দর্শনের যিনি জনক—স্বয়ং তিনিই, মূলতত্ত্ব-সমূহের বিষয়ীমুখিতারূপ সমস্যার গোলোকধাঁধার মধ্যে আত্মহারা হইয়াছেন, তখন রীড্ যদি এই সমস্যাটিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। রীড্ শুধু এই কথা বারম্বার বলেন সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্যতা—আমাদের চিত্ত-বৃত্তি সমূহের সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করিয়াই, উহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই। রীড্ বলেনঃ—আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের অহংচৈতন্য, আমাদের চিত্ত-বৃত্তি—এই সমস্তের কথা শুনিয়া আমরা কেন চলি, ইহার হেতুনির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে, আমরা শুধু এই কথা বলিঃ—ইহা এইরূপই হইয়া থাকে, ইহা ছাড়া অন্যরূপ হইতে পারে না। এই যে কথা, ইহা কি অনিবার্য্য বিশ্বাসের কথা নহে? ইহা সাক্ষাৎ প্রকৃতি দেবীর কণ্ঠনিসৃত বাণী; ইহার সহিত যুঝাযুঝি করা বৃথা। আরও অধিক দূর কি অগ্রসর হইতে হইবে? আমাদের

প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির নিকট হইতে আমরা কি তাহার বিশ্বাস্যতার প্রামাণিক দলিল চাহিব এবং যতক্ষণ না সেই দলিল দাখিল করিতে পারিবে ততক্ষণ কি তাহার কথায় আমরা বিশ্বাস করিব না? আমার ভয় হয় পাছে আমাদের এই অতিবুদ্ধি, বাতুলতায় পরিণত হয়, এবং মানবের সাধারণ দশার অধীন হইতে অস্বীকৃত হইয়া, পাছে আমরা মানবের সাধারণ-বুদ্ধি হইতেই বঞ্চিত হই।"

আমরা যাঁহাকে উনবিংশশতাব্দীয় ফরাসী দর্শনের পূজ্য গুরু বলিয়া মানি সেই রোয়াইয়ে কলার (Royer-Collard) এই সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—আমাদের মানসিক জীবন কি?—না, আমাদের বাহ্য বস্তুর প্রতীতি, আমাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বাস—এই সমস্তেরই ধারাবাহিক পারম্পর্য্য ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। মনের বিশ্বাসগুলিই আত্মশক্তি ও ইচ্ছার প্রবর্ত্তক। যাহা কিছু আমাদিগকে বিশ্বাসে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই আমরা প্রমাণ বলি। প্রজ্ঞা স্বীয় প্রমাণের কোন হেতু নির্দ্দেশ করে না। প্রজ্ঞার প্রমাণকে দুষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করাও যা' প্রজ্ঞার উচ্ছেদ করাও তা', একই কথা। প্রজ্ঞারও একটা নিজস্ব প্রমাণ আছে। বিশ্বাসের কতকগুলি মূলনিয়ম লইয়াই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি গঠিত। এই নিয়মগুলি একই উৎস হইতে নিস্যন্দিত, সুতরাং সমান প্রামাণ্য; একই অধিকারবলে উহারা বিচার করিয়া থাকে; উহাদের সকলেরই একই আদালৎ। একের আদালৎ হইতে অপরের আদালতে আপীল চলে না। উহাদের মধ্যে কেহ যদি অপর কোনটির প্রতি বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে সে সকলেরই প্রতি বিদ্রোহী—এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে; সে তখন তাহার নিজের প্রকৃতি হইতেই পরিভ্রষ্ট হয়।" আমরা যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সার-কথা-গুলি এইঃ—

১। তত্ত্বসমূহের বিষয়মুখী প্রামাণ্যতাকে দুর্ব্বল করিবার জন্য, ক্যাণ্ট তত্ত্বসমূহের অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষণের উপর যে যুক্তিস্থাপন করিয়াছেন,—তাঁহার সেই যুক্তি, তত্ত্বসমূহে চিন্তারোপিত রূপটির প্রতিই প্রযুজ্য, উহা তত্ত্বসমূহের স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োগ পর্য্যন্ত পৌঁছে না; কেননা, উহাদের সেই অবস্থায়, অবশ্যম্ভাবিতার লক্ষণ তখনও প্রকাশ পায় না।

২। ফল কথা, মানুষ বিশ্বাসগুলির সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা মানিয়া চলাই ঠিক্। সেই সব সিদ্ধান্তকে কোন অংশেই অপসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কেননা, কার্য্য হইতে কারণে, লিঙ্গ হইতে লিঙ্গীতে, ব্যাপক হইতে ব্যাপ্যে আরোহণ করাই তদনুসৃত যুক্তির প্রণালী।

৩। তাছাড়া, মূলতত্ত্ব সমূহের মূল্য, সকল প্রকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপরে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে যে ভাবপক্ষের কথা পাওয়া যায় তাহা সংশয়ের দুরধিগম্য! এই ভাবপক্ষের নিশ্চয়াত্মক কথা হইতেই প্রজ্ঞার অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সত্যতা সিদ্ধ হয়;—উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই তুল্যমূল্য; উহা ছাড়া অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিতে গেলে, প্রজ্ঞার নিকট এমন-একটা কিছু চাওয়া হয়, যাহা নিতান্ত অসম্ভব। যেহেতু সকল প্রকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের জন্যও কতকগুলি মূলতত্ত্ব অপরিহার্য্য—অতএব ঐ সকল মূলতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহারা নিজেই।

তৃতীয় উপদেশ সমাপ্ত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

কর্ম্মের হেতু কামনা, কারণ কামনাই তাহার প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আপ্তকাম, কামনার অভাবে তাঁহাদের স্বীয় আত্মাতে অবস্থান হয় সেই হেতু কর্ম্মে প্রবৃত্তি ঘটে না। আত্মকাম হইলেই লোকে আপ্তকাম হয়। তাঁহারা জানেন আত্মা ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। তদভাবে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও থাকে না। এই আত্মাই ব্রহ্ম। কারণ আত্মবিৎ ব্যক্তিরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে অবস্থানই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

কর্ম্মবাদী। আমি বলিব কাম্য ও নিষিদ্ধ কার্য্যের অনারম্ভ, আরব্ধ কার্য্যের উপভোগ দ্বারা ক্ষয় আর নিত্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যবায়ের অভাব এই কয়েকটী দ্বারা অযত্নতই আত্মাতে অবস্থান হইতে পারে তাহাই মোক্ষ। অথবা নিরতিশয় প্রীতি স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা কর্ম্মজন্য সুতরাং কর্ম্ম হইতেই মুক্তি হইবে।

না, এ-কথা বলিতে পার না। কারণ কর্ম্ম অনেক, যদিও মুমুক্ষু বর্ত্তমান দেহে কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম আরম্ভ না করুন কিন্তু অনেক সঞ্চিত কর্ম্ম থাকে সুতরাং তোমার কর্ম্মের অভাব অসিদ্ধ। যদি বল যাহারা ফলদানে অপ্রবৃত্ত সেই সমস্ত কর্ম্মই মিলিত হইয়া শরীর উৎপাদনের হেতু হয়। ঐ শরীরে উপভোগের দ্বারা সমস্তের ক্ষয় হইয়া গেলে তোমার সঞ্চিত কর্ম্ম আর কোথা থাকে। একথা তোমার টেঁকিবে না। এস্থলে অনেক জন্মান্তরকৃত স্বর্গ ও নরকরূপ বিরুদ্ধফল কর্ম্মের সম্ভাব তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এক জন্মে স্বর্গ পরজন্মে নরক এইরূপ বিরুদ্ধফল কর্ম্ম একজন্মেই উপভোগে ক্ষয় হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অবশিষ্ট কর্ম্ম জন্য শরীর উৎপন্ন হইবে। আর কর্ম্মশেষ যে থাকে তাহা শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ।

আর যদি তুমি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকে ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলপ্রদ অনারব্ধ অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের উচ্ছেদের হেতু বলিয়া স্বীকার কর তাহাও হইতে পারে না, কারণ কথিত আছে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রত্যবায় শব্দ অনিষ্ট-বিষয়। অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান নিমিত্ত ভাবী দুঃখরূপ যে প্রত্যবায় তৎসমূহের পরিহারার্থই নিত্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু যাহা ফলদানে অপ্রবৃত্ত সেই সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয়ার্থক নহে। আর নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয়ার্থক বলিয়া যদিও স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহা সঞ্চিতের মধ্যে যাহা অশুদ্ধ তাহাই নষ্ট করিবে, শুদ্ধকে নহে। কারণ শুদ্ধের সহিত নিত্যের বিরোধ নাই। অর্থাৎ ইষ্টফল কর্ম্ম শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যকর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ সঙ্গত হয় না। শুদ্ধের সহিত অশুদ্ধেরই বিরোধ হয়। আরও দেখ জ্ঞান না হইলে কর্ম্মের হেতু কামনার নিবৃত্তি হয় না সুতরাং অশেষ কর্ম্মক্ষয় কিরূপে সম্ভবপর হইবে। বলিতে পার আত্মজ্ঞেরও কামনা থাকে। কিন্তু দেখ যাঁহাদের চক্ষে সমস্ত জগৎই আত্মময়, আত্মাতিরিক্ত বাস্তব বিষয়ই নাই তাঁহাদের আর কিসে কামনা হইবে।

পূর্ব্ববাদী। তুমি বলিতেছ নিত্য নৈমিত্তিকের অকরণ বা অননুষ্ঠান নিমিত্ত যে প্রত্যবায় হয় তাহার পরিহার বা ক্ষয়ের জন্য নিত্যের অনুষ্ঠান। আমি এই 'অকরণ' শব্দে অভাব বলিব। এই অভাব হইতে প্রত্য-

বায়েরও অভাব হইবে, প্রত্যবায় আর ঘটিবে না।

সিদ্ধান্তী। হাঁ বুঝিলাম, কিন্তু শুন। প্রত্যবায় শব্দের প্রকৃত অর্থ আগামী দুঃখ, তাহা একটা ভাব পদার্থ, অভাব তাহার না ঘটিবার নিমিত্ত হইতে পারে না। যেমন পাপাচরণ করিলে পাপ হয়, এখানে একটা ভাব হইতে আর একটা ভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেইরূপ এই যে আগামী দুঃখ ইহা নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্তই ঘটে, সুতরাং ইহা একটা ভাব পদার্থ, ইহা না ঘটিবার পক্ষে অভাব নিমিত্ত হইতে পারে না। "অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম্ম ইত্যাদি" বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে মনুষ্যের পতন হয় এস্থলে অকুর্ব্বন্ পদটী হেতুঅর্থে শতৃপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান হেতু মনুষ্য পতিত হয়। এই হেতু অর্থে শতৃপ্রত্যয় হওয়ায় তুমি অকরণ শব্দে অভাব অর্থ দাঁড় করাইতে পার না। আর অভাবরূপ কার্য্যেরই ভাবরূপ কারণ থাকে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু অভাবরূপ কারণ হইতে ভাবরূপ কার্য্য হয় ইহা কোনও প্রমাণবলে সিদ্ধ করিতে পারিবে না। সুতরাং কর্ম্মবলে আত্মাবস্থিতিরূপ মুক্তি অযত্নতই হয় তোমার একথা কৈ থাকে।

তুমি বলিয়াছ যাহা স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সেই যে নিরতিশয় প্রীতি তাহা কর্ম্মজন্য, সুতরাং কর্ম্মারব্ধই মোক্ষ হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না। কারণ মোক্ষ নিত্য পদার্থ। নিত্য কোন কিছুই আরব্ধ হইতে পারে না। দেখা যায়, যা কিছু আরব্ধ হয় তাহা অনিত্য। সুতরাং মোক্ষকে কর্ম্মারব্ধ বলিতে পার না। যদি বল জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের নিত্য বস্তুর আরম্ভে সামর্থ্য আছে। এ কথাও বলিও না, কারণ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধ, উভয়ের সমন্বয় হয় না। আর নিত্যবস্তুর আরম্ভ ইহাও একটী বিরুদ্ধ কথা। তুমি বলিবে যাহা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাই উৎপন্ন হয় না কিন্তু এই ধ্বংসের অভাববিশিষ্ট মোক্ষ নিত্য হইলেও আরব্ধ হইবে। না ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ তোমার মতে মোক্ষ ভাবরূপ। যাহা ভাবরূপ কার্য্য তাহা অনিত্য এই তো ব্যাপ্তি। মোক্ষ নিরতিশয় প্রীতির ভাব সুতরাংই ইহা অনিত্য হইতেছে। আর বলিয়াছ ধ্বংসাভব হেতুই আরভ্য হইবে কিন্তু এই প্রধ্বংসের কার্য্যত্বই নাই, কারণ ধ্বংসটা ভাববিকারমাত্র। আর এই প্রাগভাব অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহার সত্তাসমবায়াদি ধর্ম্ম ঘটে না। এবং উত্তর কালের সহিত ইহার যোগও ঘটে না। কারণ কালের সহিত ইহার সম্বন্ধই নাই। সমবায়ই যোগাযোগের মূল। অতএব যখন অভাবের বিশেষত্ব কিছু নাই তখন ইহার কার্য্যত্ব কল্পনা মাত্র। আরও দেখ অভাব ভাবের প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতা হেতু ভাবরূপ ধর্ম্ম ইহার সম্ভব হইতেছে না। বিশেষ্যের সহিত যাহার অন্বয় থাকে তাহাই বিশেষণ। এস্থলে প্রতিযোগী বিশেষণসূত্রে অভাবের সহভাব ঘটে না। ঘটপ্রধ্বংসের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে ঘটেরও নিত্যত্ব প্রসক্তি হয়, আবার ঘটসহভাবিত্বে ধ্বংসাভাবেরও ব্যাঘাত হয়। ভাব ও অভাবের সহাবস্থান একটী বিরোধী ব্যাপার। ফলত বিশেষণবত্তা থাকিলেই তাহা ভাবই হইবে। এখন অভাবটীকে সবিশেষ বলিয়া তাহার কার্য্যত্বাদি স্বীকার তোমার ভ্রমমাত্র।

এখন তুমি বলিতে পার জ্ঞান ও কর্ম্মের

যিনি কর্ত্তা তিনি নিত্য; এই কর্ত্তৃনিত্যত্বে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনবচ্ছেদ হেতু মোক্ষও নিত্য হইবে। না, ইহাও ঠিক নয়। কর্ত্তৃত্বের উপরম না হইলে মুক্তি হয় না। আর যদি উপরম স্বীকার কর তাহা হইলে কর্ত্তার অভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের নিরবচ্ছিন্ন সাধন থাকে না সুতরাং তৎসাধ্য মুক্তিও ঘটিল না। অতএব এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাঁকে জানিলেই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয় এইজন্য মোক্ষের প্রতি একমাত্র জ্ঞানই বিশেষ অপেক্ষিত।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

অভ্যাস ও সাধনা।

১ আমাদের প্রত্যেক শক্তিকে—প্রত্যেক বৃত্তিকে যদি আমরা কাজে খাটাই তবেই উহা পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে; চলিবার শক্তি, চলিয়া—দৌড়িবার শক্তি, দৌড়িয়া বর্দ্ধিত হয়। তুমি যদি সুচারুরূপে কোন-কিছু আবৃত্তি করিতে চাহ, তাহা হইলে ক্রমাগত তাহার আবৃত্তি করিতে হইবে; যদি ভাল লিখিতে চাহ, তাহা হইলে ক্রমাগত লিখিতে হইবে। যদি একমাস কাল তুমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি না কর—আবৃত্তি না করিয়া আর কিছু কর—তাহা হইলে দেখিবে, তাহার ফল কি হয়। যদি তুমি দশ দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া, তাহার পর একদিন, অনেক দূর হাঁটিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার পা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। স্থূল কথা, যদি কোন বিষয়ে তুমি দক্ষতা লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে, কাজে তাহা কর; আর যদি কোন বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে চাহ, তাহা হইলে, একেবারেই তাহা করিও না। তাহার বদলে আর কিছু কর।

২। আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঠিক্ এইরূপ। তুমি যদি একবার ক্রুদ্ধ হও, তাহা হইলে জানিবে, তাহাতে তোমার একবার মাত্র অনিষ্ট হইল না,—প্রত্যুত, ঐ অনিষ্টের প্রবণতা বৃদ্ধি হইল;—তুমি অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে। তুমি যদি রিপুর দ্বারা অভিভূত হও, তাহা হইলে মনে করিও না—তোমার উপর রিপু একবার মাত্র জয় লাভ করিল; পরন্তু ইহার দ্বারা তুমি তোমার ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যকে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিলে। কেননা কার্য্যের দ্বারাই শক্তিসমূহ—বৃত্তিসমূহ ফুটিয়া উঠে, প্রবল হইয়া উঠে, ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, এইরূপেই আত্মারও পাপ প্রবণতার বৃদ্ধি হয়। ধনে যদি তোমার কখন লোভ হয়, আর সেই সময়ে যদি তুমি ধর্ম্মবুদ্ধির শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে, তোমার লোভেরও দমন হইবে এবং তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিও বললাভ করিয়া স্বপদে পূর্ব্ববৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যদি তুমি ধর্ম্মবুদ্ধির শরণাপন্ন না হও, তাহা হইলে, তোমার আত্মার পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল অবস্থা আর ফিরিয়া পাইবে না; যখনি আবার কোন প্রলোভন আসিবে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো শীঘ্র তোমার বাসনানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। এই-

রূপ যখন ক্রমাগত ঘটিতে থাকিবে, তখন তোমার আত্মা ক্রমশঃ অসাড় হইয়া পড়িবে; এবং দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত, তোমার ধনলালসাও আরো প্রবল হইয়া উঠিবে। যে ব্যক্তি একবার জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার জ্বর ত্যাগ হইলেও,—সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলে, সে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আত্মার রোগেও এইরূপ হইয়া থাকে। রোগের পর, আত্মায় যে সকল ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়, সেই ক্ষতচিহ্নগুলিকে যদি একেবারে নির্ম্মূলিত না কর, আর সেই সব স্থানে আবার যদি কখন পাপের আঁচ লাগে, তাহা হইলে, সেই ক্ষতচিহ্নগুলি তখন আর চিহ্নমাত্র থাকে না, তখন সেইখানে আবার "দগ্‌দগে ঘা" হইয়া পড়ে।

৩। "আমার কোপন-স্বভাব চলিয়া যাউক"—এইরূপ যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উহার প্রবণতাকে পোষণ করিও না; উহাতে এমন-কোন আহুতি প্রদান করিও না যাহাতে উহা আরো জ্বলিয়া উঠে; প্রথম হইতেই শান্তভাব ধারণ কর; এবং বিনা ক্রোধে কতদিন অতিবাহিত হইল তাহার গণনা করিতে থাক;—"এইবার আমি একদিন ক্রুদ্ধ হই নাই;—এইবার, দুই দিন ক্রুদ্ধ হই নাই;—এইবার, তিন দিন ক্রুদ্ধ হই নাই";—এইরূপ যদি ৩০ দিন ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পার, তখন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে প্রবণতাগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া, একেবারেই নির্ম্মূলিত হইবে।

৪। ইহাতে সুসিদ্ধ কিরূপে হওয়া যায়? আত্মপ্রসাদ লাভ করিব,—ঈশ্বরের সমক্ষে নিষ্কলঙ্ক সুন্দর থাকিব—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ কর; আমি আমার নির্ম্মল অন্তরাত্মার নিকটে নির্ম্মল থাকিব, ঈশ্বরের নিকটে বিশুদ্ধ থাকিব—সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ ইচ্ছা কর। পরে যদি কোন প্রলোভনে পতিত হও, তখন কি করিবে? প্লেটো কি বলেন শোনো:—পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, দুর্ব্বলের সহায় ও আশ্রয় দেবতাদিগের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনাদি কর।" কি মৃত, কি জীবিত—সর্ব্বপ্রকার সাধু ও জ্ঞানী লোকের সহবাস অন্বেষণ কর, তাহা হইলেও যথেষ্ট হইবে।

৫। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে, তুমি প্রলোভনকে জয় করিতে পারিবে;—প্রলোভনের দ্বারা অভিভূত হইবে না। কিন্তু প্রথম হইতেই প্রলোভনের উদ্দামবেগে ভাসিয়া যাইও না। প্রথমেই তাহাকে এইরূপ বলিবে:—"রে প্রলোভন! একটু অপেক্ষা কর্; আগে আমি দেখি—বস্তুটা তুই কি;—আর, তোর কাজটাই বা কি;—তোকে একবার যাচাইয়া লই।" প্রলোভনের দ্বারা নীয়মান হইবার পূর্ব্বে, একবার মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখ, উহার শেষ-পরিণামটা কি। তা যদি না কর, তোমার চিত্তকে সে অধিকার করিয়া বসিবে এবং যেখানে-খুসি তোমাকে লইয়া যাইবে। আর এক কাজ কর;—এই নীচ প্রলোভনের বিরুদ্ধে একটা উচ্চতর মহত্তর প্রলোভন আনিয়া তোমার সম্মুখে খাড়া কর, এবং সেই উচ্চ প্রলোভ-

নের সাহায্যে, নীচ প্রলোভনটাকে দূর করিয়া দেও। এইরূপে যদি তুমি অভ্যাস সাধনা কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার স্কন্ধ, তোমার পেশী, তোমার স্নায়ু কতটা বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়াছে! কিন্তু তাহা না করিলে, কেবল কথাই সার হইবে—কথা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

৬। সে-ই যথার্থ মল্লযোদ্ধা, যে এই সকল প্রলোভনের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করে। মহান্ এই সংগ্রাম, স্বর্গীয় এই ব্রত,—যাহার ফল সর্ব্বাধিপত্য, যাহার ফল স্বাধীনতা, যাহার ফল সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি, যাহার ফল চিত্ত শান্তি। ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও। ঝড়ের সময় নাবিক যেমন বরুণদেবকে ডাকে, তেমনি এই প্রলোভন-ঝটিকায় ঈশ্বরকে ডাক। যে ঝড়ে বিবেকবুদ্ধি অভিভূত ও বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা-অপেক্ষা প্রবল ঝড় আর কি আছে? আর যাহাকে ঝড় বল—সেই বা কি? সেও ত একটা প্রতীতি মাত্র—একটা অবভাস মাত্র। তাহা হইতে মৃত্যুভয় অপসারিত করিয়া লও,—তখন,—যতই বজ্র বিদ্যুৎ হউক—দেখিবে, আকাশ বেশ নির্ম্মল;—দেখিবে, আত্মার কাণ্ডারী সেই বিবেক-বুদ্ধি কেমন সুস্থির ও প্রশান্ত! কিন্তু একবার পরাভূত হইয়া, যদি তাহার পর তুমি বল:—"এইবার আমি জয়ী হইব," এবং প্রত্যেক বার যদি এই একই কথা তুমি বলিতে থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে,—অবশেষে তোমার এমন একটা হীনদশা হইবে—তোমার এমন একটা দুর্ব্বল অবস্থা আসিয়া পড়িবে যে, তখন তুমি পাপ করিতেছ বলিয়া জানিতেও পারিবে না; তখন তুমি সেই পাপ-কার্য্যের জন্য নানাপ্রকার ওজর খুঁজিতে থাকিবে; তখন হেসিয়ডের এই উক্তিটির সত্যতা সপ্রমাণ হইবে:—

"দীর্ঘসূত্রী যুঝে সদা অশেষ অনর্থ-সাথে।"

৭। তবে কি মানুষ এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া চিরকাল নির্দ্দোষ থাকিতে পারে?—না, তাহা পারে না। তবে নির্দ্দোষিতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা—মানুষ অন্ততঃ এইটুকু পারে। আমাদের চেষ্টায় একটুও বিরাম না দিয়া, কিছুমাত্র শৈথিল্য না করিয়া, অন্ততঃ দুই চারিটি দোষ হইতেও যদি আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের পরম সৌভাগ্য! তুমি যে এখন বলিতেছ—"কল্য হইতে আমি সাবধান হইব", এ কথার অর্থ এই:—"আজ আমি নির্লজ্জ হইব, দুরাগ্রহী হইব, নীচ হইব; আজ আমাকে কষ্ট দিতে অপরের সামর্থ্য থাকিবে, আজ আমি ক্রোধের বশীভূত হইব, ঈর্ষার বশীভূত হইব।" দেখ, কতগুলা পাপকে তুমি ডাকিয়া আনিতেছ! কল্যকার জন্য যদি কোন কাজ ভাল মনে কর, আজ সে কাজ কেননা আরো ভাল হইবে? কাল যদি কোন কাজ, করিবার যোগ্য হয়, আজ কি তাহা আরো করিবার যোগ্য নহে? আজ, সে কাজ আরো এইজন্য করা উচিত যে, কাল তাহা করিতে

তুমি সমর্থ হইবে—করিবার জন্য বল পাইবে; তাহা হইলে তুমি আর তাহা পর দিনের জন্য স্থগিত রাখিবে না।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪০৪।/০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৭২৪৲
সমষ্টি	...	২১২৮।/০
ব্যয়	...	৩৭৪ /৯
স্থিত	...	১৭৫৪/৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
হুণ্ডকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
২৫৪/৩

১৭৫৪/৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭৬৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর
৬৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
১০৲

বেঙ্গল বণ্ডেডওয়ার হাউসের সেয়ার
মাঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়
৫০৲

২৭৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৯।০
পুস্তকালয়	...	৪॥০
যন্ত্রালয়	...	৬৮৸/০
গচ্ছিত	...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন	...	॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৫৲
সমষ্টি	...	৪০৪।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬১/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪১৸০
পুস্তকালয়	...	৯।/০
যন্ত্রালয়	...	১৫৭৸/০
গচ্ছিত	...	৪৲
সমষ্টি	...	৩৭৪/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০।

৬৭০ সংখ্যা — ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৬ কলিগতাব্দ ৫০০০। ৫ পৌষ বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৭ শক, ১৩ অগ্রহায়ণ, বুধবার।

প্রার্থনা।

কোথায় অনাথনাথ! ডাকি তোমায়, এ ঘোর অন্ধকারময় সংসারে। আমরা আপনারা কিছু এখানে আসি নাই, তুমিই আমাদিগকে এখানে আনিয়াছ; এ অতি কঠোর শিক্ষাস্থান। যেমন পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীর উৎপত্তি; তেমনি এ সংসারের দুঃখ তাপ ক্লেশ কষ্ট হইতেই আমাদের শিক্ষা ও সৎভাব এবং পরমানন্দ লাভ হইবে এই ত আশা করা যায়, তাহা না হইলে, "দীনদয়াময় বল্‌বে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর।" এ সংসার-সমুদ্র দেখিয়া হৃদয় ভয়ে আকুল! এ দেহ এ মন-তরী তরঙ্গাঘাতে ডুবিল ডুবিল সততই এই আশঙ্কা। এ অন্ধকারে এ তরঙ্গতুফানে, আমরা দেহ ও মন-তরীর হাল ধরিয়া রাখিতে পারি না—তরীকে গম্য স্থানে লইয়া যাইতে পারি না। হৃদয় কেমন ভয়ে ভীত তাহা তুমি বিনা আর কেহই জানে না। কাম ক্রোধ মোহ লোভ প্রভৃতি বিপদ আর ঝঞ্ঝাবাত বিদ্যুৎরূপ দৈব আকস্মিক বিপদ নিয়তই আমাদিগকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে; কি করি কোথায় যাই। তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছ; কিন্তু আমরা যে অতি দুর্ব্বল নাথ! এ দুর্ব্বলতা পরিহার জন্য তোমার মত সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় পিতা ভিন্ন আর কাহার কাছে ক্রন্দন করিব? আমাদের এ দুর্ব্বল হৃদয় কত প্রকারেই ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। বিরহ বিচ্ছেদ, পাপ তাপ, অকারণ শত্রুতা, অন্তর ও বাহিরের শত্রু আমাদিগকে নিতান্তই অবসন্ন করিতেছে। মনুষ্যের নিকট কি সাহায্য চাহিব, মানুষ এ সঙ্কট হইতে মুক্তি দিতে পারে না। তুমি ভিন্ন এ সঙ্কট হইতে কে আর আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। দ্বিপ্রহর রজনীতে যখন সকলি নিস্তব্ধ, তখন নীরবে যখন ধারাবাহী অশ্রু বিগলিত হয়, তখন তুমি ভিন্ন কে আর সে অশ্রুবারি বিমোচন করিবে? কোথায় করুণাময়ী মাতঃ! আমরা ভীত হইয়া তোমায় ডাকি; মাগো একবার সাড়া দাও। "সাড়া কি দিবে না, দাবে কি চাবে না, রাখ্‌বে ফেলিয়ে এ ঘোর আঁধারে।" মাতঃ! তোমার সাড়া

না পাইলে, প্রাণ কিরূপে ধারণ করি। মাতঃ! কি পথ কি অপথ তুমি নিঃশব্দে বলিয়া দাও। এ মোহ-রাক্ষসী সর্ব্বনাশ সাধন করিল, কি লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিল; এ দুর্ব্বল হস্ত আর যে কিছুতেই তাহা ছিন্ন করিতে পারে না। বল দাও, বল দাও, এ হস্তে বল দাও, যাহাতে সে শৃঙ্খল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে পারে; যদি না পারে তবে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি, তুমি তাহা নিজে ছিন্ন করিয়া দাও। "মোহবন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে, আমরা আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামী।" মাগো! কঠিন দুঃখে ক্ষতবিক্ষত হইয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। একবার কৃপা করিয়া দেখা দেও। সমস্ত দুঃখ অপসারিত হউক। কেমন করিয়া মা তোমায় দেখিব, চর্ম্মচক্ষু শোকাশ্রুতে পরিপ্লুত—জ্ঞানচক্ষু মোহ-আঁধারে আবৃত।

"তুমি জ্যোতির জ্যোতিঃ
দেখা দাও আমারে।
রবিশশীতারা শোভে না আমার কাছে
যদি হারাই তোমারে।"

করুণাময়ী, তোমার অভাবে জীবন মৃত্যু-সমান। বরং মৃত্যুও ভাল, তোমার অদর্শন—তোমার বিরহ অসহ্য। যে কখন অসহ্য বেদনা সহ্য করিয়াছে সেই জানে যে কি অসহনীয় সেই বেদনা। যে কেহ যাহা কিছু এ অদর্শনের পথে এ বিরহের পথে আমাদিগকে লইয়া যায়, মা! তুমি সেই কঠিন শত্রুকে বিনাশ কর। আমরা আপন বলে তাহা সাধন করিতে পারি না।

"আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা করুণা তোমার।"

মাগো! ধ্যানস্থ হইলেই কি আত্মার মধ্যে তোমাকে নিজ বলে দেখিতে পাই—কৈ তাহা ত পাই না—কত অভ্যস্ত চিন্তা—সংসারচিন্তা—পার্থিব চিন্তা আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়, আবার শাস্ত্র আসিয়া বলে—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং।"

কিন্তু প্রাণ ত মানে না, বিপদে সঙ্কটে মোহে আক্রান্ত হইয়া সে তোমার অমোঘ সাহায্য চায়—তোমাকে অন্তরে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, এ বাসনা কি পূর্ণ হইবে না? একান্ত ব্যথিত—একান্ত ব্যাকুল তোমার দুঃখী সন্তানদিগকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও। তাহাদিগকে তোমার স্পর্শ-সুখ একবার অনুভব করিতে দাও।

"দরশন দাও মা কাতরে, দীন হীন মোরা।
রোগে আতুর, শোকে কাতর,
মলিন বিষাদে।"

মাগো! তোমার করুণাপূর্ণ মুখের জ্যোতিতে আমাদের মোহ-অন্ধকার দূর কর। তোমার বিমল আনন্দে আমাদের আত্মাকে পূর্ণ কর; কেন মা পৃথিবীর ক্ষুদ্র আনন্দের লোভে তোমার পূর্ণ আনন্দে বঞ্চিত হই? এই হৃদয় তোমার নিকটে আমরা খুলিয়া দিতেছি তুমি একবার তাহা আলো করিয়া উপবেশন কর। আমাদের যাহা নিবেদন করিবার থাকে তাহা বলি; তুমি তাহা কৃপা করিয়া শ্রবণ কর। আমরা তোমার ক্রোড়ে আত্ম-হারা হইয়া যাই। কেন তুমি তাহা পূর্ণ করিবে না? তোমায় দেখিতে দেখিতেই যেন আমাদের ইহ জীবন অবসান হয়—আর সেই দিন যাহা অতি নিকট, সেই দিনে যেন আহ্লাদের সহিত আত্মার পবিত্রতা ধারণ করিয়া তোমার করুণা বক্ষে ধারণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার আনন্দ ধামে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত তোমার মহিমা গান করিতে পারি, এবং তোমায় স্পষ্ট রূপে অনুভব করিয়া সুস্পষ্ট রূপে দর্শন করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে

পারি। উঃ! কি আনন্দের দিন, যখন পাপ তাপ দূরে যাইবে—অনুতাপ আত্মাকে স্পর্শ করিবে না—সকল প্রকার বিরহ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা চলিয়া যাইবে,যখন সকলে উদাস হইয়া তোমার স্নিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ মুখ দেখিতে দেখিতে তোমাতে নিমগ্ন হইবে। আর এখানে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া—ভ্রাতৃভাব সাধন করিয়া—পবিত্র প্রেম বিলাইয়া কত দিনে মা তোমার আনন্দধামে আমরা উপস্থিত হইব। করুণাময়ী—কৃপা করিয়া তুমি তাহার উপায় বিধান কর। এই তোমার নিকটে যোড় করে আমাদের প্রার্থনা।

"তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে,

—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

চতুর্থ উপদেশ।

ঈশ্বর মূলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব।

যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হয় তাহাদের সত্তা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অবধারিত হইয়াছে যে, সত্য এবং যে সকল মূলতত্ত্ব সত্য নামের যোগ্য তৎসমস্তই আমাদের বাহিরে। আমরা উহাদিগকে উপলব্ধি করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। উহা আমাদের মনের সঙ্কল্পন মাত্র নহে; পরন্তু আমাদের মন যদি উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে নাও পারে, তথাপি উহারা থাকিবে। এক্ষণে স্বভাবতই এই সমস্যাটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে;—এই সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি স্বরূপতঃ—পরমার্থতঃ কি রূপ? উহারা কোথায় অবস্থিতি করে? কোথা হইতে আইসে? শুধু যে আমরা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিতেছি তাহা নহে, স্বয়ং মানবচিত্ত হইতে এই প্রশ্নটি উত্থিত হইতেছে। মনুষ্য যতক্ষণ না ইহার একটা মীমাংসা করে,—যতদূর সম্ভব, জ্ঞানের শেষ সীমা স্পর্শ করে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

ইহা নিশ্চিত যে, সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি প্রজ্ঞার অধিকার-ভুক্ত—প্রজ্ঞাই উহাদিগকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে। এইরূপে, মনোরাজ্যের গভীর প্রদেশে, আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত উহা ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত। সত্যের জ্ঞাতা পুরুষের সহিত নৈকট্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সত্য এইরূপ প্রতীয়মান হয় যেন উহা মনেরই একটা সঙ্কল্পন মাত্র। যাহাই হউক, আমরা সত্যের জ্ঞাতা—সত্যের জনক নহি;—একথা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। যে "আমির" সহিত আমাদের প্রজ্ঞা জড়িত সেই আমি যদি প্রজ্ঞাতত্ত্বেরই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে না পারে, তবে সত্যের ব্যাখ্যা—পারমার্থিক সত্যের ব্যাখ্যা সে কি করিয়া করিবে? সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য, অসীম অনন্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যকে উপলব্ধি করে এইমাত্র। মনুষ্য এইটুকু অধিকার যে পাইয়াছে ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তাহার সত্তা,পারমার্থিক সত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট নহে—সংগঠিত নহে। মানুষ শুধু বলিতে পারে;—"আমার প্রজ্ঞা"; কিন্তু একথা বলিতে কখন সাহস করে নাই;—"আমার সত্য"।

কিন্তু আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি—মানব-উপলব্ধ সারসত্যগুলি যদি মানবচিত্তের বাহিরে থাকে—তবে উহারা কোথায় থাকে? অ্যারিষ্টটলের কোন শিষ্য উত্তর করিবেন;—উহারা পদার্থসমূহের

মধ্যে থাকে। যে সকল সত্তা, এইরূপ সত্যের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল সত্তা ছাড়া, আর কোন সত্তার সন্ধানে ঐ সকল সত্য ধাবিত হয় কি না? প্রাকৃতিক নিয়ম আর কাহাকে বলে? পৃথক রূপে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমাদের মন, সত্তাদি হইতে—তথ্যাদি হইতে, যে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত করিয়া লয়, তাহাই ত প্রাকৃতিক নিয়ম। গণিতের মূল তত্ত্বগুলি তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন মনে কর, গণিতের এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য;—"অংশ অপেক্ষা, সমস্তটা বড়" যেকোন পদার্থের সমস্ত সম্বন্ধেই,—যে-কোন পদার্থের অংশ সম্বন্ধেই এই সত্যটি উপলব্ধ হইয়া থাকে। হাঁ, না,—দুই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ;—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধতার যে নিয়ম—ইহা তর্ক শাস্ত্রানুসারে, বাস্তবিকই আমাদের সকল সিদ্ধান্তের—সকল যুক্তির মূলে অবস্থিত। ইহা সকল সত্তারই সারাংশ। ইহা ব্যতীত কোন সত্তাই থাকিতে পারে না। অ্যারিষ্টটল বলেন,—কতকগুলি সার্ব্বভৌম সত্তা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহারা বিশেষ সত্তাসমূহ হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহে।

অ্যারিষ্টটল্ যে বলেন, বিশেষ পদার্থ সমূহের মধ্যে সার্ব্বভৌম তত্ত্ব অবস্থিতি করে—এ কথা অযৌক্তিক নহে। কেন না, সার্ব্বভৌম তত্ত্বকে ছাড়িয়া বিশেষ পদার্থসমূহ থাকিতেই পারে না। সার্ব্বভৌম তত্ত্বগুলিই, উহাদিগকে অচল প্রতিষ্ঠ করে, উহাদের একতা সম্পাদন করে। কিন্তু সার্ব্বভৌম তত্ত্ব, বিশেষ পদার্থসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহাদের ছাড়া আর কোথাও অবস্থিতি করে না, এবং উহাদের ছাড়িয়া সার্ব্বভৌম তত্ত্বের নিজস্ব কোন সত্তা নাই? কিন্তু এমন কতকগুলি তত্ত্বও আছে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমতার উপাদানে গঠিত। একথা সত্য, বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই আমরা সার্ব্বভৌমিক কারণতত্ত্বে উপনীত হই। কিন্তু এই তত্ত্বটি, কারণোৎপন্ন কার্য্যটি হইতে অধিক ব্যাপক। কেননা, শুধু যে এই কার্য্যটির সম্বন্ধেই তত্ত্বটির প্রয়োগ হয় তাহা নহে, আরো অসংখ্য কার্য্য সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন একটা বিশেষ তথ্যের মধ্যে একটা ব্যাপক তত্ত্ব নিহিত থাকে বটে; কিন্তু উহার সমস্তটাই যে উহার মধ্যে থাকে এরূপ নহে। তথ্যের উপর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, তত্ত্বের উপরেই তথ্য প্রতিষ্ঠিত। পাটীগণিত ও জ্যামিতির সার্ব্বভৌম অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি, রাশির উপর অথবা আয়তনের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ঐ তত্ত্বগুলিই রাশি ও আয়তনের নিয়ামক।

তবে কি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে—যে হেতু, কি মনুষ্য কি প্রকৃতি—কেহই পারমার্থিক সার সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, অতএব উহারা আপনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে, আপনারাই আপনার প্রতিষ্ঠাভূমি, আপনারাই আপনার আধার?

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি, পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা আরো অযৌক্তিক। কেননা আমি জিজ্ঞাসা করি—কোন্ সত্যগুলি (কি নিত্য, কি আগন্তুক) পদার্থ-সমূহের ও বুদ্ধিবৃত্তির বাহিরে থাকিয়া, আপনাতে আপনি অবস্থিতি করে? তাহা যদি হয় তবে সত্য—বাস্তবতায়-পরিণত একটা অতিসূক্ষ্ম ভাব

ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক সুবুদ্ধির প্রতিকূলে, কোন অতি-সূক্ষ্ম তন্ত্রের তত্ত্ববিদ্যা প্রবল হইতে পারে না। প্লেটোর জ্ঞান-বাদে ideas যদি এই-রূপ কোন অতিসূক্ষ্মতার ভাব থাকে, তবে অ্যারিষ্টটল ইহার প্রতিকূলে ন্যায্যতঃ দণ্ডায়মান হইতে পারেন। কিন্তু অ্যারি-ষ্টটল, প্লেটোর সহিত সংগ্রাম-সাধ মিটাই-বার জন্যই যেন তাঁহার মতটিকে এইরূপ ভাবে দাঁড় করাইয়াছেন.;—ইহা অ্যারি-ষ্টটলের স্বকপোল-কল্পিত মত।

তবে আর বিলম্ব না করিয়া, সারসত্য গুলিকে এই দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতার অবস্থা হইতে উদ্ধার করা যাউক। কিন্তু কি প্রকারে তাহা করা যাইবে? যে মূলতত্ত্ব-টির সহিত তোমরা এখন সুপরিচিত, সেই মূলতত্ত্বটি, ঐ সারসত্য গুলির প্রতি প্রয়োগ কর।

হাঁ, সারসত্য, স্বকীয় সত্তার সমর্থণার্থ বাধ্য হইয়া এমন একটা কিছুর দোহাই দেয় যাহা তাহার অতীত। যেমন প্রত্যেক ঘটনার একটা আধার আছে; যেমন আমা-দের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি,—একটা কোন বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কোথাও অবস্থিতি করে না (এবং যে সত্তা আমরা নিজেই) সেইরূপ, সত্য বলিলে, সত্যেরও একটা বিশেষ আধার আছে এইরূপ বুঝায়; এবং পারমার্থিক মূলসত্য বলিলে বুঝায় যে, সেই মূল সত্যের অনুরূপ একটি মূলসত্তাও আছে—সারসত্যগুলি যাহার চরম প্রতিষ্ঠা-ভূমি।

এইরূপে আমরা এমন একটা পরমতত্ত্বে উপনীত হই যাহা অস্পষ্ট একটা সূক্ষ্ম ভাব মাত্র নহে, পরন্তু যাহার একটা বাস্তবিক সত্তা আছে। এই সত্তাটি অবশ্যম্ভাবী সত্তা —পরম সত্তা; কেন না, ইহাই অবশ্যম্ভাবী সারসত্যসমূহের আধার। এই সত্তা, সত্যের গভীরদেশে—সত্যের সারাংশরূপে বর্ত্ত-মান। এক কথায়, এই সত্তাই ঈশ্বর।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর।

১। ঈশ্বর হিতকারী। মঙ্গলও হিত-কারী। অতএব ইহাই সম্ভব,—যেখানে ঈশ্বরের সারাংশ সেইখানে মঙ্গলেরও সা-রাংশ থাকিবে। ঈশ্বরের সারাংশ কি? —মেদমজ্জা মাংস?—না, তাহা হইতেই পারে না।—ভূসম্পত্তি? না, তাহাও নহে। যশ? না, তাহাও নহে। মন, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা? হাঁ তাহাই বটে। ইহা মঙ্গলেরও সারাংশ। ইহা কি তুমি উদ্ভি-জ্জের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে? কখনই না। কোন অজ্ঞান জীবের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে? কখনই না। বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন জীব আর অজ্ঞান জীব এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ, সেই ভেদের মধ্যেই ইহার অন্বেষণ না করিয়া, এখনও কেন অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছ?

২। উদ্ভিজ্জেরা ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনু-সারে কাজ করে না। অতএব, ইহাদের সম্বন্ধে মঙ্গলামঙ্গলের কথা আমি বলিতেছি না। ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে কাজ করি-বার যাহাদের শক্তি আছে, মঙ্গলের কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। শুধু কি তাই? না, শুধু তাহাই নহে। কেননা তা যদি হয়, তবে বলিতে হইবে শুভ ও অশুভ নিকৃষ্ট জীবের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা তুমি কখনই বলিবে না। আর তো-

মার কথাও ঠিক্। কেননা, যদিও তাহারা সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-প্রতীতি-অনুসারে চলিতে পারে, কিন্তু উহার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার করিতে তাহারা অসমর্থ। এবং ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহারা অপরের সেবার জন্যই রহিয়াছে। তাহাদের নিজের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই। গর্দ্দভ-জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি? পরের ভার বহন করাই তাহাদের একমাত্র কাজ। পরের প্রয়োজনের জন্যই তাহাদের পথ চলিতে হয়। এবং সেই জন্যই সে, ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে কাজ করিবার শক্তি পাইয়াছে। তা না হইলে,সে চলিতে পারিত না। কিন্তু তাহার এই পর্য্যন্তই শেষ। কেননা, ইন্দ্রিয়-প্রতীতির ব্যবহার সম্বন্ধে যদি তাহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বিচার শক্তিও থাকিত, তাহা হইলে ন্যায্যতঃ সে আর আমাদের অধীন হইত না, আমাদের সেবায় নিযুক্ত হইত না; তাহা হইলে সে আমাদের সমতুল্য হইত—আমাদের সদৃশ হইত।

৩। কেননা, ব্যবহার এক কথা, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন আর এক কথা। ইতর জীবেরা শুধু ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারেই কাজ করিবে, কিন্তু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতীতিগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিব—অনুশীলন করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। এইজন্য আহার নিদ্রা মৈথুন—এই সকল কাজই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের শক্তি দিয়াছেন, তাই আমাদের পক্ষে উহা যথেষ্ট নহে। কিন্তু আমরা যদি কোন একটা বিশেষ অনুশাসন ও নিয়ম অনুসারে, বাহ্য প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সহিত মিল না রাখিয়া চলি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কখনই সমর্থ হইব না। কেননা, যেখানে দৈহিক প্রকৃতি বিভিন্ন, সেখানে কার্য্য ও উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হইবে। যদি কোন দৈহিক প্রকৃতি শুধু ইন্দ্রিয়-প্রতীতি অনুসারে চলিবার উপযোগী হয়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়-প্রতীতির ব্যবহার-সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন বিদ্যমান, সেখানে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন শক্তির যথাযথ প্রয়োগ না হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তুমি তবে বলিতে চাহ কি? ঈশ্বর অন্যান্য জীবজন্তুকে বিশেষ-বিশেষ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন,—কাহাকে ভূমি কর্ষণের জন্য, কাহাকে দুগ্ধ দিবার জন্য, কাহাকে বা ভার বহনের জন্য। ইন্দ্রিয়-প্রতীতি-সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করা—ভেদাভেদ নির্ণয় করায় তাহাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু মনুষ্য, ঈশ্বর ও তাঁহার রচনার দ্রষ্টারূপে—শুধু দ্রষ্টা নহে—ব্যাখ্যাতারূপে এই জগতে আসিয়াছে। অতএব মূঢ় ইতর জীবেরা যে সকল কাজ করে—শুধু তাহাতেই শেষ করা মানুষের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। ইতর জীবেরা যেখান হইতে আরম্ভ করে, মানুষও সেখান হইতে আরম্ভ করুক,—কিন্তু আমাদের প্রকৃতির যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে গিয়াই যেন মানুষ তাহার কার্য্য শেষ করে। আমাদের প্রকৃতির শেষ কোথায়?—না, ধ্যানে। ইন্দ্রিয়-প্রতীতির সহিত কিসে মিল হয়, আমাদের প্রকৃতি নিয়তই তাহার অনুশীলন করিতেছে। এই সকল, না দেখিয়া শুনিয়া তোমরা যেন ইহলোক হইতে অপসৃত না হও।

৪। কিন্তু তোমার বলিবার অভিপ্রায় কি? এই সকল ইতর জীবেরাও কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে? অবশ্যই ঈশ্বরের

সৃষ্টি। কিন্তু ঈশ্বরের পরা-সৃষ্টি নহে। উহাদের মধ্যে ঈশ্বরাংশ নাই। কিন্তু তুমি একটি পরম পদার্থ। তুমি ঈশ্বরের একটি অংশ। কোন্ উচ্চকুলে তোমার জন্ম, তাহা কি তুমি জান না? জাননা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? যখন তুমি অন্নভোজন কর তখন কি তোমার স্মরণ হয় না, কে অন্ন ভোজন করিতেছে?—ভোজন করিয়া কাহাকে তুমি পোষণ করিতেছ? কথায় বার্ত্তায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্ম্মে, তুমি যে একটি খণ্ড-ঈশ্বরকে পোষণ করিতেছ,—পরিচালিত করিতেছ, তাহা কি তুমি জান না? হতভাগ্য মনুষ্য! একটি খণ্ড-ঈশ্বরকে তোমার অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র লইয়া বেড়াইতেছ;—তুমি তাহা জান না! তুমি কি মনে করিতেছ, আমি কোন স্বর্ণময়, রজতময় ঈশ্বরের কথা বলিতেছি—যাহা তোমার বাহিরে অবস্থিত? না, তাহা নহে। তোমার অন্তরেই তুমি তাঁহাকে বহন করিতেছ। অতএব দেখিও যেন তোমার কোন অপবিত্র চিন্তা—কোন জঘন্য কার্য্য তাঁহার সিংহাসনকে কলুষিত না করে। তুমি এখন যাহা করিতেছ ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্ত্তির নিকটেও তুমি তাহা করিতে সাহসী হইতে না। কিন্তু তোমার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি সমস্তই দেখিতেছেন, সমস্তই শুনিতেছেন। তাঁহার সমক্ষে তুমি এই সকল চিন্তা বা এই সকল কার্য্য করিতে লজ্জিত হইতেছ না? হে আত্মপ্রকৃতি-অনভিজ্ঞ মনুষ্য সাবধান! ঈশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি যেন তোমায় দেখিতে না হয়।

৫। কেন তবে আমরা যুবকদিগকে বিদ্যালয় হইতে—জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইতে এত ভয় করি? যদি কোন অন্যায় কাজ করে, যদি বিলাসী ও লম্পট হয়, যদি চীর বস্ত্র পরিধানে অবনত হয়, যদি চারু পরিচ্ছদ ধারণে উদ্ধত হয়,—এইরূপ নানা আশঙ্কা হইয়া থাকে। যে এরূপ ভয় করে, সে আপনার ঈশ্বরকে জানে না; জানে না, কাহার সঙ্গে সে যাইতেছে। যদি কেহ আমাকে বলে—"গুরুদেব! তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকিতে, তাহা হইলে কোন ভয় হইত না।" এইরূপ কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। কেন হে বাপু! তোমার ঈশ্বর কি তোমার সঙ্গে নাই? অথবা, তাঁহাকে পাইয়াও অন্যের সঙ্গ কেন তুমি অন্বেষণ করিতেছ?

৬। প্রসিদ্ধ ভাস্কর "ফিডিয়াসের" নির্ম্মিত কোন দেবমূর্ত্তি যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে আপনার সম্বন্ধেও একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে, তোমার নির্ম্মাতা ভাস্করের সম্বন্ধেও একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে। আর, যদি তোমার চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে, তোমার নির্ম্মাতার অযোগ্য কোন কাজ করিতে না, কোন প্রকার অশোভন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতে না। কিন্তু তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ঈশ্বরের নিকটে তুমি কি ভাবে আইস সে বিষয়ে তুমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র কর না। অথচ, এই যে শিল্পী তিনি কি অপর শিল্পীর মত? ইঁহার রচনা কি অপর শিল্পীর রচনার মত? সে কি অপূর্ব্ব রচনা—যাহাতে রচয়িতার রচনা শক্তি সেই রচনার মধ্যেও বিদ্যমান! অপর ভাস্করেরা পাষাণ ও ধাতুর দ্বারা মূর্ত্তি গঠন করে। ফিডিয়াস "বিজয় লক্ষ্মী"র যে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন সে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট মূর্ত্তিদিগের গতিক্রিয়া আছে, শ্বাসোচ্ছ্বাস আছে—তাহারা ইন্দ্রিয়-প্রতীতির ব্যবহার ও বিচার করিতে সমর্থ। এরূপ শিল্পী—যাঁহার তুমি রচনা—তুমি কি

তাঁহার অবমাননা করিবে? শুধু যে তিনি তোমাকে রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, তোমার নিকটেই আপনাকে ন্যস্ত করিয়াছেন —সমর্পণ করিয়াছেন। এ-কথাটাও কি তুমি স্মরণ করিবে না? যাহার তুমি রক্ষণ-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাঁহাকে অবহেলা করিবে? মনে কর, ঈশ্বর যদি কোন অনাথকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তুমি কি তাহাকে অবহেলা করিতে? এখন তোমায় তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন; আর এই কথা বলিতেছেন:—"তোমা-অপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য লোক আমার আর কেহ নাই; এই মানুষটিকে প্রকৃতি যেরূপ ভাবে গড়িয়াছে, ইহাকে তুমি ঠিক্ সেই ভাবে রক্ষা করিবে;—ভক্তিমান, শ্রদ্ধাবান্, উন্নত, শান্ত, দান্ত, নির্ভয়। কিন্তু তুমি তাহা কিছুতেই করিবে না। কি আক্ষেপের বিষয়!

কঠোপনিষদ।

> যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহ-
> স্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
> এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
> বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

পূর্ব্বে যে সমস্ত মন্ত্র কথিত হইয়াছে তৎসমুদায় বিধিনিষেধার্থক মাত্র, তাহা আত্মতত্ত্ববিষয়ক যথার্থবিজ্ঞান নহে, অতএব সংসারবীজ স্বাভাবিক অজ্ঞানের নিবৃত্তির নিমিত্ত যাহাতে আত্মাতে কর্ত্তৃক্রিয়া ও ফলের কোন আরোপ নাই যাহার প্রয়োজন আত্যন্তিক পুরুষার্থ সেই আত্মৈকত্ব বিজ্ঞান কথিত হইতেছে। যম পুনরায় কহিলেন, তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মনুষ্য মৃত হইলে এই একটী সংশয় হয়, কেহ বলে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মা থাকে, কেহ বলে না এবম্বিধ কিছু থাকে না। আমরা কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোন উপায়ে ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। আপনি আমাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেন যাহাতে আমি ইহা জানিতে পারি। এই আমার তৃতীয় বর।

> দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
> নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
> অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ
> মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনং।

নচিকেতা কিন্তু নিঃশ্রেয়স সাধনের উপায় আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত কি না ইহা বুঝিবার জন্য যম কহিলেন, পূর্ব্বে এই বিষয়ে দেবতাদিগেরও সংশয় হইয়াছিল, ইহা প্রাকৃত লোক শুনিলেও বুঝিতে পারে না, যেহেতু এই আত্মতত্ত্ব অতিমাত্র সূক্ষ্ম। এক্ষণে তুমি অসন্দিগ্ধ-ফল অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। উত্তমর্ণ যেমন অধমর্ণকে পীড়ন করে সেইরূপ আমাকে এ বিষয়ে আর পীড়ন করিও না। এই বর পরিত্যাগ কর।

> দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
> ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ।
> বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
> নান্যোবরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।

নচিকেতা কহিলেন তোমার নিকট শুনিলাম দেবতাদিগেরও এবিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। আর যেহেতু তুমিও এই আত্মতত্ত্বকে সুবিজ্ঞেয় বলিতেছ না সুতরাং ইহা পণ্ডিতগণেরও দুর্জ্ঞেয়। আর এই ধর্ম্মের বক্তাও ত্বত্তুল্য অন্য কাহাকে অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই বর নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির হেতু সুতরাং অন্য বর অনিত্যফলজনক বলিয়া ইহার তুল্য হইবে না।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ
স্বয়ঞ্চ জীব শরদোযাবদিচ্ছসি।

মৃত্যু এইরূপ অভিহিত হইয়াও পুনরায় প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, কারণ অনিত্য পদার্থে যে বিরক্ত তাহারই আত্মজ্ঞানে অধিকার। মৃত্যু কহিলেন, তুমি শতবর্ষজীবি পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর, আর গবাদি বহু পশু হস্তী হিরণ্য ও অশ্ব এবং পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন অর্থাৎ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রার্থনা কর। এ সমস্তই নিরর্থক যদি মনুষ্য স্বল্পায়ু হইয়া থাকে এই বুঝিয়া মৃত্যু আরও কহিলেন, তুমিও যত বৎসর ইচ্ছা কর সমগ্র ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত শরীর ধারণ কর।

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।

আর এই যথোপদিষ্ট বরের অনুরূপ আরও যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে তাহাও প্রার্থনা কর। প্রভূত অর্থ, হিরণ্য, রত্ন, চিরজীবন প্রার্থনা কর। অধিক আর কি বলিব তুমি প্রকাণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হও। দিব্য ও মানুষের যে কিছু কামনার বস্তু আছে আমি তোমাকে তাহাও দিতেছি।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ।

যে যে কাম্যবস্তু মনুষ্যলোকে দুর্লভ সেই সমস্তই তুমি স্বেচ্ছানুসারে আমার নিকট প্রার্থনা কর। রথ ও নৃত্যগীতের সহিত এই সমস্ত দিব্য রমণী, ঈদৃশী রমণী মনুষ্যের অতি দুর্লভ, আমি ইহাদিগকে তোমায় দিতেছি তুমি মৎপ্রদত্ত এই সমস্ত পরিচারিকা দ্বারা আপনার পরিচারণা করাও। হে নচিকেতা, মরণসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অর্থাৎ মনুষ্য মরিলে থাকে কি না থাকে এই প্রশ্ন আর করিও না।

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতং অল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও মহাহ্রদের ন্যায় অক্ষুব্ধ থাকিয়া কহিলেন হে অন্তক, তুমি যে সকল ভোগ্যের প্রসঙ্গ করিলে এই সমস্ত এইরূপই অস্থায়ী যে কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ। আর এই অপ্সরা প্রভৃতি ভোগ্য মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়তেজ নষ্ট করিয়া দেয়, যখন ধর্ম্ম বীর্য্য প্রজ্ঞা ও যশ প্রভৃতির বিনাশক তখন ইহারা কেবলই অনর্থের মূল। আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিলে তদ্বিষয়েও বক্তব্য আছে শুন। আমাদের দীর্ঘজীবনের কথা কি, সমস্ত ব্রহ্মার আয়ুও অল্প। অতএব তোমার হস্তী, অশ্ব ও রথাদি তোমার নৃত্যগীত তোমারই থাক।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ চেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব।

ধনে মনুষ্যের তৃপ্তি নাই। লোকে ধন লাভ করিয়া সুতৃপ্ত হইল ইহা দৃষ্ট হয় না। যদিও আমাদের ধনতৃষ্ণা থাকে তাহা হইলে যখন তোমাকে দেখিয়াছি তখন তাহা পাইব। দীর্ঘ জীবনের কথাও এইরূপ। যতকাল তুমি স্বপদে প্রভু থাকিবে তত কাল জীবিত থাকিব। তোমার সহিত সঙ্গত হইয়া মনুষ্য কেন স্বল্পধন ও স্বল্পায়ু হইবে। কিন্তু যাহা আত্মজ্ঞান—সেই বরই আমার প্রার্থনীয়।

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত।

জরামরণশীল মনুষ্য অন্তরীক্ষাদি লোক অপেক্ষা অধস্তন পৃথিবীতে থাকিয়া জরামরণ-হীন অমর্ত্ত্যের সন্নিধানে আসিয়া আপনার যে উৎকৃষ্ট প্রয়োজনান্তর আছে তাহা জানিয়া রূপ যৌবন প্রমোদ সমস্তই অস্থির নিরূপণ করিয়া অতিদীর্ঘ জীবনে কে সুখী হইবে।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোয়ম্বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মাৎ নচিকেতো বৃণীতে।

অতএব অনিত্য কাম্য বস্তু দ্বারা প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমার যাহা প্রার্থিত —অর্থাৎ মানুষ মরিলে থাকে কি না, পরলোক বিষয়ে যাহা আত্মার নির্ণয়বিজ্ঞান তাহা আমাকে বল। এই যে গহন দুরবগাহ বর—প্রকৃত আত্মতত্ত্ব ইহা প্রাপ্ত হইয়া ইহা হইতে ভিন্ন অবিবেকীর প্রার্থনীয় অনিত্য বিষয়ক বর নচিকেতা মনেও কামনা করে না।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

মৃত্যু শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার জ্ঞানলাভের সামর্থ্য অবগত হইয়া কহিলেন, শ্রেয় অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স অন্য আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়তর অন্য। এই শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ে বিভিন্ন উদ্দেশে পুরুষকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা সকলেই স্বকর্ত্তব্য সাধনার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা বিদ্যা ও বিদ্যাস্বরূপ হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়ে একই পুরুষকে আশ্রয় করে না, দুইএর একতর পরিত্যক্ত না হইলে উভয়ের সহানুষ্ঠান ঘটিতে পারে না। অতএব অবিদ্যারূপ প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল শ্রেয়কেই অবলম্বন করেন তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যে অদূরদর্শী বিমূঢ় ব্যক্তি প্রেয়কে অবলম্বন করেন তিনি নিত্য পুরুষার্থ বা পারমার্থিক প্রয়োজন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমাৎ বৃণীতে।

বলিতে পার যদি উভয়ই পুরুষের আয়ত্তাধীন তবে কি জন্য লোকে অধিকন্তু প্রেয়কেই অবলম্বন করে তাহা কহিতেছি শুন। সত্য দুইই লোকের আয়ত্তাধীন কিন্তু যখন মন্দবুদ্ধি লোক কার্য্যত ও ফলত এই উভয়ের সম্যক্ বিচার না করে তখন ইহারা যেন ব্যামিশ্র বা একাকার হইয়া তাহাকে পায়। কিন্তু হংস যেমন জল হইতে ক্ষীর বাচিয়া লয় সেইরূপ যে ধীমান্ এই উভয়ের গুরু লাঘব মনে মনে সম্যক বিচার করিয়া ইহাদিগকে পৃথক করেন তিনিই প্রেয় হইতে শ্রেয়কেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর মূঢ়মতি লোক বিচারে অপটুতা হেতু যোগক্ষেম অর্থাৎ শরীরাদির উপচয় ও রক্ষণের জন্য প্রেয়কেই বরণ করেন।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।

কিন্তু তুমি পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও পুত্রাদি প্রিয় পদার্থ ও প্রিয়রূপ রমণী প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ চিন্তা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। অহো তোমার কি বুদ্ধিমত্তা। আর এই মূঢ়জনপ্রবৃত্ত ধনপ্রচুর কুৎসিত পথ

যাহাতে বহুতর-মূঢ় ব্যক্তি মগ্ন হইয়া থাকে তাহাও তুমি অবলম্বন করিলে না।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ।

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ের মহৎ অন্তর এবং ইহারা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ বিবেক ও অবিবেক স্বভাবতা হেতু আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর ভিন্নগতি ও ভিন্নফল। যাহা অবিদ্যা তাহার বিষয় প্রেয়, যাহা বিদ্যা তাহার বিষয় শ্রেয়, পণ্ডিতেরা ইহা বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু নচিকেতা, যখন মূঢ়বুদ্ধি-প্রলোভন রমণী প্রভৃতি বহুতর কাম্য বিষয়ও তোমাকে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাইবার জন্য শ্রেয়ঃপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না তখন আমি তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়াই বিবেচনা করি।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

নিবিড় অন্ধকারসদৃশ অবিদ্যার মধ্যে যাহারা বর্ত্তমান, যাহারা ধীর প্রজ্ঞাবান ও পণ্ডিতম্মন্য অর্থাৎ যাহারা আপনাকে প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রকুশল বলিয়া বুঝে সেই সকল অবিবেকী পুরুষেরা বিষম পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান বহুতর অন্ধের ন্যায় অত্যন্ত কুটিল বিবিধগতি প্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখ দ্বারা মহান্ অনর্থ লাভ করিয়া থাকে।

ন সাম্পরায়ং প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে।

অতএব মূঢ়তা প্রযুক্ত পরলোক—তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজন শাস্ত্রীয় সাধনবিশেষ সেই বালক অবিবেকী পুরুষে প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয় না। তাহারা প্রমাদী ও বিত্তমোহ অর্থাৎ বিত্তনির্ম্মিত্ত অবিবেক দ্বারা মূঢ় বা তমসাচ্ছন্ন। আর তাহারা ইহলোকই অর্থাৎ দৃশ্যমানস্ত্রীঅন্নপানাদিবিশিষ্ট লোকই লোক, পরলোক—অদৃষ্টলোক নাই এইরূপ ভাবিয়া থাকে। ইহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমারই বশে আইসে অর্থাৎ জন্মমরণাদিরূপ দুঃখপ্রপঞ্চ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

লোক সকল প্রায়ই এইরূপ। কিন্তু শ্রেয়ঃপ্রার্থী সহস্রের মধ্যে কেহও তোমার ন্যায় আত্মবিৎ হইয়া থাকেন। যেহেতু অনেক ব্যক্তি যে আত্মাকে শুনিতে পায় না, অনেক দুর্ভাগ্য অসংস্কৃতাত্মা শুনিলেও যে আত্মাকে জানিতে পারে না সেই আত্মার বক্তা আচার্য্য আশ্চর্য্য অর্থাৎ অনেকের মধ্যে কেহও অদ্ভুতবৎ হইয়া থাকেন, আর শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কুশলী নিপুণ কেহও এই আত্মার লব্ধা হন যেহেতু যিনি নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছেন এমন জ্ঞাতাও দুর্লভ।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।

যে আত্মার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছ কোন প্রাকৃতবুদ্ধি হীন মনুষ্য কর্ত্তৃক উক্ত হইলে তিনি সুবিজ্ঞেয় হন না। যেহেতু বাদিগণ আছে, নাই, কর্ত্তা, অকর্ত্তা, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি বহুপ্রকারে তৎ সম্বন্ধে বিবাদ করিয়া থাকেন। এখন কিরূপে তিনি সুবিজ্ঞেয় হন তাহা কহিতেছি শুন। যদি

অপৃথক্‌দর্শী অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মা হইতে ভিন্ন দেখেন না এইরূপ আচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত হইলে আত্মাতে পূর্ব্বোক্ত বহুধা চিন্তা অর্থাৎ আছে, নাই ইত্যাদি অনেক প্রকার চিন্তা আর থাকে না। আচার্য্য কর্ত্তৃক অভেদে আত্মসম্বন্ধে উপদিষ্ট হইলেই আত্মা সুজ্ঞেয় হন, অন্যথা তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এই অণুপ্রমাণ বলিয়া তিনি অতর্ক্য। অণুপরিমাণ আত্মাকে কেহ বুদ্ধির যুক্তি তর্কে একপ্রকার স্থাপন করিলেন আবার আর একজন ঐ বুদ্ধিবলে আত্মাকে আরও অণুতর তৎপরে অন্য ব্যক্তি আরও অণুতর করিয়া স্থাপন করিতে পারেন। কারণ তর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি একস্থানে থাকে না।

পুণ্যাহ।

গত ২৬এ ভাদ্র তারিখে পুণ্যশ্লোক পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের কটক-জেলার অন্তর্গত তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তথাকার কাছারী-বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। উপাসনার পর যে প্রার্থনা পঠিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে মঙ্গলস্বরূপ মহান্‌পুরুষ এই জগৎ-সংসার সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার নিয়মে থাকিয়া যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এই জগৎ-সংসার সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি পিতা হইয়া অনুক্ষণ পুত্রদিগের সৎকামনা পূর্ণ করিতেছেন, যিনি মাসে মাসে দিনে দিনে নিমিষে নিমিষে অজস্র করুণাবারি বর্ষণ দ্বারা আমাদের সন্তপ্ত আত্মাকে সুস্নিগ্ধ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদাই আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকিয়া মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যিনি আমাদের প্রতিজনের আত্মাতে আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি অনুক্ষণ আমাদের চক্ষুর উপর স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছে, যিনি আমাদের প্রতি-জনের আত্মাতে সাধু ইচ্ছা প্রেরণ করিতে-ছেন—আমাদের অসৎ অভিসন্ধি সকলকে দমন করিতেছেন, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া পুণ্যের সমান পুরস্কার দিতেছেন ও পাপের সমান দণ্ডবিধান করিতেছেন, যিনি পুণ্যবানগণকে আত্ম-প্রসাদ দিয়া ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, যিনি পাপীগণকে আত্মগ্লানির উপর আত্মগ্লানি দিয়া পাপ হইতে মুক্ত করাইয়া অবশেষে স্বীয় অমৃত ক্রোড়ে গ্রহণ করিতেছেন, যিনি সংসার-তাপ হইতে আমাদিগকে সতত শীতল করিতেছেন, আমাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন, আনন্দপ্রবাহ আমাদের আ-ত্মাতে চিরকাল ঢালিয়া দিতেছেন, যিনি সম্পদে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, বিপদের দ্বারা আমাদিগকে বলিষ্ঠ করি-তেছেন, যিনি পিতা হইয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছেন—মাতা হইয়া স্নেহ করিতে-ছেন, গুরু হইয়া জ্ঞান দিতেছেন, সেই অন্নদাতা পিতা—জ্ঞানদাতা গুরু—স্নেহদাতা মাতাকে এই নববর্ষের প্রথম দিনে পূজা করিবার জন্য আজ আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছি, তাঁহার চরণে আমাদের হৃদয়ের প্রথম প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিব বলিয়া আজ আমরা সকলে উৎ-সুক হইয়া আছি। আজ আমাদের দুঃখে দাহ নাই, শোকে আর্ত্তনাদ নাই, রোগে যন্ত্রণা নাই, বিপদে ভয় নাই, আজ আমরা সকলে নির্ভয় হইয়া এই শুভ দিনে ও শুভ-ক্ষণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতার

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। হে প্রভো! এই শুভ-পুণ্যাহ উৎসবে তুমি রাজা প্রজা ও রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই মস্তকে তোমার অজস্র করুণাবারি বর্ষণ কর। তুমি সকলকে বিপদ হইতে, মারীভয় হইতে, পাপ-তাপ হইতে, অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর। এ প্রদেশের চিরদরিদ্র প্রজাগণের কল্যাণ কর, আর আমাদের সকলের দুর্দ্দশা দূর কর।

হে পরমাত্মন্! আমাদের অবস্থা দিন দিন কেন এত হীন হইয়া যাইতেছে, আমাদের প্রফুল্ল মুখ দিন দিন কেন যে এত মলিন হইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা জানি না, বুঝিতে পারিতেছি না; বোধ হয় আমাদের আন্তরিক ধর্ম্মভাবের অভাবেই ঐরূপ হইয়া থাকিবেক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, পুত্র পিতা মাতাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা করিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করত যেরূপ সম্মান করিতেন, স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করত যেরূপ তাঁহার হিতকার্য্যে নিযুক্তা এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া থাকিতেন, প্রতিবাসীগণের মধ্যে তৎকালে পরস্পর যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন পিতা পুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে, মাতা ও কন্যায়, ভ্রাতাগণের মধ্যে ও প্রতিবেশীগণের মধ্যে সেরূপ মনের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন অধিকাংশ লোকের মনে সেরূপ ধর্ম্মভাব নাই, অনেকে স্বেচ্ছাচারী ও ঘোর পাপী হইয়া পড়িয়াছেন। দেশ পাপে পূর্ণ হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতা মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মারীভয় প্রভৃতি বিপদের ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার ন্যায়-বিহিত-শাস্তি আমাদের ঔষধ স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার মঙ্গলরাজ্যে অমঙ্গল কখনই চিরস্থায়ী হয় না। যখনই আমরা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে চাতকের ন্যায় তাঁহার অমৃতবারি ভিক্ষা করি, তখনই তিনি আমাদের বিকৃত বুদ্ধিকে প্রকৃতিস্থ করেন, আমাদের নিস্তেজ শরীরকে সতেজ করিয়া তুলেন, আমাদের অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য কতই না যত্ন করেন, তখন তিনি আমাদিগের পাপ সকল মার্জ্জনা করত আমাদের আত্মাকে উন্নত করিয়া তাঁহার সেই পবিত্র মঙ্গলরাজ্যে গ্রহণ করেন। এক্ষণকার এই যে অনাবৃষ্টি, এই যে অজন্মা, এই যে প্রদেশব্যাপী ওলাউঠারূপী মারী ভয় ইহা আমাদের অধর্ম্মের ফলে হইতেছে বলিয়াই অনুমিত হয়। হে পতিতপাবন! আমরা তোমার শরণাগত হইলাম, আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা জানি, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে কেহই নিরাশ হয় না। হে প্রভো! আমরা অতি দুর্ব্বল; আমরা তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদের সহায় হও, তুমি আমাদের মনোমালিন্য ধৌত করিয়া তোমার পবিত্র চরণ ছায়ায় আমাদিগকে স্থান দাও।

এই বিশাল সম্পত্তির যিনি অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহার কাছারীতে উপবেশন করিয়া আজ আমরা ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি, হায়! সেই মহর্ষিদেব ইহ জগতে আর নাই, তিনি সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া গত ৬ই মাঘ তারিখে দিব্য ধামে—অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই,

মৃত্যু নাই, তথায় বিষয়ের কোলাহল নাই, তিনি স্বীয় পুণ্যবলে সেই আনন্দ ধামে গমন করত দেবতাগণের সহিত একাসনে উপবেশন করত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের হিতার্থে সময়ে সময়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। মহর্ষিদেব বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মধ্যে মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর তিনি যদি আবির্ভূত না হইতেন তাহা হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এতাধিক উন্নতি কখনই হইত না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিস্তর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ক রয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তিনি পৈত্রিক অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও সত্যের সন্ধানে যুবা বয়সে বন, উপবন, পর্ব্বত, প্রান্তর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করত সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিনেন। তিনি যৌবনে যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যু সময়ে তিনি বহু ঋণ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিলনা—তিনি ইচ্ছা করিলে সেই ঋণদায় হইতে কৌশলে অব্যাহতি লাভ করত রাজার ন্যায় প্রচুর ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি থাকায়, তিনি সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করেন নাই, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া জগতে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় আশ্রিতপ্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বহু অনাথ পরিবার বহুকাল ধরিয়া উপযুক্ত মাসিক সাহায্য পাইয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ অনেক দরিদ্র কর্ম্মচারী তাঁহাদের কন্যার বিবাহ ও পিতামাতার পারলৌকিক কার্য্যে তাঁহার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন। যে সমস্ত কর্ম্মচারীগণ বৃদ্ধ হইয়া কার্য্য হইতে অবসর লইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে মাসিক বৃত্তি (পেনসন) প্রদান করিতেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেশের নানা হিতকর্ম্মে বিনা আড়ম্বরে অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি যখন যে বিষয়ে অর্থদান করিয়াছেন, তাহা গোপন ভাবেই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও প্রজাগণকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কোন কর্ম্মচারীর কোন প্রকার দুঃখ ও কষ্টের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাদের দুঃখ বিমোচন করিয়া দিতেন। তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র মনের মধ্যে ভক্তিভাবের উদয় হইত। যাঁহারা তাঁহার দর্শন জন্য যাইতেন তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিতেন। অহো! তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গভূমি একটী দুর্ল্লভ রত্ন হারাইয়াছেন। তাঁহার অভাবে বিস্তর অনাথ পরিবার রোদন করিতেছে, তাঁহাকে হারাইয়া কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ সকলেই হাহাকার করিতেছে। বস্তুত এরূপ ধার্ম্মিক, দয়ালু, বিনয়ী, উৎসাহশীল, ধীর স্থির অথচ গম্ভীর রাজা আমরা আর পাইব না। তিনি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণকে রাখিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে যখন স্বর্গ রাজ্যে গমন করিয়াছেন, তখন

আমরা আর শোক করিব না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় পুণ্যাত্মা ও সাধু পুরুষের দর্শন আর আমাদের ভাগ্যে যে ঘটিবেনা, এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত সুললিত উপদেশ বাক্য আর আমরা যে শুনিতে পাইবনা, ইহার জন্যই আমাদের দুঃখ হইতেছে। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে,—মহর্ষিদেব যেমন তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও প্রজাগণকে দয়া, ক্ষমা, ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যাহাতে সেইরূপ দয়া, ক্ষমা, ও স্নেহের চক্ষে কর্ম্মচারী ও প্রজাগণকে দেখেন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

হে প্রভো! তুমি আমাদের রাজ পরিবার বর্গের দীর্ঘায়ু প্রদান কর, তাঁহাদের মঙ্গল কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণকে আশীর্ব্বাদ কর। প্রজাগণের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ কর। তোমার নিকট আমাদের এই ভিক্ষা।

ওঁ একোমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৭৬॥৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৭৫৪ ৶৩
সমষ্টি	...	২০৩০৮/৯
ব্যয়	...	২৩৪॥৵৩
স্থিত	...	১৭৯৬৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
২৯৬৶৬

১৭৯৬৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১০৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়
১০৲

২১০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪।৵০
পুস্তকালয়	...	৯৮ ৬
গচ্ছিত	...	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		১০৲
সমষ্টি	...	২৭৬॥৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৪৮৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪।৶৯
পুস্তকালয়	...	১৮৵০
যন্ত্রালয়	...	১৭৮৯
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৫॥৯
সমষ্টি	...	২৩৪॥৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৮২৭ শকের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় কলিকাতা ১০৲
„ „ হেমেন্দ্র নাথ মজুমদার „ ৩৲
মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর কাশীমবাজার ১২৷৵০
রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব
বাহাদুর দিনাজপুর ৩৷৵০
শ্রীযুক্ত ইউ, এল্, বসু এস্কোয়ার কলিকাতা ৩৷৵০
„ বাবু সুশীল কুমার ঘোষ রেঙ্গুন ৩৷৵০
„ „ প্রসন্ন কুমার রায় চৌধুরী বালিগঞ্জ ৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ২৲
„ „ দিগম্বর দত্ত শ্যামপাহ ৫৲
„ „ শ্যাম লাল সরকার „ ৩৲
„ „ বেহারী লাল মল্লিক „ ৩৲
„ „ কেদার নাথ রায় „ ৩৲
„ বি, চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার „ ৩৲
„ বাবু গোরা শঙ্কর রায় কটক ৩৷৵০
„ „ অঘোর নাথ শেঠ কলিকাতা ৩৲
„ „ লাল বেহারী বসাক „ ৩৲
„ „ গোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায় „ ৩৲
„ „ পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ „ ৩৲
শ্রীমতী প্রাভা সুন্দরী দেবী বালিগঞ্জ ৩৲
শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর কলিকাতা ৩৲
„ বাবু রাম চন্দ্র সিং „ ৩৲
„ „ রাম চন্দ্র মিত্র „ ৩৲
„ „ সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর „ ৬৷০
„ „ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর „ ৩৲
ডাক্তার ডি, এন্, চাটার্জ্জি „ ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায় বাহাদুর „ ৩৲
„ মৌলভি বিলাইত হোসেন „ ৩৲
„ বাবু অক্ষয় কুমার ঠাকুর „ ৩৲
„ „ এল্, এন্ বেজবড়ুয়া হাওড়া ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ রায় কলিকাতা ৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র বড়াল পাহাড়পুর ৫৲
„ „ বনমালী চন্দ্র কলিকাতা ৩
„ মহাশয় কৈলাশচন্দ্র রায় দেহড়দা ১০৷৵০
„ সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ ঢাকা ১৷৷০
„ বাবু হরিমোহন রায় „ ৬৷০
৺ গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র কলিকাতা ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালিপ্রসন্ন ঘোষ „ ৩৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর „ ৩৲
„ „ হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর „ ৩৲
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায় „ ৩৲
„ „ গণেশপ্রসাদ লাহা দ্বারভাঙ্গা ৩৷৵০
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত পাণ্ডুয়া ৩৷৵০
„ „ গোবিন্দলাল দাস কলিকাতা ৩৲
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর „ ৩৲
„ রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর কাকিনা ১৩৷৷০
„ বাবু সতীশচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ৩৲
„ „ প্রসাদদাস মল্লিক „ ৩৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুঁটিয়া ৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সিংহ চুঁচুড়া ১৩৷৷০
„ „ নৃত্যগোপাল বসু বাঙ্গালোর ৬৷০
„ „ কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যশোর ১০৲
„ „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় হালিসহর ৩৷৵০
„ „ কানাইলাল শেঠ কলিকাতা ৩৲
„ „ পঞ্চানন মিশ্র মেদিনীপুর ২৷৵০

বিজ্ঞাপন।

ষষ্ঠসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৫১ সংখ্যা | ১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২. কলিগতাব্দ ৫০০৬। ১ মাঘ সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল।৵০ আনা।
} আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।
৭৪১ সংখ্যা
১৮২৭ শক

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শান্তিনিকেতনে পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১৮২৭ শক, ৭ই পৌষ প্রাতঃকাল।

এবার শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। অমন রমণীয় প্রভাত ও সূর্য্যোদয় চক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করিয়া বুঝানো বড় কঠিন ব্যাপার। এবার শান্তিনিকেতনে উৎকৃষ্ট নূতন গৃহ ও উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। নানা জাতীয় ফুল ফলের বৃক্ষ। পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ সকলেরই মনোহরণ করে। ফলত স্তম্ভে খোদিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদমন্ত্র ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজেই উপাসকগণকে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবণ করিয়া তুলে। প্রভাতে সকলেই সুশীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন পরে উপাসনার জন্য যথাসময়ে সকলেই প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উপাসনান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী যে উপদেশ পাঠ করেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন কালকে সত্যযুগের জ্ঞানধর্ম্মের পুনরাবর্ত্তন কাল না বলিলে আর চলিতেছে না। শীত কালে উত্তরদিকস্থ বায়ু প্রবাহিত হইয়া মানবের শরীর শুষ্ক, বৃক্ষ লতা নীরস করিয়া তুলে। কিন্তু আবার যখন দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন বৃক্ষলতা নবীন পত্রে সুশোভিত হয়, শাখা সকল নূতন মঞ্জরী প্রসব করিয়া গন্ধে ও সৌন্দর্য্যে চারিদিক আমোদিত করে—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। কারণ জগতের একই নিয়ন্তা পরমেশ্বর একই ইচ্ছা, একই প্রেম ও একই নিয়মে জগতের অন্তর্বাহ্য নিয়মিত করিতেছেন, প্রাকৃতিক রাজ্যের জড়নিয়ম ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বাধীনতার নিয়ম উভয়ই তাঁহার একই মঙ্গল ভাবের অধীন—পরিবর্ত্তন এবং উত্থানপতন তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যেরই নিদান। তিনি অনন্তকাল হইতে শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু সেই শান্তং শিবের মধ্যে অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা জাগ্রত থাকিয়া সকল পরিবর্ত্তন সকল উত্থান পতনের মধ্যে একই অভিপ্রায়

রক্ষা করিতেছে। আত্মার ক্রমোন্নতি যেমন তাঁহার ইচ্ছা, মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি যেমন তাঁহার ইচ্ছা, পতনের পর উত্থানও তেমনই তাঁহার ইচ্ছা।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম কালে তিনি অরণ্য পর্ব্বতে, নদী, নির্ঝরে যে সৌন্দর্য্য দিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহার মহিমায় মগ্ন হয় কে? সে মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্তুতি বন্দনা করে কে? তিনি বিজ্ঞান চক্ষু-বিশিষ্ট মানব সৃষ্টি করিলেন। তখন পর্ব্বত কন্দর ধ্বনিত হইল, অরণ্য এবং নদী পুলিন ধ্বনিত হইয়া বেদগানে সকল দিক পরিপূরিত হইল। সূর্য্য চন্দ্রে তাঁহার লক্ষ্য, অগ্নি পবনে তাঁহার লক্ষ্য, মেঘ বিদ্যুতে তাঁহার লক্ষ্য, উষা সোমে তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়া গেল। তখন সেই প্রথম কালের মনুষ্যেরা মোহিত হইয়া বন্দনা করিলেন—

> "ভাস্বতী নেত্রী সুনৃতানাং দিবস্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ। প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যাসুষো গো অগ্রাঁ উপমাসি বাজান্"।

তেজস্বিনী সূনৃত বাক্য প্রণেত্রী দ্যুলোকোৎপন্না উষা আমাদিগের কর্ত্তৃক সংস্তুত হইতেছেন। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্র, পৌত্র, দাস, অশ্ব ও গোযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

এই সময়ে তাঁহারা মহিমা হইতে মহিমান্বিত পুরুষের আরাধনা করিতে পারেন নাই। প্রকৃতিতেই পুরুষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি চাই। সে কেবল প্রকৃতিতেই নিমগ্ন থাকিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। প্রশ্ন উঠিল,

> "কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভনং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।"

সর্ব্বদর্শি বিশ্বকর্ম্মা কোথায় অধিষ্ঠিত হইয়া কি উপাদনে ও কি উপকরণে ভূলোক ও দ্যুলোক সৃষ্টি করত মহিমা দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন?

> যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যাঃ॥

যিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের জনয়িতা, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমুদায় স্থান ও ভুবন জানিতেছেন, যিনি দেবগণের পিতা, যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন সমস্ত জগৎ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

> পরোদিবো পরএনা পৃথিব্যা পরোদেবৈ রসুরৈর্যদাস্ত।

সেই বিদ্যমান বিশ্বকর্ম্মা দ্যুলোক হইতে ভিন্ন, এই পৃথিবী হইতে ভিন্ন, দেবগণ হইতে ভিন্ন ও অসুরগণ হইতে ভিন্ন।

এই কালই বৈদিক বসন্ত কালের আরম্ভ কাল। এখন হইতেই ধর্ম্মের দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া পুণ্য প্রেম রূপে, জ্ঞান ধর্ম্ম রূপে বিকশিত হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত ও ধ্যান যোগে অধ্যাত্মযোগে ব্রহ্মের উপাসনা প্রবৃত্ত হইয়া অরণ্যে অরণ্যে, প্রান্তরে প্রান্তরে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। আনন্দ, নিষ্কামতা, শান্তি ও সুখ হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিয়াছিল। বাহিরে বিকশিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য, অন্তরে পরমাত্ম-সত্যের অমৃত আস্বাদ। এই সময়েই হৃদয় ফুটিয়া এই মন্ত্র বহির্গত হইয়াছিল—"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রবাহে যুগান্তরে এই ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। আবার প্রতিস্রোতে অনৃত অজ্ঞানের প্রবাহ দেখা দিল। তখন অপ্রতিম পুরুষের প্রতিমা গঠিত হইয়া গৃহে গৃহে পূজিত হইতে

লাগিল। জ্ঞানের স্বাধীন প্রতিভা আবৃত করিয়া অন্ধসংস্কার অজ্ঞান-তিমির হৃদয়াকাশে দেখা দিল—জ্ঞানসূর্য্য আচ্ছন্ন হইল। মানুষের ধর্ম্মজ্যোতি কর্ম্ম-কৌশলে পরিণত হইয়া হিন্দুসমাজকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া পরপদ লেহনে নিযুক্ত করিল। দুঃখের শেষ নাই, অবসাদের অন্ত নাই। এই দুঃখ অজ্ঞানের অন্তর্দাহসময়ে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তিনি হিন্দুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রের দণ্ড ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে দ্বিতীয় মহাপুরুষের আবির্ভাব। তিনি তপঃপ্রবাহে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ। তিনি এই দণ্ড ধরিয়া চক্র ঘুরাইয়া দিলেন। অমনি উপনিষদের হৈমবতী পরাবিদ্যা আবির্ভূতা হইলেন। আবার বায়ু মধু বহন করিতে লাগিল, নদী সকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল—হিন্দুসমাজের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই দ্বিতীয় পুরুষ কে? ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যখন হিমালয়ে হিমালয়ে তিনি ধ্যাননিরত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, যখন গৃহে বা অরণ্যে বা গিরিস্থ তরুমূলে তাঁহার পাদমূলে বসিয়া উপনিষদের গভীর তত্ত্বের অর্থ শিক্ষা করিয়াছি তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। সে সৌম্যমূর্ত্তি চন্দ্রমার বিশদ জ্যোৎস্নাকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহার জ্ঞানদীপ্তি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহার সংযম পৃথিবীর সহিষ্ণুতাকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইত। আর অদ্য আমরা কোথায় আসিয়াছি? শান্তিনিকেতনে। এ শান্তিনিকেতন কাহার? ইহার বিমল শুক্লরশ্মি কাহার তপোনিঃসৃত রশ্মি? সেই মহর্ষিরই তপোনিঃসৃত রশ্মিতেই ইহা ধবলীকৃত হইয়াছে, ইহাতে এত শান্তি বিরাজ করিতেছে। অহো, কি নিভৃত স্থান! কি শান্তভাবে পরিপূর্ণ। এখন আমাদের মনোমধ্যে কি শান্তিরসের আবির্ভাব হইতেছে। এই অনতিপ্রাচীন তপোবনে প্রবেশ করিয়া আমাদের স্বর স্বভাবত মৃদু হইয়া আসিল। যদিও আজ প্রায় বৎসরকাল হইল তিনি এই মর্ত্ত্যলীলা সম্পন্ন করিয়া অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সেই তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহর্ষির আত্মা এখনও এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে উপনিষৎপরিকীর্ত্তিত যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, আজ আমরা শত শত মনুষ্য সেই নিরতিশয় মহান্‌পুরুষের উপাসনা করিতেছি; যখন আমরা বিবেচনা করি যে উপনিষদ-শ্লোক সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেন সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেছি, তখন আমাদের মনে কি বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। যখন আমরা মনে করি যে, যে সকল মহোচ্চ সত্যভাবপ্রতিপাদক শব্দ আমাদের প্রাচীন ঋষিরা মুখ হইতে উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপোবনে বসিয়া তাঁহারই উপদেশে সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি তখন আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরে পরাভক্তি ও তাঁহার মহিমায় মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। হে ব্রাহ্মগণ ইহা আমাদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রহ্মোপাসনায় যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারতরাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এরূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর 'বিভু' সর্ব্বগত 'সুসূক্ষ্ম' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে ঈশ্বর "অমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রং" তিনি মনরহিত, তেজরহিত, প্রাণরহিত, উপমারহিত। এরূপ মহোচ্চ ভাবে ঋষি ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মবক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাব-পূর্ণ বাক্য যিনি উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যিনি এই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তিনি কি সুমহান্ পুরুষ ছিলেন! সেই শান্ত গভীর প্রকৃতি মহাপুরুষের গভীর ভাব এই উদ্যানের আকাশে কেমন প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি কর—তাঁহার গুণ সকল উপলব্ধি করিয়া তাহা জীবনের আদর্শ কর। তাঁহার চারিটি গুণ অনুকরণ করিবার বিশেষ যোগ্য। প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মগতপ্রাণ ও ব্রহ্মগতচিত্ত ছিলেন; তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন; তিনি ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তিনি ঈশ্বর স্মরণকে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগেরও এইরূপ যোগ-সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে। তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে জীবাত্মা এখনি অস্তিত্বশূন্য হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু এইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া আমাদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমাদের মনে যেন সর্ব্বদা এই সত্য জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষা-ক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর স্মরণ আমাদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই করা কর্ত্তব্য। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃক্রিয়াবানেষঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়ান্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যাঁহার জীবন আমাদের আদর্শ সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় আমাদিগের শান্ত প্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমাদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হই, তবে আমরা কিরূপে ঈশ্বরের অধীন হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃপুন বলিয়া গিয়াছেন যে,শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহর্ষি ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন কিন্তু শান্ত রূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অসামান্য

প্রীতি ছিল। তিনি ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু ঈশ্বরকে শান্তরূপে উপাসনা করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্তমুপাসীত।" ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে, এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ক হয়, ততই তাহা উষ্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। বন্ধুজনের সঙ্গে প্রথম প্রণয় কালে প্রীতি কি উষ্ণভাব ধারণ করে! কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। অভিনব প্রীতি একরূপ, পরিপক প্রীতি অন্য রূপ। ঈশ্বর শান্ত স্বরূপ, যদি আমাদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগত করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্ত স্বরূপ ঈশ্বরকে শান্তভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্তভাবে সর্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন যে, "নিস্তরঙ্গোতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবঃ। মাধুর্য্যৈকরসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ।" ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্দ স্বরূপ, সুধা সমুদ্র মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্ব্বব্যাপী। যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়াছিল,তিনি কিরূপ ঈশ্বরপ্রেমী না ছিলেন। ঈশ্বর সুধা-সমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার, যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য কি রূপ না আস্বাদন করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়া ছিলেন তাঁহার নাম বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ পুরাকালের অরণ্যচারী ঋষি ছিলেন, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যুগের পুনরাবর্ত্তন কালের ঋষি ছিলেন। আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে যে, সেই বশিষ্ঠের আত্মা কতবার এই শান্তিনিকেতনের তপোবনে আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আত্মার সহিত গুপ্ত ভাবে, শান্ত ভাবে ব্রহ্ম প্রসঙ্গ করত ব্রহ্মাবন্দ পান করিয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদের সৎ গুরু ছিলেন আর মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ আমাদের কেবল সৎগুরু ছিলেন না তিনি আমাদের শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু ছিলেন। এই উভয়ের কথোপকথনে, ব্রহ্মপ্রসঙ্গে তাঁহাদের যে প্রকার ভাব হইত তাহা যেন স্পষ্ট এইরূপ দেখিতেছি।

> "সৎগুরু সুধা সমুদ্র হ্যায়, সুধময়ী হ্যায় নৈন।
> নখশিখ সুধাস্বরূপ হ্যায়, সুধাসুবর্ষে বৈন"॥

আজ আমরা অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই তাঁহাদেরই চরণতলে বসিয়া ব্রহ্ম প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যশঃস্পৃহা-শূন্য ছিলেন। তাঁহার সেই যশঃস্পৃহা-শূন্যতা আমাদিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে কতই ক্ষুণ্ণ না হই কিন্তু তিনি এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না। তিনি কত কত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, হৃদয়োন্মাদকারী বক্তৃতায় কত কত বিদ্বান্ ধার্ম্মিক পুরুষের হৃদয়ে অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়াছেন, কত ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা এবং নিকটস্থ শিষ্য মণ্ডলীকে মৌখিক উপদেশ ও বেদ উপনিষদ শিক্ষা দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান তিমির দূর করিয়া দিয়া-

ছেন কিন্তু কোথাও তাঁহার নাম গন্ধ যোজনা করেন নাই। এক মাত্র জগতের মঙ্গলই তাঁহার হৃদয়ের কামনা ছিল। তাঁহার সমকালীন বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি দিগ্‌গজ পণ্ডিত মণ্ডলীর এমন কোন ব্যক্তিই ছিলেন না যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের অনুগত সহচর বা ভক্তি শ্রদ্ধাকারী বিনীত পারিষদ না ছিলেন। নক্ষত্র মণ্ডলী মধ্যে বিশদ চন্দ্রমাবৎ তিনি তাঁহাদের মধ্যে শোভিত থাকিয়া সূর্য্যপার্শ্ববর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্যোতিতে আপনাকে সর্ব্বদা লুকায়িত রাখিতেন। প্রাচীন ঋষিরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া এবং ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে গিয়া লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু করুণাময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্যও সাধন করিতে হইবে। এই দুইএর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমাদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে। এই বাক্য বৈদিক আরণ্যক ঋষি-বাক্য হইতেও উচ্চ, ইহা বর্ত্তমান কালের যুগধর্ম্মের বিশেষ উপদেশ, ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পবিত্র হৃদয় নিঃসৃত মহাবাক্য যাঁহার আত্মা এখনও এই মহোৎসবের আনন্দের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন।

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তি সমুদ্র! হে নিবিড়-আনন্দ স্বরূপ! হে সুধাপারাবার পরমেশ্বর! তুমি যে অমৃত ভাণ্ড তোমার দেবেন্দ্র নাথের দ্বারা আমাদিগকে পরিবেশন করাইয়াছ, তাহা যাহাতে আমরা হৃদয়ে পোষণ করিয়া চিরকাল সঞ্জীবিত থাকিতে পারি আমাদের মনে এরূপ শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে রেখা মাত্র বিচলিত নাহই যাহা অবলম্বন করিয়া চলিলে অচিরকাল মধ্যে আমরা তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীতাদি হইলে উপাসক দল সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সপ্তপর্ণ বেদিমূলে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে মেলা বশিয়া গিয়াছে। নানা রূপ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। এবারে মেলাস্থলে সুপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠের যাত্রা হইয়াছিল। এই যাত্রা শুনিয়া অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। লোকসমাগম প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। সন্ধ্যার উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সঙ্গীতাদি হইলে পূর্ব্ববৎ নানারূপ বিস্ময়কর বাজী হইয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে যাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের আহারাদির অতি সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। কাহারই কোন বিষয়ে কোনই ক্লেশ হয় নাই। ফলত প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষিদেব জীবিত থাকিতে এই মেলা যেরূপ সুশৃঙ্খলায় আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে তাঁহার তিরোভাবে বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্ন চেষ্টায় তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

সত্য।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

ঈশ্বর মূলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব।

এই মতবাদটি—যাহা আমাদিগকে পূর্ণ সত্য হইতে পূর্ণ সত্তায় লইয়া যায়—ইহা

দর্শনের ইতিহাসে নূতন নহে। প্লেটো হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

স্বীয় গুরু সক্রেটিসের ন্যায় প্লেটোও, জ্ঞানের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে,—জ্ঞানের যদি এরূপ কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, যাহা ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথাযথ জ্ঞান উপলব্ধ হইতে পারে না—তাহা হইলে এমন-একটা কিছু বুঝায় যাহা সার্ব্বভৌম ও এক, যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এবং যাহা প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই যে এমন-কিছু যাহা সার্ব্বভৌম ও একাত্মক, প্লেটো তাহাকেই (idea) * আইডিয়া-নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

এই সার্ব্বভৌমত্ব ও একত্ব-লক্ষণাক্রান্ত আইডিয়া-সমূহ,—পরিবর্ত্তনশাল ও চির-চঞ্চল ভৌতিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহে, পরন্তু ভৌতিক পদার্থসমূহে উহাদের প্রয়োগ হয় এবং এই প্রকারে ঐ সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আমাদের বুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, মানব-চিত্তও এই আইডিয়া-গুলির দ্বারা গঠিত নহে; কেননা, মনুষ্য সত্যের পরিমাপক নহে।

প্লেটো এই আইডিয়া-গুলিকে বাস্তবিক সত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কেননা উহারাই কেবল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহের নিকট ও মানব-জ্ঞানের নিকট, স্বকীয় বাস্তবিকতা ও একতা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, প্লেটো উহাদিগকে স্বতন্ত্র-অবস্থিত বাস্তবিক সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

প্রথমতঃ, কেহ যদি একথা বলেন,—প্লেটোর মতে, প্রত্যেক আইডিয়াই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত,—উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বন্ধন নাই, কোন-একটা সাধারণ কেন্দ্রের সহিত উহাদের যোগ নাই—তাহা হইলে প্লেটোর গ্রন্থ-হইতে এরূপ অনেক স্থল প্রদর্শিত হইতে পারে যেখানে তিনি বলিয়াছেন,—এই সকল আইডিয়া সমবেত হইয়া এমন একটা আইডিয়া-ঘটিত একতায় পরিণত হইয়াছে যাহা এই দৃশ্যমান জাগতিক একতার মূলীভূত কারণ।

তাঁহারা কি এইরূপ বলিতে চাহেন, এই আইডিয়া-ঘটিত জগৎ, এমন একটি স্বতন্ত্র সত্তা যাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্? কিন্তু এই বাক্যটি সমর্থন করিতে হইলে, প্লেটোর "রিপব্লিক্"-নামক গ্রন্থের অনেক স্থল বিস্মৃত না হইলে চলে না,—সেই সব স্থল যেখানে তিনি, মঙ্গলের সহিত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত, বিজ্ঞান ও সত্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই মহান্ তুলনার স্থলটি কি তাঁহাদের স্মরণ হয় না যেখানে,—"সূর্য্য হইতে এই ভৌতিক জগৎ, জীবন ও জ্যোতি লাভ করিয়াছে,"—এই কথার পরেই সক্রেটিস্ বলিতেছেন;—"সেইরূপ তুমি বলিতে পার, এই জ্ঞেয় সত্তা-সমূহও, মঙ্গল হইতে শুধু যে তাহাদের জ্ঞেয়ত্ব লাভ করিয়াছে তাহা নহে—তাহাদের সত্তা ও সারাংশও প্রাপ্ত হইয়াছে।" অতএব এই জ্ঞেয় সত্তাগুলি অর্থাৎ আইডিয়াগুলি স্বতন্ত্র ভাবে কখনই থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন যে, প্লেটো যাহাকে মঙ্গল বলেন উহা মঙ্গলের একটা জ্ঞেয়-ভাব মাত্র, কিন্তু ঈশ্বর ত শুধু একটা জ্ঞেয় ভাব মাত্র নহেন। ইহার উত্তরে আমি বলি, প্লেটোর মতে, "মঙ্গল" বস্তুতই একটি জ্ঞেয় সত্তা, অর্থাৎ আইডিয়া; কিন্তু

* ইংরাজিতে সাধারণতঃ যে অর্থে "আইডিয়া" শব্দ ব্যবহৃত হয়, এখানে আইডিয়া-শব্দের সে অর্থ নহে। ইহার একটা পারিভাষিক অর্থ আছে।

এস্থলে আইডিয়া, মনের শুধু একটা ধারণা মাত্র নহে, শুধু চিন্তার বিষয় নহে; (যে ভাবে অ্যারিষ্টটলের শিষ্যেরা আইডিয়া-শব্দে বুঝিয়া থাকেন)। আমি আর একটু বেশি এই বলি,—প্লেটোর মতে, মঙ্গলের আইডিয়াটি সর্ব্বাদিম আইডিয়া। আমাদের পক্ষে, উহা চিন্তার বিষয় হইয়া থাকিলেও, সত্তা-সম্বন্ধে উহা ঈশ্বরের সহিত একীভূত। যদি মঙ্গলের আইডিয়া ও ঈশ্বর একই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে "রিপব্লিক্"-গ্রন্থের নিম্নলিখিত উক্তিটির কিরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে?—"জ্ঞান-জগতের শেষ সীমান্তে মঙ্গলের আইডিয়াটি অবস্থিত; এই আইডিয়াটি অতি কষ্টে উপলব্ধ হয়, কিন্তু পরিশেষে যখন একবার উপলব্ধ হয়, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, যাহা কিছু সুন্দর ও মঙ্গল, তৎসমস্তেরই উহা মূল প্রস্রবণ। উহা হইতেই দৃশ্যমান জগতে, আলোক ও আলোকের উৎস-স্বরূপ এইসূর্য্য—এবং অদৃশ্য জগতে, সত্য ও জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হয়"। একদিকে সূর্য্য ও আলোক এবং অন্য দিকে সত্য ও জ্ঞান,—কোন বাস্তবিক সত্তা ভিন্ন কি আর কিছু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে?

কিন্তু প্লেটোর নিন্দুকেরা যে সকল অংশ ইচ্ছা করিয়াই যেন অবহেলা করিয়াছেন, তাঁহার "ফেদ্র্"-নামক গ্রন্থের সেই অংশগুলি সম্মুখে উপস্থিত করিলেই সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। প্লেটো একস্থলে এইরূপ বলিয়াছেনঃ—"এই যাত্রা পথে, আমাদের আত্মা ন্যায়ের অনুধ্যান করে, শ্রেয়ের অনুধ্যান করে, বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে,—কিন্তু সেরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বিভিন্ন পদার্থে, বিভিন্ন সত্তায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, পরন্তু সেইরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে যাহা পরাৎপর পরম সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। সর্ব্বভৌমের ধারণা করিতে পারাই আত্মার বিশেষত্ব;—সেই সার্ব্বভৌম—যাহাকে বিবিধ ইন্দ্রিয়-বোধের বৈচিত্র্যের মধ্যেও, প্রজ্ঞামূলক একত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা সত্তা বলি সেই সত্তাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, একমাত্র বাস্তবিক সত্তার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, আত্মা যখন স্বীয় যাত্রাপথে ঈশ্বরের অনুসরণ করে, তখনই সেই সার্ব্বভৌম তাহার স্মরণ-পথে পতিত হয়। কথায় বলে, দর্শনের ডানা আছে; বাস্তবপক্ষে দর্শনের ডানা থাকাই উচিত। কেন না, যে সব পদার্থ থাকাতে, ঈশ্বর বাস্তবিক ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, সেই সব পদার্থের সহিত—যতদূর সম্ভব—আত্মার স্মৃতি জড়িত"।

অতএব দেখা যাইতেছে, দার্শনিক চিন্তার বিষয় সমূহ—অর্থাৎ আইডিয়া-সমূহ, ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান; এবং উহাদের দ্বারাই, এবং উহাদের সহযোগিতাতেই, ঈশ্বর বাস্তবিক ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়েন;—সেই ঈশ্বর যিনি ("সোফিষ্ট"-নামক গ্রন্থে প্লেটো বলেন) "মহামহিম পবিত্র জ্ঞানের অংশভাগী"।

ইহা তবে নিশ্চিত,—প্লেটোর প্রকৃত মতানুসারে, "আইডিয়া" বলিতে সেরূপ সত্তা নহে যাহা আমাদের মনের মধ্যেও নাই, প্রকৃতির মধ্যেও নাই, ঈশ্বরের মধ্যেও নাই, এবং যাহা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। না, তাহা নহে। বস্তুতঃ প্লেটোর মতে,—আইডিয়া-সমূহ যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থের মূলতত্ত্ব ও নিয়ম, সেইরূপ মানব-জ্ঞানেরও মূলতত্ত্ব। এই সকল আইডিয়া হইতেই মানব-জ্ঞান,—স্বকীয় আলোক,

স্বকীয় নিয়ম, স্বকীয় উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের উপাধি সমূহ অবগত হইয়াছে—অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বরকে অবগত হইয়াছে।

আমরা যে মতবাদটির ব্যাখ্যা করিলাম, বাস্তবপক্ষে প্লেটোই তাহার জনক এবং যে সকল প্রখ্যাত দার্শনিক তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাঁহারা সকলেই এই মতের পক্ষ-পাতী।

খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যার যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক সেই সেণ্ট-অগস্টিন্, প্লেটোর একজন ভক্ত শিষ্য। প্লেটোর ন্যায় তিনিও সর্ব্বত্র এই কথা বলিয়াছেন যে, ঐশ্বরিক জ্ঞানের সহিত মানব-জ্ঞানের ও ঈশ্বরের সহিত সত্যের একটা ছুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। এমন কি, প্লেটোনিক মতবাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, তিনি সেণ্টজন্‌কেও ভৎর্সনা করিয়াছেন।

সেণ্ট অগস্টিন্, আইডিয়া-ঘটিত মতবাদটি সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের এক স্থলে তিনি এইরূপ বলেন ঃ—"আইডিয়া-সমূহই সমস্ত পদার্থের আদিম রূপ ও অপরি-বর্ত্তনীয় মূলকারণ। উহারা সৃষ্ট হয় নাই, উহারা নিত্য ও ধ্রুব, উহারা ঐশ্বরিক জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত; উহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন নহে; প্রত্যুত যাহা কিছু জন্ম-মরণশীল, উহারা তাহার ছাঁচ্"।

"যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে, অর্থাৎ স্বস্ব জাতি অনুসারে যাহাদের মধ্যে প্রত্যে-কেরই একএকটা বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি—এ কথা কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন? এ কথা স্বীকার করিয়াও কি কেহ বলিতে পারে যে, ঈশ্বর বিনা-হেতু পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি কেহ তাহা বলিতে কিংবা মনে করিতেও না পারে, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ হেতু বশতই পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অশ্ব-সত্তার হেতু ও মানব-সত্তার হেতু কখনই এক হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব, প্রত্যেক পদার্থই স্বকীয় বিশেষ বিশেষ হেতু বশতই সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল হেতু, স্রষ্টার চিন্তা ছাড়া আর কোথায় থাকিতে পারে? কেননা সৃষ্টি করিবার সময়, স্বকীয় ব্যব-হারার্থ এমন কোন আদর্শ-ছাঁচ্ তাঁহার গোচরে আসে নাই যাহা তাঁহার বাহিরে অবস্থিত। এরূপ মত পোষণ করিলে, ঈশ্বরের অবমাননা হয়।"

যদি পদার্থ সৃষ্টির ও সৃষ্ট পদার্থ সমূ-হের হেতুগুলি, ঐশ্বরিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি ঐশ্বরিক জ্ঞানে, নিত্য ও ধ্রুব ব্যতীত আর কিছুই না থাকে,—তাহা হইলে, সেই হেতুগুলি—যাহাকে প্লেটো আইডিয়া নামে আখ্যাত করিয়াছেন—তাহা নিত্য ও ধ্রুবতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যে ভাবে যাহা কিছু এখানে রহি-য়াছে—সমস্তই সেই ধ্রুবতত্ত্বগুলিরই সহ-যোগিতায় উৎপন্ন।

এমন কি সেণ্ট টমাস,—যিনি প্লেটোর মত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, প্রত্যুত যিনি কতকটা অ্যারিস্টটলের প্রত্যক্ষবাদে দীক্ষিত ছিলেন—তাঁহার মুখ হইতেও নিম্নলিখিত উক্তিটি বাহির হই-য়াছে ঃ—"আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, ঐশ্ব-রিক জ্ঞানেরই একপ্রকার অংশভাগী; এই ঐশ্বরিক জ্ঞানের সহযোগিতাতেই, আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন; এবং এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে—এখানকার যাহা কিছু সমস্তই আমরা ঈশ্বরের মধ্যে অবলোকন করি"। সেণ্টটমাসের এইরূপ আরো অনেক উক্তি আছে, যাহাতে

প্লেটোনিকতার একটু আতিশয্য দৃষ্ট হইলেও উহা আসলে প্লেটোর মত নহে, পরন্তু অ্যালেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের মত।

গভীর মৌলিকতা সত্ত্বেও এবং সম্পূর্ণ-রূপে ফরাসীর জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্র, প্লেটোনিক ভাবে অনুপ্রাণিত।

দেকার্ত্ত্, প্লেটোর মত-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই। এমন কি, তিনি প্লেটোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় না। তিনি আদৌ তাঁহার অনুকরণ করেন নাই; কোন বিষয়েই প্লেটোর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই। তথাপি, প্রথম হইতেই, যেন দুইজনের একস্থানেই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে;—যদিও দেকার্ত্ত্, ভিন্ন পথ দিয়া সেইখানে পৌঁছিয়াছেন।

প্লেটো যাহাকে সার্ব্বভৌম বলেন, আইডিয়া বলেন, দেকার্ত্তের নিকট তাহাই অসীমতার ধারণা—পূর্ণতার ধারণা। যখন তিনি আত্মচৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধি করিলেন যে, "তিনি চিন্তা করিতেছেন সুতরাং তিনি আছেন," তখনি সেই আত্মচৈতন্যের দ্বারা ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে তিনি অপূর্ণ;—তাঁহার অনেক ত্রুটি আছে, অভাব আছে, সীমা আছে, দুঃখ আছে। এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার ধারণা হইল যে, এমন-একটা কিছু আছে যাহা অসীম—যাহা পূর্ণ। কিন্তু এ ধারণাটি এমন কাহারও রচনা হইতে পারে না—যে নিজে অপূর্ণ। অতএব, কোন পূর্ণ পুরুষ তাঁহার অন্তরে এই ধারণাটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত। এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর। এই যুক্তি-প্রণালী অনুসারেই দেকার্ত্ত্, নিজের চিন্তা ও সত্তা হইতে ঈশ্বরতত্ত্বে সমুত্থিত হইয়াছেন। এই সরল যুক্তি-প্রণালীটি, তিনি তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে, বিবিধ আকারে বিবৃত করিয়াছেন। ফলতঃ উক্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, এই ধারণাটির মূলে একটি উপযুক্ত কারণ-সত্তা বিদ্যমান। অর্থাৎ ধারণাটির ন্যায়, ধারণার মূলকারণটিও অসীম ও পূর্ণ। প্লেটো ও দেকার্ত্তের মধ্যে প্রথম প্রভেদ এই:—প্লেটোর মতে, আইডিয়া-সমূহ,—শুধু আমাদের মনের ধারণা নহে, উহা পদার্থ-সমূহেরও মূলতত্ত্ব। কিন্তু দেকার্ত্ত্ ও আধুনিক অন্যান্য দার্শনিকের মতে, উহা শুধু আমাদের মনের ধারণা। এবং এই সকল ধারণার মধ্যে, অসীম ও পূর্ণের ধারণাটি প্রথম স্থান অধিকার করে এই [মাত্র।

দ্বিতীয় প্রভেদ এই—আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় বলিতে গেলে, বস্তুঘটিত মূলতত্ত্বের দ্বারা প্লেটো, আইডিয়া সমূহ হইতে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে দেকার্ত্ত্, কারণঘটিত মূলতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া, অসীম ও পূর্ণের ধারণা হইতে, সেই ধারণার মূলকারণে উপনীত হইয়াছেন যাহাও অসীম ও পূর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত প্রভেদ এবং অন্যান্য প্রভেদ সত্ত্বেও, উহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভূমি আছে; উহারা একজাতীয়; উহারা উভয়ই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে লইয়া যায় এবং যে সকল আইডিয়া আমাদের অন্তরে নিঃসংশয়ে বিদ্যমান, সেই অত্যাশ্চর্য্য আইডিয়াগুলি, মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে তাঁহারই নিকট লইয়া যায় যিনি একমাত্র ঐ সকল আইডিয়ার আধার-বস্তু হইতে সমর্থ;—যিনি এই অসীমতা ও পূর্ণতা-আইডিয়ার প্রবর্ত্তক এবং নিজেও অসীম ও পূর্ণ। এই প্রকারে, দেকার্ত্তকেও, প্লেটো ও সক্রেটিসের সহিত একপরিবার-ভুক্ত করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

———

এপিক্‌টেটাসের উপদেশ।

১। আর একজনের দোষে তোমার অনিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করিও না। অন্যের সঙ্গে থাকিয়া তুমি অসুখী হইবে এই জন্য তুমি জন্মাও নাই; প্রত্যুত, অন্যের সঙ্গে থাকিয়া সুখী হইবে—সৌভাগ্যবান্ হইবে এই জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি কেহ দুর্ভাগ্য ও অসুখী হয়, সে জানিবে তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফল। কারণ, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সুখী করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন—সকলকেই ভাল অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন—যাহা তাহার নিজের; এবং আর কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন যাহা তাহার নিজের নহে। যে সকল বস্তু প্রাকৃতিক বাধার অধীন, অনিবার্য্য শক্তির অধীন, বিনাশের অধীন, তাহা তাহার নিজস্ব নহে, ইহার বিপরীতই তাহার নিজস্ব বস্তু। যিনি নিয়ত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতে ছেন, সেই ঈশ্বর, এমন কতকগুলি জিনিস আমাদের নিজস্ব করিয়া দিয়াছেন, যাহার উপর আমাদের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে।

২। "কিন্তু আমি অমুককে ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেই জন্য তিনি কষ্ট পাইতেছেন"। যে সকল বস্তু তাঁহার আপনার নহে, তাহাদিগকে আপনার বলিয়া কেন তিনি মনে করেন? তোমাকে দেখিয়া যখন তাঁর আনন্দ হয়, তখন কি তিনি ভাবেন না, তুমি মর্ত্ত্যজীব—কোন্ দিন অন্য লোকে চলিয়া যাইবে? তাই তিনি এখন তাঁহার অবিবেচনার ফল ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? তোমার প্রিয় বস্তুর সহিত তুমি চিরকাল একত্র বাস করিতে পারিবে, অবোধ রমণীর ন্যায় তুমিও কি তাই ভাবিতেছ? সেই সব প্রিয়জনকে দেখিতে পাইতেছ না—সেই সব প্রিয় স্থানে যাইতে পারিতেছ না বলিয়া তুমি এখন কাঁদিতেছ? তুমি কাক-বায়সাদি অপেক্ষাও হতভাগ্য। তাহারা যথা-ইচ্ছা উড়িয়া যায়, নীড় পরিবর্ত্তন করে, সমুদ্রপারে গমন করে;—যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, তাহার জন্য বিলাপ করে না—তাহার জন্য লালায়িত হয় না।

—"হাঁ, তাহারা এইরূপ বটে, কেন না তাহারা বুদ্ধিহীন জীব"। তবে কি দেবতারা এই জন্যই আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন যে আমরা চিরকালের জন্য অসুখী হই? এসো তবে আমরা সকলেই অমর হই, বিদেশে যেন আমরা কখন না যাই, বৃক্ষাদির ন্যায় একস্থানেই বদ্ধমূল হইয়া থাকি। যদি আমাদের কোন সঙ্গী আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে এসো আমরা তাহার জন্য কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদি; আবার সে ফিরিয়া আসিলে শিশুর ন্যায় হাত তালি দিয়া নৃত্য করি!

৩। এখনও কি তবে আমাদের স্তন্য ছাড়িবার বয়স যায় নাই? তত্ত্বজ্ঞানীদের কথা এখনও কি আমরা স্মরণ করিব না? এত দিন কি তবে কুহকীর মন্ত্রের ন্যায় তাঁহাদের কথাগুলা শুনিয়াছিলাম? তাঁহারা কি বলেন নাই?—এই জগৎ, একটি অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীন, একই উপাদানে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট কালচক্র—একটা নির্দ্দিষ্ট কল্পকাল অবশ্যই থাকিবে। কতকগুলি পদার্থ চলিয়া যাইবে, আর কতকগুলি পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করিবে;—কতকগুলির তিরোভাব

ও কতকগুলির আবির্ভাব হইবে; কতকগুলি অচলভাবে ও কতকগুলি সচলভাবে অবস্থান করিবে। কিন্তু সকল পদার্থই দেবতা ও মনুষ্যের প্রেমে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির নিয়মে সকলেই পরস্পরের প্রতি স্নেহমমতায় আবদ্ধ। কিন্তু চিরকাল একত্র থাকাও প্রকৃতির নিয়ম নহে। যত দিন একত্র থাকিতে পার,—আনন্দ কর, কিন্তু কেহ তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পরিতাপ করিও না।

৪। হার্কুলিস্ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কয় জন বন্ধু ছিল? তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিলাপও করেন নাই—পরিতাপও করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে অনাথ করিয়াও যান নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, কোন মনুষ্যই অনাথ নহে; একজন পরমপিতা আছেন যিনি অবিরত সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন। হার্কুলিস্, ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলিয়া শুধু জানিতেন না, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে আপনার পিতা বলিয়া জানিতেন। এই হেতু তিনি সকল স্থানেই সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫। সুখ এবং যাহা নাই তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা—এই দুই জিনিস একসঙ্গে কখনই থাকিতে পারে না। সুখ, সমস্ত বাসনার চরিতার্থতা চাহে,—পূর্ণ পরিতৃপ্তি চাহে;—তাহার সহিত ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকা চলে না। এমন কোন্ সাধু ব্যক্তি আছে যে আপনাকে জানে না? যে আপনাকে জানে, সে কি একথাও জানে না যে, দুই জন কখনই একত্র চিরকাল থাকিতে পারে না? সে কি জানে না—"যারই জন্ম তারই মৃত্যু"? যাহা পাওয়া অসম্ভব, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা কি বাতুলতা নহে? যে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে না, সে আপনার ভ্রান্ত প্রতীতি অনুসারেই কাজ করে।

৬। "কিন্তু আমার মা যে আমাকে না দেখিলে কাঁদেন"। এই সকল উপদেশ-বাক্য তিনি কি তবে কখন শুনেন নাই? তুমি তবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। তা ছাড়া তুমি আর কি করিতে পার। পরের দুঃখ নিবারণ করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু আমার নিজের দুঃখ নিবারণ করা সম্পূর্ণরূপে আমার সাধ্যায়ত্ত। কোন অনিবার্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য বিলাপ করিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইবে; তাহা হইলে দিবা রাত্রে আমার মনের শান্তি থাকিবে না। গভীর রজনীতে, যদি কোন সংবাদ আইসে, যদি কাহারও নিকট হইতে পত্র আইসে, অমনি আমি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিব এবং না জানি কি সংবাদ এই মনে করিয়া কাঁপিতে থাকিব। "রোম হইতে একজন পত্রবাহক আসিয়াছে"—"যদি কোন অশুভ সংবাদ হয়।" তোমার কি অশুভ হইতে পারে যখন তুমি সেখানে নাই? "গ্রীস হইতে একটা পত্র আসিয়াছে",—"কোন অশুভ সংবাদ নহে ত?"—এইরূপ সকল স্থানই তোমার পক্ষে অমঙ্গলের প্রস্রবণ হইয়া উঠিবে। যেখানে তুমি রহিয়াছ, সেখানকার অশুভই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? সমুদ্রপারেও কি তোমার নিস্তার নাই?—পত্রাদিতেও কি তোমার নিস্তার নাই? তুমি তবে কোথায় গিয়া নিরাপদ হইবে? "আমার যে-সকল আত্মীয় বন্ধু বিদেশে আছেন, তাঁহাদের যদি মৃত্যু হয়,

তাহা হইলে কি হইবে ?”—বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়মে যে সকল জীব মৃত্যুর অধীন—তাহাদের মৃত্যু এক সময়ে অবশ্যই হইবে। তুমি তাহাতে কি করিবে? তুমি তবে দীর্ঘজীবী হইতে কেন ইচ্ছা কর? অধিক দিন বাঁচিলে কোন-না-কোন প্রিয়জনের মৃত্যু কি তোমার দেখিতে হইবে না? তুমি কি জান না, দীর্ঘকালের মধ্যে কত কি ঘটিতে পারে?—কেহ বা জ্বর রোগে, কেহ বা দস্যুর হস্তে, কেহ বা রাজার উৎপাড়নে ধরাশায়ী হইবে। ইহারাই আমাদের পরিবেষ্টন—ইহারাই আমাদের সঙ্গী। শীত গ্রীষ্ম, অযথারূপে জীবনযাপন, জলে স্থলে ভ্রমণ, ঝঞ্ঝাবাত,—এইরূপ কত অবস্থায় পড়িয়া মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেহ বা নির্ব্বাসনে, কেহ বা দৌত্যে, কেহ বা রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। তুমি তবে এই-সবে ত্রস্ত হইয়া চুপ্ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক, কেবলি বিলাপ কর, ক্রন্দন কর, অসুখী হও, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাক;—একটি নহে, দুইটি নহে—সহস্র বাহ্য ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া থাক।

৭। তুমি কি তবে ইহাই শুনিয়াছ? ইহাই কি তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকটে উপদেশ পাইয়াছ? তুমি কি জান না, এখানে সংগ্রামই জীবনের একমাত্র কাজ? তোমার প্রতি সেনাপতির কোন কঠিন আদেশ হইলে, তুমি যদি দুঃখ প্রকাশ কর—যদি তুমি তাহা পালন না কর, তাহা হইলে সমস্ত সৈন্যগুলাকে কু-দৃষ্টান্ত দেখানো হইবে, তাহা কি তুমি জান না? তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তে, কেহই আর খাত খনন করিবে না, প্রাকার নির্ম্মাণ করিবে না, পাহারা দিবে না—কেহই বিপদের মুখে অগ্রসর হইবে না, সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আবার যদি জাহাজের নাবিক হইয়া একস্থানেই তুমি বসিয়া থাক, কোথাও নড়িতে না চাহ, যদি মাস্তুলে উঠিতে বলিলে না ওঠো, গলুইয়ের মুখে যাইতে বলিলে না যাও, তাহা হইলে কোন্ জাহাজের কাপ্তেন তোমার সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন?—তিনি কি আবর্জ্জনা মনে করিয়া, কাজের প্রতিবন্ধক মনে করিয়া, অন্য নাবিকের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত মনে করিয়া, তোমাকে জাহাজ হইতে বাহির করিয়া দেন না?

৮। সেই প্রকার এখানেও প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন, দীর্ঘকালব্যাপী একপ্রকার সংগ্রাম বলিয়াই জানিবে;—উহা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। এখানে সকলকে সৈনিক হইতে হইবে, সেনাপতির ইঙ্গিত মাত্রে সমস্ত আদেশ অকাতরে পালন করিতে হইবে। এমন কি, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহাও কখন কখন অনুমান করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতি যেখানে যাইতে বলিবেন সেইখানেই যাইতে হইবে। তুমি কি উদ্ভিজ্জের ন্যায় এক স্থানে বদ্ধমূল হইয়া থাকিতে চাহ? হাঁ, তাহাতে আরাম আছে, সুখ আছে। কে তাহা অস্বীকার করিতেছে? মুখরোচক সুখাদ্য কি সুখের সামগ্রী নহে?—সুন্দরী স্ত্রী কি সুখের সামগ্রী নহে? যাহারা নাচ পাশবসুখে আসক্ত, তাহাদের মুখেই একথা শোভা পায়।

৯। এই সকল নীচ বাসনা পরিত্যাগ কর। এই সকল বিলাসীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও না। অবাধে পূর্ণমাত্রায় নিদ্রা যাইব, শয্যা হইতে উঠিয়া অলসভাবে জৃম্ভন করিব, মুখ প্রক্ষালন করিব, ইচ্ছামত লিখিব পড়িব, তার পর তুচ্ছ কথাবার্ত্তায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিব, যাহা আমি বলিব তাহাতেই বন্ধুগণ আমার প্রশংসা কবিবে, তার পর একটু বেড়াইতে বাহির হইব, তাহার পর স্নান, তাহার পর আহার, তাহার পর আবার বিশ্রাম করিব—ইহা ভিন্ন তাহাদের কি আর কোন আকাঙ্ক্ষা আছে? সক্রেটিস্ ও ডায়োজিনিসের শিষ্য সত্যের সেবকগণ! তোমরা কি এইরূপ জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে কর?

৯। "তাহা হইলে আমি কি মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিব?" মানুষ দীনভাবে বিলাপ করিবে, পরের উপর একান্ত নির্ভর করিবে, কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিবে—ইহা বিবেক-সম্মত কাজ নহে। বিবেকের অধীন হইয়া স্নেহ মমতা কর।

কিন্তু যদি এইরূপ স্নেহমমতা করিতে গিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে হিতকর হইবে না। কোন মরণশীল মর্ত্ত্যজীবকে যেভাবে ভালবাসা যাইতে পারে, কোন বিদেশ-যাত্রীকে যে ভাবে ভালবাসা যাইতে পারে, সেইরূপ ভাবে ভালবাসোনা কেন—তাহাতে বাধা কি? সক্রেটিস্ কি তাঁহার সন্তানগণকে ভালবাসিতেন না? হাঁ ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনপুরুষের ন্যায় ভাল বাসিতেন; সর্ব্বাগ্রে দেবতাদিগকে ভালবাসিতে হইবে—ইহাই তিনি মনে করিতেন। তাই তিনি জীবনে মরণে—সকল অবস্থাতেই স্বকীয় কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা নানা প্রকার ওজর করিয়া থাকি। কেহ সন্তানের ওজর—কেহ মাতার ওজর—কেহ বা ভ্রাতার ওজর করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ওজর করা উচিত নহে। সকলের সঙ্গে থাকিয়া—বিশেষতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিয়া আমরা সুখী হই—ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কাহারও জন্য আমরা অসুখী হই, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

১০। তাছাড়া, যাহা কিছু তোমার প্রিয়—তাহার সম্বন্ধে কি কি প্রতিবন্ধক আছে, একবার কল্পনা করিয়া দেখিবে। যখন তোমার শিশুসন্তানটিকে তুমি চুম্বন কর, তখন তাহার কানে-কানে এই কথাটি বলিতে হানি কি?—"বাছা! কাল যে তুই চলিয়া যাইবি।" সেইরূপ তোমার বন্ধুর প্রতি এই কথাটি বলিতেই বা দোষ কি?—"হয় তুমি, নয় আমি—দুজনের মধ্যে কেহ কাল প্রস্থান করিব, আর বোধ হয় আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে না।" "কিন্তু এ সব যে 'অলক্ষণে' কথা।" তুমি কি তবে বলিতে চাহ, যাহা কিছু স্বাভাবিক তাহাই 'অলক্ষণে?' তবে বলনা কেন ধান কাটাও "অলক্ষণে," কেননা তাহাতে ধান মরিয়া যায়; তবে বলনা কেন, পাতা

ঝরা, কাচা ডুমুর শুকাইয়া যাওয়া, আঙ্গুর শুকাইয়া কিচ্‌মিচ্‌ হওয়া—এ সমস্তই 'অলক্ষণে।' কিন্তু উহাদের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে মাত্র, উহাদের ত বিনাশ হয় নাই; উহা শুধু একটা পরিবর্ত্তন। সেইরূপ, বিদেশযাত্রাও একটা পরিবর্ত্তন। আর মৃত্যু—সে আরো একটু বেশি পরিবর্ত্তন। কিন্তু ইহা অস্তি হইতে নাস্তিতে পরিবর্ত্তন নহে,—এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার পরিবর্ত্তন-এই মাত্র।

ব্রহ্মস্তোত্র।

("নমস্তে সতে")

নমোনমঃ সত্যরূপ জগত কারণ,
চিন্ময় তোমায় নমি, ত্রিলোক ধারণ।
নমো এক অদ্বিতীয় মুক্তির সোপান,
নমো ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী শাশ্বত পুরাণ॥

একমাত্র পূজ্য তুমি, তুমিই শরণ,
স্বপ্রকাশ একমাত্র করিছ পালন।
একমাত্র স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ঈশ্বর,
ধ্রুব নিত্য নির্ব্বিকল্প পূর্ণ পরাৎপর॥

ভয়ের ভয়, ভীষণের তুমিই ভীষণ,
তুমি প্রাণিগণ-গতি পাবক-পাবন।
মহোচ্চপদের তুমি নিয়ন্তা জগতে,
রক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-হ'তে॥

স্মরি হে তোমায় প্রভু, ভজি হে তোমায়,
জগতের সাক্ষী রূপে নমি তব পা'য়।
সত্য এক নিরালম্ব, সর্ব্বমূলাধার,
লইনু শরণ তব, ভব-কর্ণধার॥

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৫৭॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৭৯৬৶৬
সমষ্টি	...	২১৫৩৸০
ব্যয়	...	৩২৭॥ ৯
স্থিত	...	১৮২৬৶৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

ছইকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৩২৬৶৩

১৮২৬৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৫০৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মহাশয়ের প্রদত্ত বেঙ্গল বণ্ডেড্
অয়্যার হাউসের সেয়্যারের ডিভিডেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়		৫০৲
		২৫০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৲
পুস্তকালয়	...	১॥৶
যন্ত্রালয়	...	৮৩॥০
গচ্ছিত	...	২॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		১০৲
সমষ্টি	...	৩৫৭॥৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০৪৸/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৶৬
পুস্তকালয়	...	।০
যন্ত্রালয়	...	৮০॥৶৬
গচ্ছিত	...	২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৫॥৯
সমষ্টি	...	৩২৭॥ ৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ফাল্গুনব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬।

৭৫১ সংখ্যা

১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানম‌নন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬২। কলিগতাব্দ ৫০০৬। ১ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ষট্সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

যথা কালে উপাসকমণ্ডলী সমাগত। সভাস্থল পরিপূর্ণ। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি বেদী গ্রহণ করিলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না—কদাচ ভয় প্রাপ্ত হ'ন না। আমরা এই যে পাপে তাপে দুঃখে শোকে ভয়ে বিপদে মুহ্যমান হইয়া নিরানন্দে দিন যাপন করিতেছি—কায়মনোবাক্যে কি আমাদের এইরূপ চেষ্টা হইবে না যে, কেমন করিয়া আনন্দের কণামাত্র পাইয়া মৃত শরীরে প্রাণ পাই—কেমন করিয়া আনন্দের সহিত সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া নির্ভয়ে গন্তব্য পথ অতিবাহন করি! অনেকেই হয় তো আমরা মনে করিতেছি যে, তাহা পাইলে বর্ত্তিয়া যাই; কিন্তু তাহা পাই কি উপায়ে? দেশশুদ্ধ সমস্ত লোকেই—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই—দীন হীন মলিন বেশে বিরস বদনে জিয়ন্তে মরিয়া রহিয়াছে—ইহা কি পাপের ফল নহে;—পাপের ঔষধ আমরা কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারি? আমরা মৃত্যুর ঘূর্ণা-চক্রে পড়িয়া জীবনকে জাপটিয়া ধরিবার জন্য চারিদিকে হাত পা ছুঁড়িতেছি—কিন্তু জীবনকে পাইতে পারি কি উপায়ে? ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" পরমাত্মার আনন্দের বিন্দু-বিন্দুর ছিটায় অন্যান্য জীবেরা জীবন পাইতেছে; মনুষ্যই কি কেবল আনন্দ-বিহনে শুষ্ক পুষ্করিণীর মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া মারা যাইবে? মনুষ্যের জীবন কি কেবল নিরানন্দে যাপন করিবার জন্যই হইয়াছে? কখনই তাহা হইতে পারে না। করুণাময় পরমেশ্বরের আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার সকলের জন্যই মুক্ত রহিয়াছে—আমরা বাঁচিয়া আছি সেই

আনন্দেরই প্রসাদে। পরমাত্মার আনন্দ আমাদিগকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া নাই, আমাদের নিকট হইতে একপদও দূরে নাই—কিন্তু আমরা সেই স্বভাবসিদ্ধ সুনির্ম্মল অটল আনন্দকে তুচ্ছ বোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া কৃত্রিম আনন্দের পথকেই সার করিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখে পরিণত হইতেছে—সমস্ত আশাভরসা নৈরাশ্যে পরিণত হইতেছে। পশু পক্ষীরা যে আনন্দ চাহিতেছে তাহা তাহারা পাইতেছে—কিন্তু মনুষ্য যে আনন্দ চাহিতেছে, মনুষ্য তাহার জন্য হাহাকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—তবুও তাহা পাইতেছে না; ইহার কারণ কি? না জানিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় মূঢ়ভাবে আনন্দ উপভোগ করিলে, মনুষ্যের আনন্দের মাত্রা-পূরণ হইতে পারে না—এই তাহার একমাত্র কারণ। মনুষ্যের প্রাণ পশুপক্ষীর ন্যায় শুধু কেবল শরীরেই আবদ্ধ নহে—মনুষ্যের প্রাণ শুধু কেবল শারীরিক প্রাণ নহে; মনুষ্যের প্রাণ শরীর ছাড়িয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছে—মনুষ্যের প্রাণ আধ্যাত্মিক প্রাণ। মনুষ্যের প্রাণ কেবল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য হয় নাই—তাহা কালের হস্ত ছাড়াইয়া উঠিবার জন্যই হইয়াছে। মনুষ্যের জ্ঞানের যেরূপ বিশাল পরিধি তাহার নিকটে সসাগরা পৃথিবীর রাজঐশ্বর্য্য ধূলিমূল্যে বিকাইয়া যায়। মনুষ্যের জ্ঞানের লক্ষ্য কোনো প্রাচীরের অবরোধ মানে না, তাই তার প্রাণের কথা এই যে, যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, যাহা মহান্ তাহাই সুখ অল্প কিছুতেই সুখ নাই। মনুষ্য যে আনন্দের অধিকারী—এবং মনুষ্যের অন্তরাত্মা যে আনন্দ চায়, তাহা পাইতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় আনন্দের মূল উৎসের অন্বেষণ। মনুষ্যের অন্তঃকরণ নিস্তব্ধ হইলে অন্তরাত্মা হইতে স্বতঃ এইরূপ একটি বাক্য বিনিঃসৃত হয় যে, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি—কোথায় আছি—কোথায় যাইতেছি? আপনার শক্তিতে আসি নাই—আপনার শক্তিতে বর্ত্তিয়া থাকিতেছি না—আপনার শক্তিতে এ লোক হইতে অবসৃত হইব না। পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদিগের গোড়ার কথা যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের গোড়াতেই লেখা রহিয়াছে তাহা এই যে,

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে ভূত সকল জন্মিতেছে, জন্মিয়া যাঁহাতে ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে এবং যাঁহাতে গিয়া প্রবেশ করিতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। কে তিনি তাহা পরেই রহিয়াছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই ভূত সকল জন্মিতেছে—আনন্দের উপরে ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে—আনন্দে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। আনন্দই ব্রহ্ম তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন যুগের বৌদ্ধ সাধকের গোড়ার কথা—ক্লেশ ক্লেশ ক্লেশ। পূর্ব্বতন যুগের ব্রহ্মজ্ঞানের গোড়ার কথা ছিল—আনন্দ আনন্দ আনন্দ। ব্রহ্মজ্ঞানের গোড়ার কথাটিতে আনন্দকেই বিশেষ রূপে জানিতে বলা হইতেছে—কেননা আনন্দেই ব্রহ্ম।

আনন্দ যে কি তাহা তো সকলেই জানে—যাহা সকলেই জানে তাহাকে বিশেষ রূপে জানিতে বলা'র অর্থ কি? তাহার অর্থ এই যে, আমরা কৃত্রিম আনন্দের পথে প্রধাবিত হইয়া প্রকৃত আনন্দ

হইতে দূরে পড়িয়াছি—এক্ষণে তাই প্রকৃত আনন্দের পথ অন্বেষণ করা আমাদের পক্ষে সব কাজ ছাড়িয়া আগে কর্ত্তব্য। আমরা ভীষণ অরণ্যে পথ হারাইয়াছি, তাই নিবিড় শাখা পত্র ভেদ করিয়া ধ্রুব তারার অন্বেষণ আমাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আমাদের পশ্চাতে অনাদি অতীত কাল, আমাদের সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল, দুইই আমাদের নিকটে প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—দুই অন্ধকারের মাঝখানে আমরা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র ভেলায় ভাসিতেছি। এ অবস্থায় আমরা নির্ভয় হইব কেমন করিয়া? পূর্ব্বতন ঋষিরা তাই প্রথমে বলিয়াছেন যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, এবং তাহার অব্যবহিত পরে বলিয়াছেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না। এ দুই কথা আপাততঃ আমাদের কর্ণে বিসম্বাদী ঠেকিতে পারে, মনে হইতে পারে যে, ও দুই কথার মধ্যে অগ্রপশ্চাতের মিল নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে দুয়ের মধ্যে মিল রহিয়াছে অতীব চমৎকার। অনাদি অতীত কালের এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের সেই যে অগম্য প্রদেশ যেখানে আমাদের মন যায় না, বুদ্ধি যায় না, বাক্য সরে না—সেখানে ধ্যানের লক্ষ্য প্রসারণ করিতে বলা হইতেছে না,—এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই অনাদি অনন্তকাল একীভূত হইয়া রহিয়াছে। যে ধনে যাহার অভিলাষ সমস্তই বর্ত্তমানে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। তিন এই যে কাল ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাহা তিন নহে, তাহা পরমেশ্বরের একই অপ্রতিহত শক্তি। এক সেই মহতী শক্তির মুষ্টির মধ্যে অনাদি অনন্ত ভূত-ভবিষ্যৎ কাল বর্ত্তমানেই বর্ত্তমান; সে শক্তি কালের কাল—জীবনের জীবন। তাহার নিকটে ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটিবে সমস্তই বর্ত্তমানে ঘটিয়া রহিয়াছে—এবং অতীত কালে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে সমস্তই বর্ত্তমানে বাঁচিয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা—তাহাই তাঁহার শক্তি এবং তাহাই তাঁহার শক্তির ফল। তাঁহার নিকটে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে ব্যবধান নাই—সমস্তই বর্ত্তমানে বর্ত্তমান। আমরা নিরানন্দ হই কেন? না যেহেতু শক্তির অভাবে আমাদের ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হয়; পরমেশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি—অনাদি ভূত কালের কোনো এক মুহূর্ত্তেও তাহার ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের কোনো এক মুহূর্ত্তেও তাহার ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না—তাহা সত্যের উপরে চিরপ্রতিষ্ঠিত এবং মঙ্গলের চিরন্তন উৎস। সুতরাং সেখানে নিরানন্দের প্রসঙ্গও উঠিতে পারে না। একদিকে অনাদি ভূত কালের অন্ধকার এবং আর একদিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের অন্ধকার অগ্রপশ্চাতের এই দুই অন্ধকার দেখিয়া আমরা ভয় পাইতেছি, কিন্তু পরমাত্মার অমৃত নিকেতনে ভূত নাই ভবিষ্যৎ নাই—সবই বর্ত্তমান, অন্ধকার নাই—সবই আলোক। সেখানে নিরানন্দের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। উপনিষদে আছে "স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ" ইঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ; ইহা হইতেই আসিতেছে যে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের গোড়ার কথা যে পরব্রহ্মের আনন্দ তাহাও স্বভাবসিদ্ধ। পরমেশ্বরের ইচ্ছা—ইচ্ছাসিদ্ধি এবং আনন্দ একই। পরব্র-

হ্মের সেই স্বভাবসিদ্ধ আনন্দই সর্ব্বভূতের সহজ আনন্দ—তাহাই সাধকের সুনির্ম্মল আনন্দ, সদানন্দ, তাহাই ভক্তবৃন্দের প্রেমানন্দ অমৃতানন্দ। সমুদায় আকাশ সে আনন্দে ভরা রহিয়াছে। তাঁহার আনন্দের বাষ্পও যদি আমরা জানিতে পারি এবং জানিতে পারিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহার রসাস্বাদন করি, তাহা হইলে আমরা এই ভয়াবহ সংসারে অভয় প্রাপ্ত হই। উপনিষদে আছে "য উ দরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" তাঁহা হইতে যিনি একচুলও অন্তর হ'ন তাঁহার ভয় হয়; ভয় হইবারই কথা, যে হেতু তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। পরমাত্মার আনন্দই অন্ধকারের আলোক। সেই আনন্দের খনি হইতেই আমরা আনন্দ পাইতে পরি, শান্তি পাইতে পারি, অভয় পাইতে পারি, সমস্ত পাপতাপের ঔষধ পাইতে পারি। অদ্য এই মাঘের পুণ্য একাদশ দিবসে সেই আনন্দের রসাস্বাদন করিয়া নির্ভয় হও এবং তাহা হৃদয় ভরিয়া পান করিয়া ভয়াবহ সংসারের পর পারে উত্তীর্ণ হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে উপাসনাদি শেষ হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

অদ্য ষট্‌সপ্ততিতম মাঘোৎসবের প্রভাতে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আমরা সকলে ধন্য হইলাম। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেইদিকেই দেখি যে

"সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"।

সেই পূর্ণ পুরুষ অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে। সূর্য্যজ্যোতি পরিমণ্ডিত আকাশের অনন্ত কক্ষে, আমাদের অন্তরাকাশে, এই মন্দিরস্থ আকাশে তিনি দীপ্যমান। উৎসব তরঙ্গের প্রতি হিল্লোলে তাঁহার মধুর প্রীতি, মধুর কল্যাণবাণী যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, হে বৎসগণ, অধ্রুব পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুব পদার্থের মধ্যে, আত্মপদার্থের মধ্যে তোমরা যে আমাকে অন্বেষণ করিতে শিখিয়াছ সেই পথেই আমি জ্যোতিবিস্তার করি, সেই পথগামী পথিকগণকেই আমি ব্রহ্মধামের অমৃত আনন্দে অভিষিক্ত করি। ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তথাপি যেন কোন অলক্ষিত অভাব আমাদের হৃদয়কে শূন্য করিতেছে—এ মহোৎসব যেন প্রাণহীন মূলহীন বোধ হইতেছে। উৎসবের লক্ষ্য যে ঈশ্বর সে লক্ষ্যের দিকে মনপ্রাণ প্রবাহ বেগে ধাবিত হইলেও প্রবাহ-মূল যে উৎস তাহা যেন দেখিতে পাইতেছি না। কি সেই উৎস, কোথায় সেই উৎস, যে উৎস হইতে উৎসবের আরম্ভ অবধি বৎসর বৎসর শ্রীসৌষ্ঠব, প্রাণ, উদ্যম উদ্যত হইয়া আমাদের অন্তরে অন্তরে সন্ধিতে সন্ধিতে গ্রন্থি বন্ধন পূর্ব্বক ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত? আজ সেই মহাপুরুষের অভাব যিনি ইহার উৎস ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন শুষ্ক তর্কবিতর্কের বিষয় ছিল, যখন ইহাতে ঈশ্বরের উপাসনা মানবের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না, যখন দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থি বন্ধন করার প্রয়োজন কেহ জানিতেন না, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মতামত কোন ধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ না হইয়া ইতস্তত জল্পনা কল্পনার মধ্যে নিহিত ছিল, সকল পদার্থের ও সকল তত্ত্বের উৎপত্তি-মূল যে বীজ যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-তত্ত্বের মূলেই তাহা ছিল না,

তখন ঈশ্বরের কল্যাণ সঙ্কল্প হইতে প্রসূত হইয়া এই ধরাধামে যে মহাত্মা আবির্ভূত হইলেন এবং একটি একটি করিয়া এই মহা ধর্ম্মতত্ত্বের প্রত্যেক অঙ্গ বেদ উপনিষদ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে দিব্য মূর্ত্তি প্রদান করিলেন এবং মানবের সনাতন ধর্ম্মস্রোতের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিলেন, তিনি অদ্যকার এই উৎসবের উৎস। মানব আত্মার অভ্যন্তরে অহরহ উৎসবের আনন্দ জাগ্রত রহিয়াছে—যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, রমণ করেন, নিমজ্জিত থাকেন তিনি তো সর্ব্বদাই উৎসবানন্দরস পান করিতেছেন, তাঁহার জন্য যদিও এই উৎসবের প্রয়োজন নাই কিন্তু সকাম বিষয়ভোগী গৃহী জনের জন্য এই বাহ্যে উৎসবের প্রয়োজন আছে। বৎসরান্তে এক দিন যদি মনুষ্যের মনে উৎসাহ, অনুরাগ প্রেম পুণ্যের ভাব রোপণ করা যায় তাহাতে বিষয়াসক্ত পুরুষকে ধর্ম্মের দিকে সহজে আকর্ষণ করা যাইবে, এই ভাবিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অদ্য ৭৬ বৎসর হইল এই ব্রহ্মোৎসবের সৃষ্টি করেন। ভারতের চারিদিকে সকল ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে, নগরে নগরে যে মাঘোৎসবের আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, কোথাও দিবসব্যাপী, কোথাও সপ্তাহব্যাপী এবং কোথাও বা পক্ষব্যাপী এই যে উৎসাহ, এই যে দিগ্দিগন্তউন্মথনকারী "জয় ব্রহ্ম নামের" উৎসারণ, ইহার মূল উৎস সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। আজ তিনি ইহলোকে নাই বলিয়া উৎসবের প্রত্যেক অঙ্গ-মূলে তাঁহার আদেশবাণী স্ফুরিত হইতেছে না, তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাঁহার উদ্দীপ্ত অনলবৎ প্রাণাকর্ষণকারী অনুরাগে আজ আমাদের হৃদয় মন পূর্ণ হইতেছে না বলিয়াই যেন সেই অলক্ষিত অভাব আমাদের চারিদিক শূন্য করিয়া তুলিতেছে। আজ এ অভাব কিসে পূর্ণ হইবে? যিনি জীবন দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পুষ্ট ও জীবন্ত করিয়া গিয়াছেন এই উৎসব প্রাঙ্গণে তাঁহার জীবনের অনুধ্যানই কিয়দংশে আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে পারে, আমাদের ধর্ম্মভাব চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে।

বাল্যকালেই মহর্ষির জীবনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইহার কারণ শ্মশান ঘাটে তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু। মহর্ষি বলিয়াছেন—"এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কি রূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক। তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই। এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম। এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ী আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে

নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময়ে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল"। মহর্ষি চিরকাল ঈশ্বর ও পরকালের চিন্তা লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও পরকালের চিন্তাই এই উৎসবের মূলে দীপ্যমান রহিয়াছে। আজ আমরা বৃথা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য এই উৎসব প্রাঙ্গণে আগমন করি নাই। পাঁচ জনের আগমন দেখিয়াও আমরা আগমন করি নাই। আমরা ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় এখানে আসিয়াছি এবং সেই ফল এখান হইতে লইয়াই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং তাহা আমাদের চিরজীবনের ভোগ্য হইবে। সে ফল কি?" ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" ঔদাস্য হইতে আনন্দের সৃষ্টি। সে আনন্দ ঈশ্বরে ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যে রূপ আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধাদির জন্য কয়েক দিনের গোলযোগের পরে আবার তাহা পাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা আর পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইবেন তাহার জন্য তাঁহার মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল—আর কিছুই ভাল লাগে না, এমন কি প্রখর রৌদ্র কিরণও তাঁহার সম্মুখে ঘোর কৃষ্ণ রেখার ন্যায় বোধ হইয়াছিল। এই বিষাদের ফলেই তিনি অনন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, এস্থলে ভাগবতের একটি উপাখ্যানের সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে।

০ নারদ বেদব্যাসের নিকটে আপনার কথা বলিতেছেন—"আমি পূর্ব্বজন্মে কোন এক ঋষির দাসীপুত্র ছিলাম। ঐ ঋষির আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিল এবং মনে হরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে ঐ সমস্ত সাধু আশ্রম হইতে বিদায় লইবার কালে কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্য শিক্ষা দিয়া যান। ইহার দ্বারা আমি হরিমাহাত্ম্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। "একাত্মজা মে জননী।" আমি কেবল তাঁহারই জন্য ঐ ঋষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গোদোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে একটি কৃষ্ণ সর্প পাদস্পৃষ্ট হইবা মাত্র তাঁহাকে দংশন করে এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটি আমি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির বড় সুযোগ মনে করিলাম এবং একাকী ঝিল্লিকাগণনাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ করিলাম। পর্য্যটনশ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা হইয়াছিল। আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। মন প্রশান্ত হইল। অনন্তর আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম এবং সাধুগণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল।

আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাম, ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল—এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিলাম, ইহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য।"

আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালের আনন্দ না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আবার আমার অনুরাগ উৎপন্ন করিয়া দিল। কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে আমার একটি বিষয়ে মিল হয় না। তিনি প্রথমে ঋষিদিগের মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।

পুত্রকে যেমন পিতা অন্নবস্ত্র দানে প্রতিপালন করেন এবং গুরু তাহার আধ্যাত্মিক জগতে আলোক প্রদর্শন করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্য ঈশ্বর স্বয়ংই এই উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিলে তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সেই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই অযাচিত করুণা লাভের তিনটি অব্যর্থ কারণ মহর্ষির জীবনে বর্ত্তমান ছিল —প্রথমে বৈরাগ্য, ব্যকুলতা ও সাধন, যে তিন কারণ অভাবে মনুষ্যের ভাগ্যে কখন স্বর্গসুখ লাভ হয় না। প্রথমে বৈরাগ্য আসিল, পরে মারাত্মক ব্যাকুলতা, পরে অদম্য সাধনবলে তিনি যোগীজনলভ্য পরম ধন লাভ ও সম্ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেয়ঃপথাবলম্বী সুধীজনের জন্যও তাহার নির্দ্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন। স্বীয় জীবন চরিতের পত্রাঙ্কে সে নির্দ্দেশ তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যখন সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।" সেই জন্মবিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। আবার তিনি "অনন্তরমবাহ্যং। নিত্যমেবাত্মসংস্থং।"

তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং।"

সাধক দিগের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন সেই ব্রহ্ম পুরে তাঁহাকে দেখিবেন। যখন তাঁহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি, তখন বলি—"তুমি অন্তরতর অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা"। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি —"তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে" যখন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি—তাঁহার স্বীয় ধামে সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি—"তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং" তুমি শান্ত ভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছ।

আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে, তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিত্যজাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়তই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন এবং বহির্জগতে জীবের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন। "কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন" করিতে যাঁহার স্তুতি অবসন্ন হয় শ্রুতি স্মৃতি দরশন।" তাঁহার প্রসাদে আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান —দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়তই জানিতেছেন, তিনি "পরম যোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ মন, প্রীতি ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

মহর্ষি নাই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা আছে; মহর্ষি নাই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মোৎসব আছে, মহর্ষি নাই, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম জাবন্ত ভাবে চারিদিকে সূর্য্যকিরণের ন্যায় আলোক প্রদান করিতেছে, কেবল তাঁহার বর্ত্তমানতার অভাবই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক মহা অপূর্ণতার ভাব সূচিত করিতেছে। এই অভাবের মধ্যে তাঁহার জীবন চরিত্তই আমাদের এক মাত্র পথপ্রদর্শক এবং তাঁহার জীবনের আদর্শই আমাদের একমাত্র গুরু।

হে গুরুর গুরু পরমেশ্বর! তুমি অসীম জগতের নেতা এবং দেব মনুষ্যের পিতা, মাতা, বন্ধু। তুমি যখন জগতের অভাব মলিনতা নিরীক্ষণ কর, তখন তুমি তাহাকে সত্যসলিলে বিধৌত করিয়া নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এক এক মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া থাক এবং তাঁহার ভিতর দিয়া তোমার বিমল সত্য বিস্তার করিয়া নূতন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও অতি পুরাতন ধর্ম্ম কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া ইহাকে এক নূতন রাজ্যে আনয়ন করিয়াছ। আমরা সকলেই সেই রাজ্যের প্রজা। মহর্ষি এখন ইহলোকে নাই। তাঁহার অভাবে যেন আমরা ধর্ম্মহীন, প্রীতি হীন ও উদ্যমহীন হইয়া না পড়ি। তুমি

স্বয়ং আমাদিগকে ধারণ কর—তোমার চরণে এই প্রার্থনা!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

সায়ংকাল।

যথাসময়ে স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলে গড়গড়ি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্য ১১ ই মাঘ; অদ্য ব্রহ্মোৎসব। ইহা স্মরণ মাত্রেই যেন করুণাময়ের করুণা-জ্যোতিঃ এই উপাসনাক্ষেত্রে বিকীর্ণ দেখিতেছি। সূর্য্যোদয়ে যেমন সরোবরের পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে গন্ধ দান করে, পরমেশ্বরের করুণা-কিরণে তেমনি আজ তাঁহার ভক্তদিগের মানস পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া ভক্তিরূপ সুগন্ধ দান করিতেছে। ধরিতে গেলে প্রতিদিনই ব্রহ্মোৎসব। রজনীতে ভগবানের ক্রোড়ে শান্তি-ভোগ করিয়া যখনই প্রাতে তাঁহার নিকট হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটন করি, তখনি ব্রহ্মোৎসব উপভোগ করি। সন্ধ্যাকালে আকাশে যখন নক্ষত্র সকল তাঁহার চরণতলে জ্যোতি দান করে, বন্যপুষ্প সকল ফুটিয়া তাঁহাকে গন্ধদান করে—গগনের থালে চন্দ্র দীপক রূপে জ্বলিয়া তাঁহাকে আরতি করে, বিহঙ্গ সকল সুধাবর্ষী সংগীতে আকাশকে মধুময় অমৃতময় করিয়া তুলে, তখনও তাঁহার পদ-তলে বসিয়া উৎসবানন্দ ভোগ করি। কিন্তু আজ বিশেষ উৎসব। আজ ১১ ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন। যে দিন বঙ্গভূমি—ভারতভূমি অজ্ঞান কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার অবসর পাইল, সেই দিনই মহামহোৎসব—ব্রহ্মোৎসব উপভোগের বিশেষ দিন। আজ যদি প্রাণ ভরিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণ পূজা না করি, তবে আমাদের জীবন ধারণই বৃথা। ঈশ্বরের কৃপায় আজ এখানে সেই পুরাকালের তপোবনের প্রতিরূপ দেখিতেছি। ঋষিরা যেমন সন্ধ্যাকালে সরস্বতীর উপকূলে বসিয়া তাহার তরঙ্গতানের সহিত নিজ নিজ হৃদয়ের উৎসাহ তরঙ্গ তান মিলাইয়া বেদ গান করিতেন, আজি এই পবিত্র উপাসনা ক্ষেত্রে এখানকার ব্রাহ্মেরাও তেমনি বেদ ধ্বনি ও ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন। আজ শোকাশ্রু, প্রেমাশ্রুতে পরিণত হইতেছে। আজ সন্তপ্ত হৃদয় শান্তি লাভ করিতেছে, ঈশ্বরের প্রেমনীরে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইতেছে, মরুভূমিতে উৎস সকল উৎসারিত হইতেছে, আজ হৃদয় আকুল হইয়া বলিছে; "আজি বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল। কতদিন পরে মন মাতিল গানে, পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে, ভাই বোলে ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।" এই পবিত্র উৎসব ক্ষেত্রে, এখন আমি মানস-চক্ষে, যেমন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় এবং এই ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিসাধক ও প্রতিপালক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এই পবিত্র বেদীর শীর্ষদেশে সমাসীন থাকিয়া পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন দেখিতেছি, তাঁহারা যেন ধ্যানান্তে আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে, স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতেছেন, "আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজরে ভবতারণে। ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে, ঢালি দাও প্রভুর চরণে"। এই পবিত্র সময়ে সংযত হইয়া মন স্থির করিয়া, সেই ভক্তিভাজন

গুরুদ্বয়ের উদ্বোধন আধ্যাত্মিক কর্ণে শ্রবণ করিয়া, সেই পরমারাধ্য প্রাণারাম পরমেশ্বর যিনি আমাদিগকে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংকট হইতে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার অসীম করুণা নিয়ত আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন, যাঁর সমান কেহ চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শ্রবণ করে নাই, যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালের পিতা মাতা, এস আমরা তাঁহার চরণ পূজায়, তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে ব্রহ্মোপাসনাদি সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

"সংসারে প্রতিদিন যাহা পাই, তাহা ভালয়-মন্দে ক্ষণিকে-নিত্যে স্বার্থে-পরমার্থে মিশ্রিত-জড়িত খণ্ডিত পদার্থ। তাহা আমাদের সম্মুখে আসে এবং যায়, গড়িয়া উঠে এবং ভাঙিয়া পড়ে, এক হইতে যায় এবং আর হইয়া উঠে। আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না—কখনো তাহাকে মায়া বলিয়া ধিক্কার দিই, কখনো তাহাকে পরমপদার্থ বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরি। বস্তুত নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে কখনো স্থির সত্যের দিকে দৃষ্টিরক্ষা করা যায় না।

তাই বৎসরে একএকদিন বিষয়ব্যাপার হইতে মনকে বাহিরে আনিয়া সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রগত সত্যের প্রতি লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করিতে হয়। যে সত্যের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার বিলয়, যেখানে সমস্ত ভালমন্দের মূল তাৎপর্য্য, যে সত্য "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" অনেকের মধ্যে এক স্বরূপে বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন, তাঁহাকেই উপলব্ধি করিবার দিন উৎসবের দিন। সেই পরমসত্যই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ তাঁহাকে এই আবর্ত্তমান বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে একবার স্থির হইয়া দেখ। বাহিরে এই সংখ্যাহীন অণুপরমাণুর অশ্রান্ত স্পন্দনের মধ্যে দেখ, অন্তহীন গ্রহনক্ষত্রের নিরন্তর ঘূর্ণনের মাঝখানে দেখ, পক্ষ-মাস-ঋতু সংবৎসরের ফলপুষ্পশস্যপ্রবাহী গতায়াতের মধ্যে দেখ, মানবের নিয়ত পরিবর্ত্তিত জন্মমৃত্যু-সম্পদ্‌-বিপদ্‌ উত্থানপতনের মধ্যে দেখ। এই যে পৃথিবী জুড়িয়া মানবের ইতিহাস মথিত মহাসমুদ্রের ন্যায় কোথাও বা রক্তে আবিল, কোথাও বা কর্ম্মোদ্যমে ফেনিল, কোথাও বা বিঘ্নশৈলে প্রতিহত, কোথাও বা অবাধবেগে প্রবাহিত হইয়া লক্ষকোটি তরঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, ইহার গভীরতম মর্ম্মস্থানে অচলপ্রতিষ্ঠ স্তব্ধতায় বিরাজমান যে সত্যপুরুষ ক্ষুব্ধ প্রয়াসকে শান্ত সফলতার দিকে, উদ্বেল উন্মত্ততাকে সুমহৎ পরিণামের দিকে অব্যর্থনিয়মে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে আজ একবার দেখ। তোমার নিত্যচঞ্চল অন্তঃকরণের মাঝখানে আজ একবার গূঢ়ভাবে অবগাহন কর—সুখ-দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, উৎসাহ-অবসাদ কেবলি উঠিতেছে-পড়িতেছে, প্রবৃত্তিসকল নানা লক্ষ্যের দিকে নানা আকর্ষণে কখনো উদ্যত, কখনো নিবৃত্ত হইতেছে; কখনো বা কোথা হইতে বায়ুকোণে এক অভাবনীয় ঝঞ্ঝা উঠিয়া আকস্মিক উৎপাতে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে, কখনো বা মৃত্যুর ন্যায় এক আকস্মিক সুপ্তি সমস্ত চেতনাকে অভিভূত-আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—এই আমাদের চিন্তারাজ্যের সমস্ত অচিন্তনীয়-

তার মধ্যে, ভাবরাজীর সমস্ত অভাবনীয়তার মাঝখানে তাঁহাকে দেখ, যাঁহাকে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"—মধ্যস্থলে সমাসীন যে মহান্ পুরুষকে সমস্ত দেবগণ উপাসনা করিতেছেন।

জীবনের মধ্যে মধ্যে বিশেষ দিনের, বিশেষ অবকাশের ইহাই প্রয়োজন। সেদিন খণ্ডের দিক্ হইতে অখণ্ডে আসিবার উৎসব। নিজের দিক্ হইতে বিশ্বের দিকে আসিবার উৎসব। যে মূলে বিচিত্রের ঐক্য, যে সত্যে সকলের যোগ, যে এক আনন্দে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় নিখিলের সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য সম্মিলন, সেই মূলে, সেই সত্যে, সেই আনন্দে চিত্তকে আবাহন করিবার উৎসব।

যে পরম সত্যের কথা বলিতেছি, যে সত্যে তৃণলতা হইতে জ্যোতিষ্কলোক আসিয়া মিলিয়াছে, সেই সত্যকে আমরা যখন উৎসবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি, তখন সে উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিষকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ, প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে—তখনই প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন স্বরের মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকি, রাগিণীর সন্ধান পাই না—প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন শব্দ আমাদিগকে উদ্ভ্রান্ত করে, অর্থের সমগ্রতা অন্তরালেই থাকে;—ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনি আমরা দেখিতে পাই—

> নিখিলে তব কি মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব
> শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন

সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পারের সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর, ধনীদরিদ্র, পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ—সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম—আনন্দ। আমরা ত লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি—অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত

কাশ। কিন্তু উদ্ভিদবেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদপর্য্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে—তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরো পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ, তাহার আনন্দ, তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই —কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে, তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। এতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে সৌন্দর্য্যে। জগৎ প্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরণা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে, সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া' ফুল ফুটিয়া, পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া-উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্ত্তমান বিচিত্র রঙের পাগ্‌লামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রভাতে পাখীদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্গারিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক্ হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,—সৌন্দর্য্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—

প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্য্যের দিন।

আজ সৌন্দর্য্যের দিন। সৌন্দর্য্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা! ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্যপ্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্যপ্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কি, আর কাহারই বা কি। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্য্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সঙ্গীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্য্যের দ্বারা, সৌন্দর্য্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এইদিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেমই তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মত ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরিক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সঙ্গীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাত-প্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়! প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কি করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্ব্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই

উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা! আমি কে? আজ উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কি আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনা-বাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজো পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্য্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান কর। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান কর। ফিরাও,—ফিরাও,—তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও! দুর্ব্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা কর! বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্য্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেল। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিল লোকের সহিত তোমার আনন্দ-ভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্র-নতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্ব্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসবসভার মহাসঙ্গীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহঙ্কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্ম্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্ব্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্য্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য্য আলোক দেয়, কিন্তু তোমার স্বহস্ত-লিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার কর—তোমার উৎসবপ্রাঙ্গণের ধূলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক্, কেহই না মানুক্, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।”

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

ইমন ভূপালী—একতালা।

ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে।
প্রভু মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয়।

তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর জড় বিষাদ
মোচন কর হে।
প্রভু তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত
করহ জাগরূক—
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর স্বার্থপাশ
মোচন কর হে।
প্রভু বিরস বিকল প্রাণ
কর প্রেম সলিল দান
ক্ষতি পীড়িত শঙ্কিত চিত
কর সম্পদবান।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৫৬।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৮২৬ ৶৩
সমষ্টি	...	২০৮২॥৶৩
ব্যয়	...	২৭৯৸৯
স্থিত	...	১৮০২৸৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
ছয়কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
১৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৩০২৸৬
১৮০২৸৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০২৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের একজীকিউটার মহাশয়গণ
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

২০২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫।৶০
পুস্তকালয়	...	।০
যন্ত্রালয়	...	৪১৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		৭৲
সমষ্টি	...	২৫৬।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৯॥৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭৸৶০
পুস্তকালয়	...	॥০
যন্ত্রালয়	...	৭৯॥৶৩
গচ্ছিত	...	২৲
সমষ্টি	...	২৭৯৸৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিয়োগ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বৃত হইলেন। আগামী ২রা ফাল্গুন বুধবার হইতে সাপ্তাহিক উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়া তিনি উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টিগণ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭ এ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে। ধার্ম্মিক মহাত্মারা উপাসনায় যোগদান করিয়া আনন্দিত করিবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

ষোড়শ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

৫১২ সংখ্যা

১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪২। কলিগতাব্দ ৪৯৮৬। ৩ চৈত্র মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক

শ্রীকাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত।

মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই গ্রন্থে একশত একটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি আছে। আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের রচিত ভাল ভাল সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্বরলিপি-পদ্ধতি খুব সরল ও সহজ। এমন কি যাঁহাদের একটু স্বরজ্ঞান আছে, তাঁহারা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত স্বরলিপি দেখিয়াই গানগুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন। স্বরলিপি-পুস্তক-মুদ্রাঙ্কন যেরূপ ব্যয়সাধ্য, সে হিসাবে সাধারণের সুবিধার জন্য, ইহার মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ৫৫ নং অপারচিৎপুর রোড্, আদিব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	(বঙ্গানুবাদ) মূল্য	১৲	মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	„	১৷৷০
উত্তর-চরিত নাটক	ঐ „	১।০	বেণীসংহার নাটক	ঐ	„	১।৵০
রত্নাবলী নাটক	ঐ „	৸০	চণ্ডকৌশিক	ঐ	„	৸৵
মালতীমাধব নাটক	ঐ „	১।৵০	প্রবোধচন্দ্রোদয়	ঐ	„	১৲
মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ „	১৷৷০	বিদ্ধ শালভঞ্জিকা	ঐ	„	৷৷০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ „	১।০	ধনঞ্জয় বিজয়	ঐ	„	।০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ „	৸০	কর্পূর মঞ্জরী	ঐ	„	৷৷০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ „	৸০	প্রিয়দর্শিকা (নবপ্রকাশিত)	ঐ	„	৷৷০

নূতন পুস্তক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

প্রবন্ধ মঞ্জরী। (আত্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমালোচনা, লোকচেনা [চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত] প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গে পূর্ণ) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

১। ভারতবর্ষে (ফরাসী পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ... মূল্য ৷৷০

২। ঝাঁশীর রাণী (জীবন-বৃত্তান্ত) ... মূল্য ৷৷০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

ষোড়শ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
৭৫১ সংখ্যা চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩। ১৮২৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
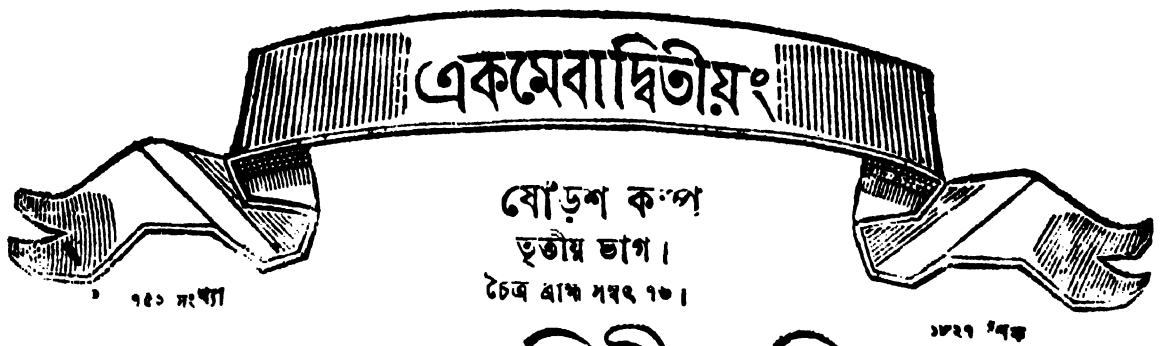
বিদ্যা এবং জ্ঞান।

(পঠিত প্রবন্ধ)

যদি-চ এক্ষণে আমার শরীর ইচ্ছানুরূপ কণ্ঠের দৌড় দেওয়াইতে পারিবার মতো সবল নহে, তথাপি এই উপলক্ষে কয়েকটি ভাবিবার বিষয় দেশস্থ বিদ্বজ্জনের (বিশেষত অধ্যেতৃজনের) জ্ঞানগোচর করিবার প্রত্যাশায় বহুদিনের পর আমি আজ এইরূপ কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মাঝখানে প্রবন্ধহস্তে সমাগত হইয়াছি। আমার বক্তব্য বিষয়টির সংজ্ঞানির্ব্বাচনের দায় এড়াইবার জন্য আমি সোজা কথা বাছিয়া-বাছিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি বিদ্যা এবং জ্ঞান। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের মনোমধ্যে এইরূপ একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞান এক না দুই! এ তর্কের মীমাংসাকার্য্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, কেন না, লোকের ভাষা লোকে যেমন জানে, এমন আর কেহই না। লোকে কি বলে?

যাঁহারা বিদ্যাধনে ধনী, তাঁহাদিগকে বলে সুপণ্ডিত; যাঁহারা জ্ঞানরত্নের খনি, তাঁহাদিগকে বলে পরম জ্ঞানী; যাঁহারা দুইই একাধারে, তাঁহাদিগকে বলে সোনায় সোহাগা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই কিছু-না-কিছু আছে। সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি; আর সেই সঙ্গে বিদ্যা এবং জ্ঞানের দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দ্দেশ করিব, এটাও আমার একটা মনোগত অভিপ্রায়।

বিদ্যা নানা, আর, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর, সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় সত্য। বিদ্যা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য যেমন ভিন্ন—পথও তেমনি ভিন্ন। বিদ্যার পথ হ'চ্চে অন্বয়ব্যতিরেকের পথ; জ্ঞানের পথ হ'চ্চে যোগের পথ। বলিলাম "অন্বয়ব্যতিরেক"; তাহা পদার্থটা কি? পদার্থটা তাহা আর কিছু না—জ্ঞাতব্য বস্তুতে সজাতীয়-লক্ষণের অন্বয় (যেমন জলেতে তরলতা-লক্ষণের অন্বয়,) আর, সেই সঙ্গে তাহা হইতে বিজাতীয় লক্ষণের ব্যতিরেক (যেমন জল হইতে কাঠিন্য-লক্ষণের ব্যতিরেক।) বিদ্যা এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকের প্রণালী অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি

জ্ঞাতব্য বস্তুসকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অবধারণ করে।

একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টে সহজেই বিদ্যা এবং জ্ঞানের দ্বিবিধ পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

বিদ্যাবিহীন মনোবৃত্তির নিকটে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা সবই সমান—সবই ঘটিবাটির ন্যায় প্রয়োজনমতে কাজ চালাইবার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না! বিদ্যা কিন্তু গৃহিণী খুব গোছালো। বিদ্যা পাঁচরকমের পাঞ্চভৌতিক পদার্থ পাঁচ ইন্দ্রিয়সূত্রে বাঁধিয়া পৃথক পৃথক পাঁচ থাকে সাজাইয়া রাখে! ইহাতে ফল দাঁড়ায় দুই-দিকে দুই বিপরীত-তরো। এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন আকাশখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন বায়ব্য-পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন আগ্নেয় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন জলীয় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন মৃন্ময় পদার্থ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাজাত্যের বন্ধন আঁটিয়া যায়; এটা হয় অন্বয়ের গুণে; আর-এক দিকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল মৃত্তিকা, এই সকল বিজাতীয় পদার্থ পরস্পরের সংস্রব হইতে পৃথককৃত হয়; এটা হয় ব্যতিরেকের গুণে। এইরূপ একটা সমগ্র বস্তুকে ভাঙিয়া তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ নানা অবয়বে বিভক্ত করিবার সময় বিদ্যা খুব সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়; কিন্তু তাহার পরে যখন সেই বিশ্লেষিত অবয়বগুলা জোড়াতাড়া দিয়া একটা সমগ্র বস্তু গড়িয়া দাঁড় করাইতে যায়, তখন বিচারকর্ত্তার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহার কৃত্রিমতা বাহির হইয়া পড়ে। বিচারকর্ত্তা বিদ্যাকে বলেন এই যে, প্রথমে তুমি তুলা হইতে সহস্র সূত্র সহস্রধা বিশ্লেষিত করিয়া তাহাদের মেলামেশা'র পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছ; এখন বলিতেছ যে, সহস্র মিলিয়া এক হইয়াছে—একটা পট হইয়াছে! উহার মধ্যে একত্ব যে কোন্‌খানটায়, তাহা তো আমি দেখিতে পাইতেছি না। যতই প্রখর হইতে প্রখরতর অণুবীক্ষণের প্রদীপ ধরিয়া উহার ভিতরে অনুসন্ধান চালনা করা যায়, ততই অসংখ্য অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর ছিদ্র বাহির হইতে থাকে, এই তো আমি দেখিতেছি; তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতেছি;—তুমি তোমার নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একতা'র প্রলেপ দিয়া ঐ ফোঁপরা বস্তুটার অসংখ্য ছিদ্রজাল ভরাট্ করিয়া দিতেছ, আর, তাহাকেই বলিতেছ যোগ। যাহাকে তুমি বলিতেছ পাঁচের যোগ, তাহা তোমার কল্পনার যোগ; যাহাকে বলিতেছ পাঁচের একত্ব, তাহা তোমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্ব। বিচারকর্ত্তার এইরূপ নিষ্ক্রির ওজনের বিচারে দাঁড়াইতেছে এই যে, বিদ্যা'র প্রকল্পিত যোগ একপ্রকার জোড়াতাড়া-দিয়া ঘটাইয়া-তোলা যোগ, তা বই তাহা প্রকৃত যোগ নহে। ওরূপ একটা কৃত্রিমধরণের যোগ'কে যোগ না বলিয়া বলা উচিত সংগ্রহ; বলিবও আমি তাই। ফলে, বিদ্যা প্রথমে বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নতা হইতে যাত্রারম্ভ করে বলিয়া, পরে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত যোগে পৌঁছিতে পারে না! জ্ঞান কিন্তু আর এক প্রদেশ হইতে যাত্রারম্ভ করে। জ্ঞান গোড়াতেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে; আর, সেইজন্য, জ্ঞানচক্ষুর অনিরুদ্ধ দৃষ্টিতে জল-স্থল-আকাশ-আনলানল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, প্রাণ-মন-বুদ্ধি, দেবমনুষ্য, পশুপক্ষি-কীটপতঙ্গ, তৃণগুল্ম-তরুলতা, ধাতুপ্রস্তর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্ত-মধ্য এবং অন্তর-বাহির সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য বিরাজমান, আর, সেই অদ্বিতীয় সত্যের একতাগুণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

আপাদমস্তক এবং অন্তর-বাহির যোগে-যোগে ওতপ্রোত। যে যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহা সংগ্রহেরই আর এক নাম, এ যোগ সে যোগ নহে; এ যোগ প্রকৃতপক্ষেই যোগ। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বিদ্যার পথ অন্বয়-ব্যতিরেকের পথ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পথ যোগের পথ। এ তো গেল প্রবন্ধের ভূমিকা,—এখন কোন্ স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করা যাইবে, সেইটিই বিবেচ্য। ভাবিয়া দেখিলাম যে, বিদ্যার পথ সকলেরই নিকটে সুপরিচিত; জ্ঞানের পথ অনেকের নিকটে হয় তো অপরিচিত। এরূপ স্থলে বিদ্যার বাঁধা-রাস্তার মধ্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া জ্ঞানের নিভৃত গুহা-গহ্বরের পথাভিমুখে ধীরে-ধীরে পা-বাড়ানোই পরামর্শসিদ্ধ; অতএব তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্।

বিদ্যারাণী নীতিজ্ঞা কম নহেন—যদি-চ তাঁহার নীতি কলি'র শিখাইয়া-দেওয়া একালের নীতি—একপ্রকার চাণক্যের নীতি! সে নীতির মর্ম্মকথা হ'চ্চে divide & conquer—ভাগ-ভাগ কর, আর জেতো। বিদ্যা যখন গণিতরাজ্য জয় করিতে বাহির হ'ন, তখন তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতের খণ্ডপ্রদেশগুলা পরস্পরের সংস্রব হইতে বিশ্লেষিত করিয়া একে-একে সেগুলা'কে হাতের মুঠার মধ্যে আনয়ন করেন; এইরূপ করিয়া সমগ্র গণিতরাজ্য অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ফ্যালেন। যে কোনো বিদ্যা হউক্ না কেন, তাহা রীতিমত উপার্জ্জন করিতে হইলে তাহাকে আশ-পাশের আর আর সমস্ত বিদ্যা হইতে, যতদূর পারা যায়, পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহারই উপরে মনোযোগের সমস্ত ভর সমর্পণ করা কর্ত্তব্য; এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য, যেন উপার্জ্জিতব্য বিদ্যার সঙ্গে আর-কোনো বিদ্যা'র ঘুণাক্ষরেও কোনো সম্পর্ক নাই। বীজগণিতও গণিত, জ্যামিতিও গণিত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিবার সময় এরূপ অনন্যপরায়ণ মানসে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, যেন বীজগণিতের সঙ্গে জ্যামিতির মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। বলিলাম "কর্ত্তব্য"—কিন্তু কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য? পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য—বিশেষত যাঁহারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে! অন্বয়ব্যতিরেকের পথ বিদ্যা-উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ, তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞানোদয়ের পথ নহে। জ্ঞানোদয়ের পথ ঠিক্ তাহার বিপরীত। জ্ঞানোদয়ের পথ যোগের পথ।

ঊনবিংশশতাব্দীয় বিদ্যা'র আদিগুরু দেকর্ত্তা বীজগণিতের সমীকরণপদ্ধতি জ্যামিতির অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গণিতের গৌরবমাহাত্ম্য কত যে উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বের আমলের বীজগণিত এবং জ্যামিতির মাঝখানে প্রাচীর একটা দাঁড়করানো ছিল বিপর্য্যয়-কঠিন। দেকর্ত্তা সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাঙিয়া-ফেলিয়া তাহার জায়গায় সৌহার্দ্দবিনিময়ের দিব্য একটা সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্নশ্রেণীর বিদ্যার মধ্যে যোগের এইরূপ গোড়াপত্তন তাঁহার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি ঐ কার্য্যটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে গণিতবিদ্যা আজিও ভূতলে হামাগুড়ি দিত। সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সকল বিদ্যারই নিগূঢ় মর্ম্মস্থান দিয়া আর-আর নানা বিদ্যার সহিত সম্মিলনের নানা পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে,

আর, সে-সকল সুড়ঙ্গপথের রহস্য-উদ্ঘাটন জ্ঞানোদয়েরই ফল, তা বই, তাহা পাণ্ডিত্যের ফল নহে! ফলে, পণ্ডিত হইলেই কিছু আর জ্ঞানী হওয়া যায় না; জ্যোতিষ জানিলেই কিছু আর নিউটন্ হওয়া যায় না; কবিতা লিখিতে জানিলেই কিছু আর শেক্স্পীয়র্ হওয়া যায় না! এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নিউটন্-শেক্স্পীয়র্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগকে অসামান্য বিদ্বান্ বা অসামান্য পণ্ডিত বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা মাটি করা হয়; কেন না, বিদ্যা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, তাঁহাদের বিদ্যা সেরকমের বিদ্যা নহে—শেখা বিদ্যা নহে! তাঁহাদের বিদ্যা একপ্রকার অশেখা বিদ্যা। তাহা অশিক্ষিত গোড়া'র জ্ঞানের উদ্বোধন—চৈতন্যের উদয়! শেখা-বিদ্যার নিকটে ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্ব-স্ব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অধিকারের গণ্ডির মধ্যেই অবরুদ্ধ; পরন্তু সে-সমস্তের মর্ম্মে-মর্ম্মে পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দবিনিময়ের যেরূপ নানামুখ পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া-পাওয়া অশেখা-বিদ্যারই কাজ—মূল জ্ঞানেরই কাজ।

জ্যোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যার (Mechanicsএর) যে বিশেষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে, এরূপ একটা কথা নিউটনের পূর্ব্বের আমলের পণ্ডিতসমাজে উত্থাপনেরই যোগ্য ছিল না। নিউটন্ নূতন এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে, যে কারণে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহচন্দ্রাদি জ্যোতির্মণ্ডল স্বস্ব পরিধিপথে চলাফেরা করে। এরূপ একটা বিশাল জগৎ-জোড়া কথা কে বলিতে পারে? *সেই মহাপুরুষই বলিতে পারেন,*—যাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞানদৃষ্টিতে সুদূর নভোমণ্ডলের শতসহস্রযোজনব্যাপী গ্রহচন্দ্রাদি আপেল-ফলেরই জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এটা কি কম একটা কথা! ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সব সত্যই এক সত্য! অতবড় একটা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালব্যাপী কথা নিউটন্ কোথা হইতে পাইলেন? বাহির হইতে পা'ন নাই, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বাহির হইতে পাইবেন কেমন করিয়া? "সব সত্যই এক সত্য" এটা যে একটা অন্তরাত্মার নিগূঢ় কথা! অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া যাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্যও পথে-ঘাটে কুড়াইয়া পাইতে পারিত! ফল কথা এই যে, পাইয়াছিলেন নিউটন্ তাহা অশেখা-বিদ্যার হস্ত হইতে—যাচাই করিয়াছিলেন শেখা-বিদ্যার বাজারে। যাচাই-কার্য্য আর কিছু না—যাথার্থ্যপরীক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Verification। নিউটনের এই যে একটি প্রাণের কথা যে, সত্যের নিকটে বড় ছোটো নাই—দূর-নিকট নাই; পরন্তু যে সত্য মহাকাশের মহা-মহা জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজমান, সেই সত্যই ক্ষুদ্র একটা আপেল্‌ফলে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে; তাঁহার এই প্রাণের কথাটি যখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে মাধ্যাকর্ষণবেশে সাজিয়া বাহির হইল, আর, তাহার পরে যখন নানাপ্রকার সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের প্রমাণবলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাঁহার জ্ঞানের মধ্য হইতে পণ্ডিতসমাজে এবং পণ্ডিতসমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোকসমাজে উথলিয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা'র মাঝখানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সেই দুর্নিবার বানের তোড়ে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখন দেশবিদেশের পণ্ডিতবর্গের

চক্ষু ফুটিল, সকলেই তাঁহারা তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা হরিহরাত্মা। তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস্ তাঁহার নবপ্রণীত জ্যোতিগ্রন্থের নাম দিলেন Celestial Mechanics—নাভসিক যন্ত্রবিদ্যা। জ্ঞান তলে-তলে কার্য্য করিয়া বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যোগের কিরূপ বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার আর-একটি নমুনা দেখাই।

ক্রমশঃ।

সত্য সুন্দর মঙ্গল।

সত্য।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

এই পূর্ণ ও অসীমের ধারণা-সম্বন্ধীয় মতবাদটি, সপ্তদশ শতাব্দির দর্শনে একবার প্রবর্ত্তিত হইলে পর,—দেকার্তের উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা এই মতটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যে ভাবে প্লেটোর উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা প্লেটোর আইডিয়া-সম্বন্ধীয় মতটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফরাসা-লেখক ম্যাল্ব্রাঁশ্ (Malebranche) তাঁহার লেখায়, প্লেটোর ধরণধারণ কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক সময়ে, তিনি সুললিত ভাষায়, খুব উচ্চ উদাত্ত ভাবের কথা সকল বলিয়াছেন; কিন্তু সক্রেটিসের লেখায় যেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ম্যাল্ব্রাঁশের লেখায় তাহা আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই "আইডিয়া"-মতবাদের সহিত অনেক অত্যুক্তি মিশ্রিত করিয়া, ম্যাল্ব্রাঁশ এই আইডিয়া-মতের যত ক্ষতি করিয়াছেন এমন আর কেহ নহে।

তিনি যদি এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন যে,—অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সহিত মানব-প্রজ্ঞার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, প্রজ্ঞার মধ্যে যেমন একদিকে ব্যক্তিত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার মধ্যে এমনও একটা কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌম এবং যাহা থাকায় মনুষ্য, সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়;—তিনি যদি এই সীমাটুকুর মধ্যেই আপনাকে বদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি একটুও দ্বিধা না করিয়া, আমাদের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক জ্ঞান এই উভয়কে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাছাড়া ম্যাল্ব্রাঁশের মতে, বিশেষ পদার্থ সমূহ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না,—"আইডিয়া" দ্বারা, চিৎ-প্রতিবিম্বের দ্বারা জানিতে পারি;—আমরা যাহা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করি তাহা জড় নহে, তাহা চিৎ। দৃষ্টিব্যাপারে—মনোমধ্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তৎসমস্তই চিৎ-প্রতিবিম্ব অথবা চিদাভাস (idea) এবং যেহেতু চিৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান, অতএব ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা সকল পদার্থ দর্শন করি। এরূপ সিদ্ধান্তে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই কিরূপ বিস্ময়-চকিত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু প্লেটো ও তাঁহার এই অবিশ্বাসী শিষ্য—ইঁহাদিগকে এক শ্রেণীর বলিয়া মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয়-চেতনা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহকে সাক্ষাৎভাবেই উপলব্ধি করে; এই ইন্দ্রিয়-চেতনার দ্বারা যে বস্তু যেমনটি তাহাই আমরা দেখিতে পাই; অর্থাৎ উহাকে অসম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি। পরে উহা ক্রমাগত বিশ্লিষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া এমন-একটি জ্ঞানে আমাদিগকে উপনীত করে যাহা প্রকৃত

জ্ঞান নামের যোগ্য। এই যে প্রজ্ঞা, যাহা ইন্দ্রিয়-চেতনা হইতে ভিন্ন, ইহাই আমাদের নিকট সার্ব্বভৌমকে প্রকাশ করে; এবং এইরূপে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা সারবান্ ও স্থায়ী জ্ঞান। সার্ব্বভৌম চিৎ তত্ত্বে একবার উপনীত হইতে পারিলেই, সেই সঙ্গে আমরা সেই ঈশ্বর-তত্ত্বেও উপনীত হই,—যাঁহাতে এই সার্ব্বভৌম চিৎ-তত্ত্বগুলি অধিষ্ঠিত;—যাঁহাতে গিয়া আমাদের যথার্থ-জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে, সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ, যাহা পরিবর্ত্তনশীল সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করিবার জন্য, চিৎ-তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয়-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয় হইতে আমরা যে-একটু জ্ঞানলাভ করি তাহা অসম্পূর্ণ, প্রজ্ঞা এই অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে অতিক্রম করে। প্রজ্ঞা আমাদিগকে সার্ব্বভৌমিকে উপনীত করে; কেন না, প্রজ্ঞাতে এমন কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌম। এই প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক জ্ঞানের অংশভাগী কিন্তু স্বয়ং ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে; উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান হইতে প্রকাশিত—নিঃসৃত। কিন্তু উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা" নামক ফেনেলোঁর একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি ম্যাল্‌ব্রাঁশ ও দেকার্ত্ত এই উভয়েরই ভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি—প্রমাণ, পদ্ধতি, পারম্পর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে দেকার্ত্তীয় ধরণে লখিত। উহাতে ম্যাল্‌ব্রাঁশের ধরণও কতকটা আছে,—বিশেষতঃ "আইডিয়ার প্রকৃতি" বিষয়ক পরিচ্ছেদটিতে। এবং প্রথম-খণ্ডে, তত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত আলোচনায়, ম্যাল্‌ব্রাঁশের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ফেনেলোঁ, উগ্রবুদ্ধি দার্শনিকদের সহিত এক পরিবারভুক্ত নহেন; তাঁহার মধুর আত্মা, উন্নত স্থানেই সর্ব্বদা বিচরণ করে। তাঁহার কতিপয় বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উহার মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য এবং কোন্‌গুলি অত্যুক্তিদোষে দূষিত তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

"প্রথম খণ্ড ৪৪ পরিচ্ছেদ।—অসীমের ভাব ছাড়া, আমার মধ্যে আরও কতকগুলি সার্ব্বভৌম ও অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব ধারণা বিদ্যমান, যাহা আমাদের সমস্ত যুক্তিবিচারের মূল নিয়ম। উহাদের পরামর্শ না লইয়া আমরা কোন বিষয়ে বিচার করিতে পারি না, এবং উহাদের কথার বিরুদ্ধে, কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনে আমাদের অধিকার নাই। চিন্তার দ্বারা উহাদিগকে সংশোধিত কিংবা নিয়মিত করা দূরে থাক্, আমাদের চিন্তাই উহাদের দ্বারা সংশোধিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে। উহারাই আমাদের মনের উচ্চতম নিয়ম। আমাদের সমস্ত চিন্তাই উহাদের বিচার-নিষ্পত্তির অধীন। আমাদের মন যতই চেষ্টা করুক না,—এ কথায় কখন সন্দেহ করিতে পারে না যে, "দুই আর দুয়ে চার হয়" কিংবা "সমস্তটা তাহার অংশ অপেক্ষা বড়"; কিংবা "কোন-একটা পূর্ণ বৃত্তের কেন্দ্র, তাহার পরিধির সকল অংশ হইতেই সমান্ দূরে"। এই সকল প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা আমার নাই। এই সকল তত্ত্ব যদি আমি অস্বীকার করি তাহা হইলে—আমার মধ্যে যে-একটি তত্ত্ব আছে যাহা আমাতে থাকিয়াও আমার অতীত—সেই তত্ত্বটিই আমাকে সিধা পথে আবার ফিরাইয়া আনে। এই ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বটি আমাদের অন্তরের এরূপ অন্তরতম দেশে অধিষ্ঠিত যে উহাকেই সহসা

"আমি" বলিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু বস্তুত উহা আমার "আমি"র ঊর্দ্ধে অবস্থিত; কেন না, উহা আমাকে সংশোধন করে, সিধা করে, এমন কি আমাকে আমার নিজের বিরুদ্ধেই দাঁড় করাইয়া দেয়, উহা আমার অক্ষমতা সূচিত করে, উহা এমন-একটা কিছু যাহা সর্ব্বদাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে—(অবশ্য যদি আমি তাহার কথায় কর্ণপাত করি) তাহার কথায় আমি কখন প্রতারিত হই না। এই আভ্যন্তরিক তত্ত্বটিকেই আমি প্রজ্ঞা বলি।"

৪৫ পরিচ্ছেদ। "বাস্তব পক্ষে আমার প্রজ্ঞা আমার অন্তরেই বিদ্যমান; কেন না, সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে, আমার অন্তরের মধ্যেই সর্ব্বদা অন্বেষণ করিতে হয়। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান আমাকে সংশোধন করে, যাহার পরামর্শ আমি গ্রহণ করি, সে জ্ঞান আমার নহে, আমার নিজের অংশও নহে। এই প্রজ্ঞা পূর্ণ ও ধ্রুব; আমি অপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল, আমি ভ্রম করিলেও উহার ভ্রম হয় না; আমার ভ্রম ঘুচিলে তবে উহার ভ্রম ঘুচে—এরূপও নহে। প্রজ্ঞা অপথে যায় না—আমাকেই যথাপথে ফিরাইয়া আনে। প্রজ্ঞাই আমার অন্তরস্থ প্রভু—যে আমাকে চুপ্ করাইয়া দেয়,—আমাকে কথা কহায়,—আমাকে বিশ্বাস করায়—আমাকে সন্দেহ করায়—আমাকে ভ্রম স্বীকার করায়,—আমার সিদ্ধান্তকে স্থির রাখে। তাহার কথাতেই আমি শিক্ষা পাই,—আমার নিজের কথা শুনিলে আমি পথভ্রষ্ট হই। এই প্রভুটি সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এবং জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সকল মনুষ্যই, আমার ন্যায় ইহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়।"

৪৬ পরিচ্ছেদ। "যাহা আমাদের অন্তরতম, যাহাকে আমাদের নিজস্ব বলিয়া মনে হয়—সেই প্রজ্ঞা বস্তুত আমাদের তত নিজের নহে;—উহা নিতান্ত ধার করা জিনিস্। বাতাস যেমন একটা বাহিরের বস্তু, অথচ আমরা সেই বাতাসকে নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রতিক্ষণ গ্রহণ করি, সেইরূপ প্রজ্ঞাকে আমরা অবিরত উপলব্ধি করিলেও উহা আমাদের অপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।"

৪৭ পরিচ্ছেদ। "এই অন্তরস্থ প্রভু—এই সার্ব্বভৌম প্রভু, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে আমাদের নিকট সত্য এইরূপেই প্রকাশ করেন। একথা সত্য, অনেক সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা কথা কহি—তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কথা কহি; কিন্তু তখনই আমরা ভ্রমে পতিত হই; তখনি আমাদের কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়;—আমাদের নিজের কথাই আমরা তখন নিজেই বুঝিতে পারি না; এমন কি আমরা ভয় করি, পাছে প্রজ্ঞার সংশোধনে আমাদের হীনতা প্রকাশ পায়। যে মনুষ্য, এই বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে ভয় পায়, যে তাহার কথা না শুনিয়া পথভ্রষ্ট হয়,—সে মনুষ্য অবশ্যই এই প্রজ্ঞা নহে;—সেই প্রজ্ঞা যে মনুষ্যের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনুষ্যকে নিয়ত সংশোধন করে। সকল বিষয়ের মধ্যেই দুইটি মূলতত্ত্ব আমাদের অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি। তন্মধ্যে একটি দান করে—অপরটি গ্রহণ করে; একটি অভাব অনুভব করে, অপরটি সেই অভাব পূর্ণ করে; একটি ভ্রমে পতিত হয়, অপরটি সেই ভ্রম সংশোধন করে; একটি অতিমাত্র ঝুঁকিয়া স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হয়, অপরটি তাহাকে আবার খাড়া করিয়া তুলে; প্রত্যেক মনুষ্যই, একটা সীমাবদ্ধ জ্ঞান—একটা পরাধীন জ্ঞান আপনার অন্তরে অনুভব করে;—সেইরূপ একটা জ্ঞান,—যাহা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেই, পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং

যতক্ষণ একটি উচ্চতর ধ্রুব নিত্য সার্ব্বভৌম জ্ঞানের অধীনে না আইসে ততক্ষণ সংশোধিত হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যই আপনার অন্তরে এমন-একটা জ্ঞানের আভাস পায় যাহা সীমাবদ্ধ, যাহা বিভক্ত, যাহা ধার-করা এবং যাহা এমন-একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে যাহার দ্বারা সে প্রতিমুহূর্ত্ত সংশোধিত হইতে পারে। এই একই প্রজ্ঞা সকলেরই মধ্যে বিভিন্ন-মাত্রায় বিদ্যমান; তন্মধ্যে কতকগুলি লোক জ্ঞানিপদবাচ্য; কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহারা একই মূল-উৎস হইতে প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহারা এই জ্ঞানের প্রসাদেই জ্ঞানী হইয়াছেন। এই জ্ঞানের তুলনা নাই—দ্বিতীয় নাই।”

৪৮ পরিচ্ছেদ। এই জ্ঞান—এই সর্ব্বসাধারণ জ্ঞান, যাহা মানুষের অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ অন্য সমস্ত জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞানটি কোথায় আছে? এই দৈববক্তা যাঁহার বাক্যের বিরাম নাই—যাঁহার বিরুদ্ধে লোকের সমস্ত অন্ধসংস্কার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না—এই দৈববক্তাটি কোথায় আছেন? যাঁহার পরামর্শ সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, যাহা মনুষ্যমাত্রকেই আলোক দান করে, সেই জ্ঞানটি কোথায় অধিষ্ঠিত? মানব-চক্ষের উপাদান-বস্তু সূর্য্যের কিরণ নহে। সেইরূপ আমাদের মনও আদিম জ্ঞান নহে,—সার্ব্বভৌম ধ্রুব সত্য নহে—শুধু উহা একটা দ্বারমাত্র—যাহার মধ্য দিয়া এই আদিম আলোক সঞ্চারিত হয় এবং সঞ্চারিত হইয়া উহাকে আলোকিত করে।”

৪৯ পরিচ্ছেদ। “দুই প্রকার জ্ঞান আমাদের অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি; উহার মধ্যে একটি আমি স্বয়ং—অপরটি আমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমার অন্তরস্থ জ্ঞানটি অতীব অপূর্ণ, অনিশ্চিত, ভ্রমাধীন, পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ; উহার কিছুই আপনার নহে—সমস্তই ধার-করা। অপর জ্ঞানটি সার্ব্বভৌম এবং উহা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা পূর্ণ, নিত্য, ধ্রুব, সর্ব্বত্র-প্রকাশিত, ভ্রমসংশোধক, উহা কখন নিঃশেষিত হয় না, উহা বিভক্ত হয় না, অথচ উহাকে যে চায় সেই পায়। যাহা আমার এত নিকটে অথচ আমা-হইতে এত ভিন্ন—এই পূর্ণ জ্ঞানটি—এই পরম জ্ঞানটি কোথায় অধিষ্ঠিত?—অবশ্যই ইহা একটি বাস্তবিক সত্তা; আমরা যাহা অন্বেষণ করিতেছি, ইহাই কি ঈশ্বর নহেন?”

দ্বিতীয় ভাগ—১।২৪।২৯ পরিচ্ছেদ। “আমার মধ্যে একটি অসীমের ভাব—অসীম পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান—এই ভাবটি কোথা হইতে পাইলাম? যাহা আমা অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থিত—যাহা আমাকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে,—যাহা আমাকে আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত করে—যাহা অসীমকে আমার নিকট উপস্থিত করে—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহাকে আমি কোথা হইতে পাইলাম?—পুনর্ব্বার বলি,—এই অসীমের প্রতিরূপটি—এই অসীমকল্প পদার্থটি—সসীমের সহিত যাহার কোন সাদৃশ্যই নাই—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা আমারই অন্তরে বিদ্যমান, অথচ আমা অপেক্ষা অধিক; আমার নিকটে উহাই সমস্ত—উহার নিকটে, আমি কিছুই নয় এইরূপ আমার মনে হয়। আমি উহাকে মুছিয়া ফেলিতে পারি না, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে পারি না, হ্রাস করিতে পারি না, উহার প্রতিবাদ করিতেও পারি না। উহা আমারই মধ্যে বিদ্যমান, অথচ আমি নিজে উহাকে আমার মধ্যে স্থাপন করি নাই,—আমি

উহাকে আমার মধ্যে উপলব্ধি করি মাত্র। অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বেই উহা আমার মধ্যে আপনিই আসিয়া রহিয়াছে; তাই আমি উহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা চিরকালই সমানভাবে রহিয়াছে; আমি যখন উহাকে চিন্তাও করি না—অন্য বিষয় চিন্তা করি—তখনও উহা রহিয়াছে। যখনই অন্বেষণ করি তখনই আমি উহাকে পাই; উহা আমার উপর নির্ভর করে না; আমিই উহার উপর নির্ভর করিয়া আছি—এই অসীমের অসীম প্রতিরূপটিকে কে আমাকে দান করিল? উহা কি আপনা আপনি উৎপন্ন হইল? এই যে অসীমের অসীম-প্রতিরূপ, ইহার কি কোন মূল-রূপ নাই—ইহার কি কোন মূল কারণ নাই? বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! একি অদ্ভুত ব্যাপার! অতএব এই সিদ্ধান্তটি অপরিহার্য্য—ইহা অসীম ও পূর্ণ সত্য; ইহা আমার ধারণায় সাক্ষাৎ ভাবে উপস্থিত হয়; যে অসীমের ধারণাটি আমার মনে আমি উপলব্ধি করি উহার মূলটিও অসীম"—

৪ পরিচ্ছেদ। আমার ধারণাগুলিই আমি স্বয়ং; কেননা উহাই আমার জ্ঞান-পদার্থ। আমার ধারণা সমূহ এবং আমার অন্তরের অন্তরতম জ্ঞানপদার্থটি—এই উভয়ই আমার নিকট একই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে, আমার মন পরিবর্ত্তনশীল; উহা তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়,—না বুঝিয়া বিশ্বাস করে; আপনার ধারণাগুলির সহিত ঐক্য করিয়াই যুক্তিবিচার নিষ্পন্ন করে—সেই সব ধারণা যাহা ধ্রুব ও নিত্য। কিন্তু আমার চিৎ-প্রতিবিম্বগুলি আমি নই;—আমার ধারণাগুলি আমি নই। এই ধারণাগুলি তবে কি?—এই ধারণাগুলিই কি ঈশ্বর? "আমার মন অপেক্ষা নিশ্চয়ই উহারা শ্রেষ্ঠ, কেননা উহারা মনকে সংশোধন করে,—যথাপথে স্থাপন করে। উহাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি; কেননা, ঈশ্বরের ন্যায় উহারা সার্ব্বভৌম ও ধ্রুব। যাহা সার্ব্বভৌম ও ধ্রুব তাহাকে যতটা "অস্তি" বলা যায়, অতটা "অস্তি" অন্য কিছুরই সম্বন্ধে বলা যায় না। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, চলমান্, ধার-করা,—তাহাই যদি বাস্তব পদার্থ হয়,—তবে, যাহা ধ্রুব ও নিত্য, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা আরও কত না বাস্তব হইবে। অতএব দেখা আবশ্যক—আমাদের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের চিৎ-প্রতিবিম্বগুলির মধ্যে, এমন কিছু আছে কি না যাহা বাস্তব-সত্তা-বিশিষ্ট;—এমন-কিছু যাহা আমার মধ্যে আছে অথচ যাহা আমি নই, যাহা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; না ভাবিলেও যাহা আমার মধ্যে বর্ত্তমান;—যাহার সহিত আমি একাকী বাস করিতেছি; মনে হয় যেন আমার নিজের সহিত বাস করিতেছি না; যাহা আমা-অপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ, বেশী ঘনিষ্ঠ। না জানি সে কি অপূর্ব্ব পদার্থ যাহা এমন ঘনিষ্ঠ অথচ এমন দুর্জ্ঞেয়—সে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে?" (ক্রমশঃ)

এপিক্‌টেটাসের উপদেশ।

একলা থাকা।

১। আপনাকে একলা বলিয়া মনে হয় তাহারি—যে অসহায় ও নিরুপায়। কেননা, একাকী থাকিলেই একলা থাকা হয় না; আবার বহুলোকের সঙ্গে থাকিলেই যে একলাভাব ঘুচে—তাহাও নহে। সেই জন্য, যাহারা আমার নির্ভরের স্থল—সেই ভ্রাতা হইতে, কিংবা পুত্র হইতে,

কিংবা বন্ধু হইতে যখন আমি বিচ্ছিন্ন হই, তখনই আপনাকে একলা বলিয়া মনে হয়। সহরের এত জনতা, এত গৃহ অট্টালিকা, তবু সহরের মধ্যে গিয়া, আপনাকে কখন কখন একলা বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ মনে হয়—আমি অসহায়; মনে হয়, এমন সব লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যাহারা আমার অনিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। ভ্রমণে বাহির হইয়া যদি একদল তস্করের মধ্যে আসিয়া পড়ি, তখনও আমার মনে হয়—আমি একলা। বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ হিতৈষী মনুষ্যের দর্শনেই আমাদের একলাভাব ঘুচিয়া যায়;—যে কোন মনুষ্যের দর্শনে তাহা হয় না। একথা সত্য—আমরা সামাজিক জীব,—স্বভাবতই অন্যের সঙ্গে একত্র বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহাও দেখা আবশ্যক কিসে আমি নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি—নিজের সংসর্গেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি। কেননা মনুষ্য একাকীই জন্মগ্রহণ করে—একাকীই মৃত হয়। দেখনা কেন—ঈশ্বর নিজেই নিজের সঙ্গী; একাকীই জগৎশাসনে ব্যাপৃত, একাকীই স্বকীয় মহৎ সঙ্কল্পের ধ্যানে নিমগ্ন। এইরূপ আমিও যদি আমার নিজের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারি, অন্য সংসর্গের অভাব অনুভব না করি, আপনার মধ্যেই আত্মবিনোদনের উপায় সংগ্রহ করিয়া রাখি, আত্মপর্য্যাপ্ত হই; ঈশ্বরের জগৎশাসন কিরূপ ভাবে চলিতেছে,—বাহ্য বস্তুর সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ, আমার পূর্ব্ব অবস্থা কিরূপ ছিল, এখনকার বর্ত্তমান অবস্থাই বা কিরূপ, কোন্ কোন্ বিষয় এখনও আমাকে ক্লেশ দিতেছে, কিরূপে এই সমস্ত দুঃখক্লেশ বিদূরিত অথবা উপশমিত হইতে পারে, অবস্থা-অনুসারে কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি,—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় যদি আমি ব্যাপৃত থাকি তাহা হইলে আমাকে আর একলা থাকিতে হয় না।

২। আমরা ভাবি,—রাজা আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন; এখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নাই; দস্যু তস্করের ভয় নাই, এখন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সকল সময়েই নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারি। এ সমস্তই সত্য; কিন্তু রাজা কি জ্বররোগ হইতে, নৌকাডুবি হইতে, অগ্ন্যুৎপাত হইতে, ভূমিকম্প হইতে, বজ্র বিদ্যুৎ হইতে, অথবা পঞ্চবাণ হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন?—অথবা দুঃখ শোক হইতে, ঈর্ষা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন?—কখনই না। ইহার কোনোটি হইতেই তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিলে এই সকল দুঃখ ক্লেশের মধ্যেও শান্তি লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানের আশ্বাস বাণীটি কি তাহা শোনো: "যদি তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর,—হে মনুষ্যগণ! যেখানেই তোমরা থাকনা কেন, তোমাদের শোকতাপ চলিয়া যাইবে, ঈর্ষা দ্বেষ চলিয়া যাইবে, কোন রিপুরই আর বশীভূত হইতে হইবে না, কোন বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইবে না, সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" যিনি এইরূপ শান্তি-সম্পদ লাভ করিয়াছেন (যে শান্তির ঘোষণা ঈশ্বর ভিন্ন কোন পার্থিব রাজা কর্তৃক অসম্ভব) তিনি কি আত্মপর্য্যাপ্ত ও আপ্তকাম হয়েন না? তখন তিনি এইরূপ বিবেচনা করেন;—"এখন আমার কোন

অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; আমার আর দস্যুভয় নাই; ভূমিকম্পের ভয় নাই; আমার নিকট, সকল পদার্থই শান্তিময়; কোনও পথ, কোনও নগর, কোনও সঙ্ঘ, কোনও প্রতিবেশী, কোনও সঙ্গীই আমার তিলমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না!" এই-রূপ ব্যক্তির জন্য, কেহ যোগায় আহার, কেহ যোগায় বস্ত্র, কেহ যোগায় তাহার জ্ঞানের খোরাক; যে যাহার অধিকারী সেই তাহার অংশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করে। যখন এই সকল আবশ্যক সাম-গ্রার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার পালা সাঙ্গ হইয়াছে,—তাহার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে; তখনই তাহার সম্মুখে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ঈশ্বর তাহাকে বলেন;—"প্রস্থান কর"।

—"কোথায় প্রস্থান করিব"?

কোন ভীষণ স্থানে নহে;—সেই স্থানে তুমি প্রস্থান করিবে, যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ;—যাহারা তোমার আত্মীয় বন্ধু সেই মহাভূতের মধ্যে। তোমাতে যে অগ্নি ছিল তাহা অগ্নির মধ্যে,—যে বায়ু ছিল তাহা বায়ুর মধ্যে,—যে জল ছিল তাহা জলের মধ্যে চলিয়া যাইবে। কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, কি স্বর্গ, কি নরক—এমন কোনও স্থান নাই যাহা দেবতাদের দ্বারা, মহাশক্তিদের দ্বারা পূর্ণ নহে। যাঁহারা এই সব বিষয় চিন্তা করেন, চন্দ্র সূর্য্য তারা নক্ষত্র দর্শন করিয়া যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করেন, পৃথিবী সমুদ্র দেখিয়া যাঁহারা উল্ল-সিত হয়েন, তাঁহারা একলাও নহেন, অস-হায়ও নহেন, নিরুপায়ও নহেন।

—"কিন্তু আমাকে একলা দেখিয়া যদি কেহ আমাকে হত্যা করে"?

—নির্ব্বোধ! তোমাকে হত্যা করিতে পারে না, তোমার অপদার্থ শরীরকে হত্যা করিতে পারে।

৩। তুমি একটি ক্ষুদ্র আত্মা—শরীর গ্রহণ করিয়াছ মাত্র।

৪। তবে তুমি আর একলা কেমন করিয়া?—তোমার কিসের অভাব? তবে কেন আমরা আপনাকে শিশু অপেক্ষাও অধম করিয়া ফেলি? শিশুরা একলা থাকিলে কি করে? তাহারা ঝিনুক লইয়া, ধূলা-বালি লইয়া ঘর তৈয়ারি করে—আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে—আবার তৈয়ারি করে; এইরূপ তাহাদের খেলার আর অন্ত নাই। আর, আমি কিনা আপনাকে একলা ভাবিয়া কাঁদিতে বসিব যখন তুমি চলিয়া যাইবে? আমার কি কোন ঝিনুক নাই?—ধূলা-বালি নাই? "কিন্তু শিশুরা নির্ব্বোধ বলিয়াই এইরূপ কার্য্য করে"। আর তুমি জ্ঞানী বলিয়াই আপনাকে অসুখী কর, কেমন কি না?—এ তোমার কিরূপ জ্ঞান বল দেখি?

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৬, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৩০৫৸৴৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৮০২৸ ৬
সমষ্টি	...	৩১০৮৷৷৴৯
ব্যয়	...	৮৫১৷৷৬
স্থিত	...	২২৫৭৴৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
তিনকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২০০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
২৫৭৴৩

২২৫৭৴৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৭৫২৲

মাসিক দান।

স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের এষ্টেটের এক্জীকিউটার মহাশয়গণ

২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী

২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

৫৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী

২৫৲

কোম্পানির কাগজ

৫০০৲

৭৪৪৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৲

৭৫২৲

পুস্তকালয়	...	২০/০
যন্ত্রালয়	...	২২২॥/০
গচ্ছিত	...	২॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩॥৵০
সেভিংসব্যাঙ্ক	...	৩০০৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫৲
সমষ্টি	...	১৩৩৫৸৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬৮৬৸/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯৸৶৬
পুস্তকালয়	...	২৶৯
যন্ত্রালয়	...	১১৮৶৯
গচ্ছিত	...	২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১২।/৬
সমষ্টি	...	৮৫১॥ ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র শুক্রবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শনিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।